ভলিউম ২৩

কুয়াশা

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ভলিউম ২৩

কুয়াশা

৬৭, ৬৮, ৬৯

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984 - 16 - 1113-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৭

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
জি. পি. ও.বক্স নং ৮৫০
দূরালাপন: ৮৩৪১৮৪

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Volume-23
KUASHA SERIES: 67, 68, 69
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

সাতাশ টাকা

কুয়াশা ৬৭: ৫—৪২
কুয়াশা ৬৮: ৪৩—৮৫
কুয়াশা ৬৯: ৮৬—১৩৬

কুয়াশা ৬৭

প্রথম প্রকাশ: জুন, ১৯৭৭

এক

প্রখ্যাত শখের গোয়েন্দা শহীদ খানের বাসভবন।

বাড়ির বাইরে, গেটের সামনে অদ্ভুতদর্শন একটা মটরসাইকেল দাঁড়িয়ে আছে। বাঘের চামড়া দিয়ে মোড়া সীট মটরসাইকেলটার। পিছনের দিকে একটা বাঘের মুণ্ডু, মুখ ব্যাদান করে আছে। প্রকাণ্ড মটরসাইকেলের সর্ব অঙ্গে কম করেও পঞ্চাশটা ছোট বড় নানা রঙের বালব্। আলোক মালায় সজ্জিত মটরসাইকেল ঢাকা শহরে এই একটাই। এটা শহীদ খানের সহকারী কামাল আহমেদের বিখ্যাত মটরসাইকেল।

খোলা গেটের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির চাকর লেবু। আপনমনে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে সে। ছোট সাহেবের অদ্ভুতদর্শন দ্বিচক্রযানটিই তার হাস্যোদ্রেকের কারণ।

কামাল এইমাত্র বাড়ির ভিতর ঢুকেছে। লেবুকে গেটে পাহারায় দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে সে। কড়া নির্দেশ দিয়ে গেছে তাকে, মানুষ তো দূরের কথা, পিপঁড়েও যেন বাড়ির ভিতর ঢুকতে না পারে।

পরম বন্ধু শহীদের বাড়িতে অবাধ যাতায়াত কামালের। মাসের অধিকাংশ রাত কাটায় সে এ-বাড়িতে। এ বাড়ির উপর অধিকার তার কারও চেয়ে কম নয়। শহীদের আপন কোন ভাই নেই, তাই মহুয়া কামালকে পেয়ে দেওরের অভাব ভুলে আছে। কামালকে ওরা এবং ওদেরকে কামাল কতটা ভালবাসে, তা ব্যাখ্যা করে বোঝানো সম্ভব নয়।

অন্যান্য দিন মটরসাইকেল নিয়েই বাড়ির ভিতর ঢোকে কামাল। কিন্তু আজ সে গেটের বাইরে মটরসাইকেল দাঁড় করিয়ে পায়ে হেঁটে ভিতরে ঢুকেছে। গেট খুলে দিয়েছে লেবু। তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করে কিছু খবর জেনে নিয়েছে সে। গেটে তাকে পাহারায় দাঁড় করিয়ে রেখে সন্তর্পণে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করেছে কামাল। যাতে মহুয়া টের না পায় তার আগমন।

গেটের পর দু'পাশে বাগান। এই বাগানের পরিচর্যা করে কামালই। কাউকে ফুল ছিঁড়তে দেখলে খেপে গিয়ে যাচ্ছেতাই কাণ্ড ঘটিয়ে বসে সে। কংক্রিটের প্রশস্ত রাস্তা চলে গেছে গেটের কাছ থেকে গাড়ি-বারান্দা পর্যন্ত। কামাল কিন্তু এই রাস্তা দিয়ে না গিয়ে ঢুকে পড়ল বাগানের ভিতর। দেয়াল ঘেঁষে, গাছ-পালার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ধীরে ধীরে এগোল সে। বার বার মাথা তুলে তাকাচ্ছে দোতলার

জানালাগুলোর দিকে। মহুয়াদি যদি দেখে ফেলে তাকে…!

ওদিকে ডাইনিংরুমে মহুয়া কোমরে শাড়ির আঁচল জড়িয়ে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে কড়া শাসনের দৃষ্টি। ডাইনিং টেবিলে সাজানো পনেরো-বিশটা চীনা মাটির প্লেট। প্রত্যেকটিতে সুস্বাদু সুখাদ্য ছিল। বেশিরভাগই এখন খালি, মাত্র দুটি প্লেটে এখনও কিছুটা আছে।

মহুয়ার পাশে একটা চাকাওয়ালা ইনভ্যালিড চেয়ার। সেই চেয়ার জুড়ে বসে আছে সুবিশাল, সুবেশী এক ভদ্রলোক। রাজকীয় চেহারা ভদ্রলোকের। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, চোখে সানগ্লাস, ব্যাকব্রাশ করা চুল। অ্যাশ কালারের কমপ্লিট স্যুট পরনে। বাঁ হাতের কব্জিতে প্রায় পিরিচের মত বড় ডায়ালওয়ালা একটা ঘড়ি। ভদ্রলোকের চেহারাটা এমনই যে হঠাৎ কেউ দেখে ঠাহর করতে পারবে না, ভদ্রলোক কোন্ দেশী।

'লক্ষ্মী বোন আমার…কথা শোন্, আর পারব না!'

মহুয়া চামচে স্ক্র্যাম্বল্ড্ এগ তুলে ভদ্রলোকের মুখের সামনে নিয়ে এল। মুখে কথা নেই, কিন্তু চোখে শাসনের কড়া দৃষ্টি। ভদ্রলোক সাহায্যের প্রত্যাশায় অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক তাকায়। কিন্তু ডাইনিংরুমে আর কেউ নেই। চোখ তুলে মহুয়ার দিকে তাকায় সে। আবার কিছু বলতে গিয়েও সামলে নেয় নিজেকে, হেসে ফেলে, বলে, 'খাইয়েই মেরে ফেলবি নাকি?'

'বাজে কথা বোলো না!' ভদ্রলোকের মুখে চামচ ঢুকিয়ে দিতে দিতে মহুয়া বলল। 'সময় মত না খেয়ে খেয়ে খিদেটাকে তো একেবারে নষ্ট করে ফেলেছ। মনে আছে আমার, দশজনের নাস্তা একা খেয়েও তোমার পেট ভরত না। আর এখন তুমি প্রায় অনাহারেই থাকো।'

'অনাহারে থাকি না, তবে মাত্রাতিরিক্ত আহারও করি না। বেশি খাওয়াটা সবদিক থেকে খারাপ। শরীরের পক্ষে তো বটেই! মানবিক কারণেও খাদ্য অপব্যয় করা উচিত নয়। পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় ন্যূনতম খাদ্য পাচ্ছে না রে মহুয়া!'

'ওই শুরু হলো তোমার মানবতার স্বপক্ষে বক্তৃতা! ওসব আমি শুনতে চাই না। পৃথিবীতে কোন বোনই একথা শুনবে না। এই নাও, দুধটুকু খাও।'

'আবার দুধ…?'

'তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। তোমাকে আমি লাইব্রেরী রুমে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে তালা মেরে দেব।'

'সে কি! কেন?'

'বিশ্রাম দরকার, তাই। বেডরুমে যাবার দরজা খোলা থাকবে, কিন্তু ড্রয়িংরুমে যাবার দরজা বন্ধ। শহীদ ফিরছে আজ। কামালও এই এল বলে। ওরা তোমাকে নিয়ে রাজ্যের গল্প জুড়ে দেবে, খুন-খারাবির কাহিনী নিয়ে মেতে উঠবে—বারোটা বাজবে তোমার বিশ্রামের। দরকার নেই ওসবে, কড়া শাসনের ভঙ্গিতে বলল মহুয়া।

'আমাকে তুই তাই বলে বন্দী করে রাখবি সত্যি সত্যি?' ভদ্রলোক অসহায়

শিশুর মত অভিমানভরে জানতে চাইল।

মহুয়া বলল, 'তা নয়তো কি? বন্দী করে না রাখলে শুনবে তুমি কারও কথা?'

ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে মহুয়ার একটা হাত ধরে বলল, 'মহুয়া, শোন বোন, খুব জরুরী একটা কাজ আছে, অন্তত একঘণ্টার জন্যে আজ একবার আমাকে বাইরে যেতে দিতেই হবে, তা না হলে···।'

মহুয়া ভুরু কুঁচকে বলল, 'কাজ? কি কাজ? কোনও কাজ নেই। শরীরটাকে সুস্থ রাখা এখন তোমার সবচেয়ে বড় কাজ। ডাক্তার বলে দিয়েছেন হাঁটাহাঁটি সম্পূর্ণ নিষেধ। কমপ্লিট বেড-রেস্ট নিতে বলেছেন। চেয়ারে বসে যে ঘুরে বেড়াচ্ছ, এটাই তো অন্যায় হচ্ছে!'

ভদ্রলোক ওরফে কুয়াশা বলল, 'কিন্তু মহুয়া, আমি যেতে না পারলে যে···।'

'বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে, না? হোক। শরীর ভাল হয়ে গেলে সে ক্ষতি পূরণ করে নিতে পারবে। যাওয়া তোমার চলবে না। শোনো, দাদা, তোমার সীমানা পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছি আমি। লাইব্রেরী, দক্ষিণ দিকের করিডর, বেডরূমগুলো এবং পিছন দিকের বারান্দা—এই হলো তোমার এলাকা। এর বাইরে গেলে কড়া শাস্তি পেতে হবে তোমাকে।'

'ড্রয়িংরুম···?'

'না।'

কুয়াশা বলল, 'কিন্তু শহীদ যদি ডাকে বা···।'

'ডাকবে না। ও এলে আমি ওকে নিষেধ করে দেব। তবু যদি কোন কারণে ড্রয়িংরূমে যাবার প্রয়োজন দেখা দেয়, আগে আমার অনুমতি নিতে হবে। চলো এবার।'

লাইব্রেরীতে ঢুকে দরজাগুলো পরীক্ষা করল মহুয়া। ড্রয়িংরূমে ঢোকার দরজাটা অপরদিক থেকে বন্ধ আছে দেখে এদিক থেকে আর বন্ধ করল না ও। বলল, 'ঠিক সাড়ে দশটায় এসে নিয়ে যাব বাথরূমে। এগারোটার সময় গ্লুকোজ, সাড়ে এগারোটায় হরলিকস্, বারোটায় ইঞ্জেকশন, সাড়ে বারোটায় লাঞ্চ, একটায় বেডরূমে ঘুম, তিনটের সময় নাস্তা, সোয়া তিনটেয় ইঞ্জেকশন, পাঁচটায় দুধ-সাবু···'

'চা? এক কাপ চা দিবি না?'

মহুয়া নির্মমভাবে বলল, 'না। চা-সিগারেট নিষেধ। সাড়ে সাতটায় ডিনার। সাড়ে ন'টায় বিছানা—মনে আছে তো সব? নিয়মের এদিক-ওদিক যেন না হয়। কথা না শুনলে বেডরূমের ভিতর বন্ধ করে রাখব চব্বিশ ঘণ্টা।'

কুয়াশা বলল, 'কিন্তু আমি এখন দিব্যি সুস্থ হয়ে গেছি। অনেকদিন তো হলো, আর কেন এভাবে বসে বসে সময় নষ্ট করব? এই দেখ্ না, কি রকম সুন্দর হাঁটতে পারি আমি···'

কুয়াশা চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল, ছুটে এল মহুয়া। কুয়াশার দু'কাঁধ ধরে চাপ দিয়ে বসিয়ে রাখল তাকে, 'খবরদার! দাঁড়ালেই বেডরূমে নিয়ে গিয়ে তালা লাগিয়ে দেব বলে দিচ্ছি···'

হেসে ফেলল কুয়াশা। বলল, 'কিন্তু এভাবে থাকলে আমি যে পঙ্গু হয়ে যাব। হাজার হাজার মানুষ আমার কাছ থেকে নির্দেশ পাবার জন্যে অপেক্ষা করছে। ল্যাবরেটরিতেও ফেরা দরকার আমার। পেরুর বিজ্ঞানী রীলকে কেরো ক্যান্সার নিরাময়ের একটা ওষুধ আবিষ্কার করেছে আমার লেখা একটা আর্টিকেল থেকে কেমিক্যাল কম্বিনেশন-এর সূত্রের সাহায্যে, সেই ওষুধের গুণাগুণ প্রমাণ করার দায়িত্ব আমাকে দেবার জন্যে ঢাকায় এসেছে সে। বেচারা কতদিন আর অপেক্ষা করবে বল্? ওদিকে দক্ষিণ মেরুতে কী এক রহস্যময় কারণে জমাট বরফ হু হু করে গলতে শুরু করেছে, খবর দিয়েছে বিজ্ঞানী আলজের সিমুভিচ। যে হারে বরফ গলছে, মাস দেড়েক যদি এভাবে গলতে থাকে, পৃথিবীর অর্ধেক জমি ডুবে যাবে অকল্পনীয় বন্যায়। রহস্যটা কি, কেন হঠাৎ বরফ গলতে শুরু করেছে, জানতে হলে সরেজমিনে তদন্ত করার জন্যে এক্ষুণি রওনা হয়ে যেতে হয় দক্ষিণ মেরুতে। তারপর, আনতারায় পৌঁছে ওমেনা খবর পাঠিয়েছে বেতারে, সেখানের বিজ্ঞানীরা নাকি প্রমাণ পেয়েছে, দূর মহাশূন্য থেকে কয়েকটা উপগ্রহ কক্ষচ্যুত হয়ে ছুটে আসছে আনতারার দিকে, তার মানে পৃথিবীর দিকেও—এ ব্যাপারেও চোখ বুজে থাকা যায় না···।'

অধৈর্য, অসহিষ্ণু কণ্ঠে মহুয়া বলল, 'ব্যস, ব্যস! আর বলতে হবে না। দুনিয়ার সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে দিচ্ছি না আর আমি তোমাকে। দুনিয়া রসাতলে যাক, তোমাকে আমি ছাড়ছি না।'

'কিন্তু কত দিন?'

'মাস খানেক তো বটেই। কিন্তু এত অস্থিরতার কি আছে? আমার কাছে থাকতে কি তোমার খুব অসুবিধে হচ্ছে?'

কুয়াশা বলল, 'না, তা নয়। বুঝিস তো, কাজগুলো না করলে···।'

'পরে করবে। আমি ভাবছি, স্থায়ীভাবে তোমাকে আমি আমার কাছে রেখে দেব। শরীরের ওপর অত্যাচারটা অন্তত করতে পারবে না আমার কাছে থাকলে। নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার শখটাও একটু কমাতে পারব মনে হয়।'

কুয়াশা বলল, 'তোর সব কথা মেনে নেব, শুধু আজ বিকেলে একঘণ্টার জন্যে যদি বাইরে বেরুতে দিস্···!'

'না!' বলে করিডরে বেরিয়ে গেল মহুয়া। বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল দরজা।

খুট্ করে শব্দ হলো একটা। ঘাড় ফিরিয়ে অপর দরজাটির দিকে তাকাল কুয়াশা। দেখল খুলে যাচ্ছে সেটা ধীরে ধীরে। একমুহূর্ত পর উঁকি দিয়ে তাকাল কামাল। মহুয়াকে কোথাও দেখতে না পেয়ে এক গাল হাসল সে। লাইব্রেরীতে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এসে দাঁড়াল কুয়াশার সামনে।

'কেমন আছ?'

'ভাল না। মহুয়া নিষ্কৃতি দিচ্ছে না।'

কামাল চাপাস্বরে বলল, 'কঠিন পাত্রী। আমাকে একবার একটানা একুশ দিন এই রকম বন্দী করে রেখেছিল, শেষে জানালার শার্সি ভেঙে রাত একটার সময় পানির পাইপ বেয়ে নিচে নেমে পালিয়ে বাঁচি।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল কুয়াশার মুখ, 'আমিও তাহলে···!'

আঁতকে উঠল কামাল, 'না! ওই পদ্ধতিতে পালালে মহুয়াদি নির্ঘাত সন্দেহ করবে আমিই তোমাকে বুদ্ধিটা যুগিয়েছি। দা দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে আমাকে তাহলে।'

'তাহলে উপায়?' ফিসফিস করে জানতে চাইল কুয়াশা।

নিরুপায় ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়তে নাড়তে কামাল বলল, 'উপায় নেই। বুঝিয়ে-শুনিয়ে দেখো, যদি দয়া হয়।'

'গত পাঁচ ছয় দিন তো কম চেষ্টা করিনি। এখন শুধু কান্নাকাটি করাটাই বাকি আছে।'

কামাল চিন্তিতভাবে বলল, 'শেষ অস্ত্র ওটা। করো কান্নাকাটি—দেখো লাভ হয় কিনা!'

'কোন লাভ হবে না।' অকস্মাৎ বজ্রপাত ঘটল কামালের ঠিক পিছনে। মহুয়ার কণ্ঠস্বর। পর মুহূর্তে কামাল অনুভব করল তার কান দুটো দুই হাত দিয়ে মুচড়ে ধরে পিছন দিকে টানছে কে যেন। পিছিয়ে যেতে যেতে গলা ছেড়ে চিৎকার জুড়ে দিল কামাল। লাভ সত্যি হলো না। কানের টানে পিছু হটতে হটতে দরজা পেরিয়ে ড্রয়িংরুমের ভিতর ঢুকে পড়ল কামাল।

হোঃ হোঃ করে হাসতে শুরু করেছে কুয়াশা। দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেও হাসতে থাকল সে।

খানিক পর কামালের চিৎকার থামল। মহুয়ার কণ্ঠস্বরও স্তিমিত হয়ে এল একসময়। ধীরে ধীরে কুয়াশা কোটের ভিতরের পকেট থেকে একটা সিগারেট কেস সদৃশ যন্ত্র বের করল। ক্ষুদ্রাকৃতি বেতার যন্ত্র ওটা। সেটটা অন্ করে একজন সহকারীর সাথে কথা বলতে শুরু করল নিচু গলায়।

ক'মিনিট পর সেটটা অফ করে পকেটে রাখল কুয়াশা। এমন সময় ড্রয়িংরুমে ঢোকার দরজাটা খুলে গেল আবার। সহাস্যে প্রবেশ করল কামাল। হাতে একটা ট্রে। তাতে একগ্লাস পানি। এবং একটা পিরিচে একটা দু'রঙা ক্যাপসুল।

'আবার কানমলা খাবে না তো?'

কামাল সগর্বে বলল, 'না। অনুমতি দিয়েছে। খেয়ে নাও ক্যাপসুলটা। মহুয়াদি বলেছে তোমার সান্নিধ্য মাঝেমধ্যে আমি পেতে পারি, যদি তোমাকে সেবা করার উপযুক্ততা প্রমাণ করতে পারি আমি।'

ক্যাপসুলটা খেয়ে পানির গ্লাসটা ট্রের উপর নামিয়ে রাখল কুয়াশা। চাপা গলায় বলল, 'ওই আসছে!'

কামাল অমনি ঝাঁপিয়ে পড়ল কুয়াশার দুই পায়ের উপর।

'কি হলো! ও কি! পা টিপছ কেন? ছাড়ো, ছাড়ো।'

কামাল নিবেদিত প্রাণ সেবকের মত অত্যন্ত সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে কুয়াশার পা টিপে দিচ্ছে···।

'আহ্! সুড়সুড়ি লাগছে তো!'

কুয়াশার কথায় কর্ণপাত করছে না কামাল, যেন শুনতেই পাচ্ছে না।

'কী হচ্ছে?'

না থেমে, পা টিপতে টিপতে বলল কামাল, 'সেবা করছি।'

মহুয়া ওদের কাছে এসে দাঁড়াল। হাসি চেপে রাখা কঠিন হয়ে পড়ল তার পক্ষে। বলল, 'সেবা বুঝি একে বলে? দাদা কি বলছে শুনতে পাচ্ছ না?'

কুয়াশা বলল, 'ছাড়ো! ছাড়ো! সুড়সুড়ি লাগছে আমার···!'

কামাল বলল, 'তুমি কি বলো, মহুয়াদি? সারা দিন রাত বসে থাকলে পায়ের শিরাগুলোয় রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে পারে। টিপে দিলে উপকার হবে। সুড়সুড়ি একটু লাগলেই কি করা যাবে···! হাসাহাসি করা তো ভাল!'

কুয়াশা বলল, 'কথাটা একেবারে বাজে বলেনি কামাল, বুঝলি মহুয়া। কিন্তু এই সুড়সুড়িও তো আমি সইতে পারছি না! এক কাজ করলে হয়, একটু হাঁটাহাঁটি করলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়ে যাবে···।'

মহুয়া বলল, 'রক্ত চলাচলের কথাটা সত্যি আমি ভাবিনি। ঠিক আছে, প্রতি ঘণ্টায় পাঁচ মিনিট করে চেয়ার ছেড়ে হাঁটাহাঁটি করতে পারবে তুমি এখন থেকে।'

শহীদের রসাত্মক কণ্ঠস্বর ভেসে এল দরজার কাছ থেকে, 'ভুল করলে, মহুয়া। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কুয়াশা বাংলাদেশটা একবার চক্কর দিয়ে ফিরে আসতে পারবে। ওকে আটকে রাখতে হলে···'

'আরে এসো, এসো!' সহাস্যে, ভরাট গলায় বলল কুয়াশা।

কামাল গম্ভীর হয়ে ওঠে হঠাৎ। বলে, 'তোর জন্যেই অপেক্ষা করছি, শহীদ।'

শহীদের ভুরু কুঁচকে ওঠে, 'কি ব্যাপার?'

কামাল বলল, 'কাগজে জাস্টিস ইব্রাহিম খাঁ লোদীর নিহত হবার খবর পড়িসনি?'

'আজ, খানিক আগে, পড়েছি।'

কামাল বলল, 'মি. সিম্পসন এবং আমার, তথা গোটা পুলিসবাহিনীর জীবনে সবচেয়ে রহস্যময় কেস এটা, শহীদ। যার মাথা মুণ্ডু কিছুই উদ্ধার করা যাচ্ছে না। মি. সিম্পসন তাঁর পদত্যাগপত্র তৈরি করে রেখেছেন। তোর সাথে পরামর্শ করবেন শুধু একবার, তারপর চাকরিতে ইস্তফা দেবেন।'

'বলিস কি? মি. সিম্পসন পদত্যাগ করবেন? কেন?'

কামাল বলল, 'আই. জি. সাহেবকে কেসটা সম্পর্কে পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা দিতে পারছেন না বলে। রহস্যটা এমনই জটিল, যার মীমাংসা সম্ভব নয়।'

কুয়াশা বলল, 'তোমার মুখে এরকম নেতিবাচক কথা মানায় না. কামাল। কোন কেসই মীমাংসার বা সমাধানের অযোগ্য নয়।'

মহুয়া বাধা দিল এবার, 'দাদা!'

শহীদ বলল, 'ওহ্। কুয়াশার বাক স্বাধীনতাও হরণ করেছ তুমি?'

মহুয়া বলল, 'তোমরা দু'জন ড্রয়িংরুমে যাও। এখুনি ।'

কামাল বলল, 'যাচ্ছি।'

মহুয়া বলল, 'আর শোনো, মি. সিম্পসন পদত্যাগ করতে চাইছেন—করুন, তাকে দয়া করে বাধা দিয়ো না তোমরা। ভদ্রলোক পদত্যাগ করলে অনেক দুশ্চিন্তা

থেকে বাঁচব আমি। রাত দুপুরে টেলিফোনও আসবে না, দাদার পিছনেও ভদ্রলোক ফেউয়ের মত লেগে থাকবেন না।'

কামাল বলল, 'তবু, তাঁর শেষ ইচ্ছাটা পূরণ করার ব্যবস্থা করা দরকার। তিনি আমাকে অনুরোধ করেছেন, শহীদ বাড়ি ফিরলেই আমি যেন টেলিফোন করে খবরটা তাঁকে দিই।'

শহীদ বলল, 'ফোন কর তুই।'

কুয়াশা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, মহুয়া ধমক দিয়ে বলল, 'না! কোন কথা নয় আর।'

কামালকে অনুসরণ করে শহীদও বেরিয়ে এল লাইব্রেরী থেকে।

তেপয়ের সামনে সোফায় বসে ডায়াল করতে শুরু করল কামাল। মি. সিম্পসনকে অফিসে পাওয়া গেল না। ইন্সপেক্টর জাহিদ হোসেনকে মেসেজটা দিয়ে ফোন ছেড়ে দিল কামাল।

শহীদ পাইপ ধরাতে ধরাতে বলল, 'কুয়াশার ব্যাপারটা মি. সিম্পসন সন্দেহ করেননি তো?'

কামাল হেসে উঠল, 'এক বিন্দু না! এই তো, পরশু দিন ঘণ্টা দু'য়েক গল্প করে গেলেন কুয়াশার সাথে। গাড়িতে ওঠার সময় আমাকে কি বললেন জানিস? বললেন, ভদ্রলোক আশ্চর্য বুদ্ধি রাখেন। যেমন শার্প ব্রেন, ব্রেনটাকে খাটানও তেমনি। দুনিয়ার এমন কোন সাবজেক্ট নেই যার সম্পর্কে খোঁজ খবর না রাখেন।'

'তুই কি বললি?'

কামাল বলল, 'বললাম, শহীদের বন্ধু তো, উঁচু স্তরের ইনটেলেকচ্যুয়াল তো হবেই। বারবার ঘাড় দুলিয়ে বললেন, ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ!'

হেসে উঠল শহীদ ও কামাল।

'গেটে লেবু যেন চেল্লাচ্ছে? দেখ তো?'

জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল কামাল। কি সে দেখল কে জানে, বিড় বিড় করে উচ্চারণ করল, 'ব্যাটা কেষ্টা? সর্বনাশ না করে ছাড়বে না দেখছি!'

কথাগুলো বলে চরকির মত ঘুরে দাঁড়িয়ে ড্রয়িংরুম থেকে বেরিয়ে গেল সে।

অপর দরজা দিয়ে কফির ট্রে নিয়ে প্রবেশ করল মহুয়া। কামালকে ড্রয়িংরুমে দেখতে না পেয়ে থমকে দাঁড়াল সে। শহীদের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'ব্যাড এলিমেন্টটা কোথায় গেল?'

মৃদু হেসে শহীদ বলল, 'ডি. কস্টাকে গেট থেকে তাড়াতে।'

'তিনি আবার এসেছেন বুঝি জ্বালাতে?'

পাশের সোফায় বসল মহুয়া তেপয়ের উপর ট্রে নামিয়ে রেখে, 'কফি। বিয়ে কেমন খেলে?'

শহীদ বলল, 'ভাল। সঞ্চিতার বরটা আমার পরিচয় পেয়ে বিতিকিচ্ছি একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছিল, জানো!'

'মানে?'

'বরের আসন থেকে সোজা উঠে আসে সে আমার সামনে, পায়ে হাত দিয়ে

সালাম করে…।'

সকৌতুকে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকে মহুয়া, 'বলো কি। এত বড় ভক্ত সে তোমার?'

শহীদ বলল, 'কারণ আছে। ওর বাবাকে এক লোক ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করেছিল কয়েক বছর আগে। ভদ্রলোক তখন ঢাকায় ব্যবসা করতেন। আমার কাছে সাহায্যের আশায় আসেন তিনি। সাহায্য করেও ছিলাম। যে লোকটা ব্ল্যাকমেইল করছিল সে একটা খুনও করে। তাকে ধরে পুলিসের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। এখনও সে জেলে পচছে। সে যাক, বাপের কাছে আমার নাম শুনেছিল হাসান…।'

'সঞ্চিতার স্বামীর নাম?'

শহীদ বলল, 'হ্যাঁ।'

'সঞ্চিতার ভাই, তোমার বন্ধু রহমান সাহেব কি বললেন?'

শহীদ বলল, 'কি আর বলবে, সে-ও তার সেই ভারি গলায় হোঃ হোঃ করে অট্টহাসি হাসতে লাগল আর আমার সম্পর্কে যা নয় তাই প্রশংসা গাইতে শুরু করল। সে এক লজ্জাকর অবস্থা…।'

মহুয়া বলল, 'বেশ স্ফূর্তিতেই সময় কেটেছে তাহলে তোমার। তা, কক্সবাজারে এবার শীত কেমন?'

'গত পঁচিশ বছরের মধ্যে এত শীত পড়েনি, ছত্রিশ ডিগ্রী পর্যন্ত নেমেছিল।'

ওদিকে গেটে তুমুল বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে গেছে।

গেটের বাইরে ডি. কস্টা। গেটটা খোলাই। ডি. কস্টার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের মত পথরোধ করে কামাল। ডি. কস্টা তার সরু কোমরে দু'হাত রেখে পল্টনী বাংলায় দ্রুত ভাষণ দিয়ে চলেছে।

'হামার অটিকার হাপনি হরণ করিটে পারেন না! টিনি হামার ফ্রেণ্ড, হামি টাহার সহিট ডেখা করিব, ইহাটে হাপনি কেন প্রবলেম ক্রিয়েট করিটেছেন? ভালোয় ভালোয় যডি বাড়ির ভিটর ঢুকিটে না ডেন, পরিণাম বহুট খারাপ হইবে এবং টাহার জন্যে এই মি. ডি. কস্টা কোন প্রকারেই ডায়ী ঠাকিবে না…।'

কামাল শান্ত। দৃঢ়কণ্ঠে শুধু বলল, 'এখনও বলছি, ভাগেন। আপনার বস্ মি. কুয়াশার মঙ্গল যদি চান, আর এক মুহূর্তও এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন না।'

'বাট হোয়াই। টাহার সহিট হামার জরুরী টক আছে!'

কামাল বলল, 'জানেন তো, মি. সিম্পসন এমনিতেই সন্দেহ করেন কুয়াশা এ বাড়িতে আসা-যাওয়া করে। এ বাড়ির ওপর সর্বক্ষণ একজন লোক নজর রাখে, সে ব্যবস্থা মি. সিম্পসন অনেকদিন থেকে করে রেখেছেন। সেই লোক যদি আপনাকে এখানে ঘন ঘন দেখে, পরিষ্কার বুঝতে পারবে সে, কুয়াশা এ বাড়িতেই আছে। কুয়াশা গবেষণা করতে গিয়ে ল্যাবরেটরিতে অ্যাক্সিডেন্ট করে আহত হয়েছে, এ খবর মি. সিম্পসন জানেন। আপনাকে দেখলেই তিনি বাড়ি সার্চ করাবার জন্যে লোক পাঠাবেন…।'

ডি. কস্টা বলল, 'সার্চ করুক আর মার্চ করুক, আমার ফ্রেণ্ডকে ঢরার সাঢ্য মি.

সিম্পসনের নাই। ওসব ফালটু কঠা বাড ডিন। হামি জানিটে চাই, ঢুকিটে ডিবেন কিনা।'

'না।'

'ঠিক আছে, একটা জরুরী মেসেজ আছে, নিয়া যাইবেন?'

কামাল বলল, 'তা নিয়ে যেতে পারি। বলুন, কি বলতে হবে কুয়াশাকে?'

'বলবেন, বিশটা টাকা ডরকার হামার।'

কামাল মারমুখো হয়ে উঠল, 'ওহ্! এই বুঝি আপনার জরুরী মেসেজ? পারব না আমি কুয়াশাকে গিয়ে একথা বলতে।'

'প্লীজ! মি. কামাল! হাপনাকে এই ডয়াটুকু করিটেই হইবে! কাজ কর্ম না করিয়া করিয়া হাটে পায়ে খিল ঢরিয়া যাইটেছে, এক বোতল মড্যপান না করিলে শরীরটা চাঙ্গা হইবে না! বিশটা টাকা হামাকে যেভাবে হউক যোগার করিয়া ডিন…!'

কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কামাল জিজ্ঞেস করল, 'বিশ টাকা দিলে আর আসবেন না তো?'

ডি. কস্টা চিন্তা করল খানিক, 'একদিন পর পর আসিব, বিশটা করিয়া টাকা ডিলে চলিয়া যাইব।'

কামাল বলল, 'একদিন পর পর এলেও পুলিস সন্দেহ করবে। আপনি মদের দোকানে ধার করুন, পরে কুয়াশার কাছ থেকে টাকা নিয়ে টাকা দিয়ে দেবেন।'

ডি. কস্টা বলল, 'লোন ডিবে না হামাকে…।'

কামাল বলল, 'সেক্ষেত্রে মদ খাওয়া বন্ধ রাখুন।'

'দ্যাটস ইমপসিবল্! মড্য হামাকে পান করিটেই হইবে! ইংরেজের রক্ট…।'

কামাল চটে উঠে বলল, 'আপনি যাবেন কিনা তাই বলুন।'

ডি. কস্টা বলল, 'বিশ টাকা ডিয়া ডিন, ভ্যানিশ হইয়া যাইব।'

'আর কোন দিন আসবেন না তো?'

ডি. কস্টা বলল, 'কঠা ডিটেছি।'

বিশটা টাকা দিল পকেট থেকে বের করে কামাল। ছোঁ মেরে দশ টাকার নোট দুটো কামালের হাত থেকে নিয়ে দু'পা পিছিয়ে গেল ডি. কস্টা, বলল, 'হাজার বার আসিব। প্রট্যেক ডিন আসিব! হামার বস্ যট ডিন এ বাড়িটে ঠাকিবেন টট ডিন যখন ইচ্ছা টখন আসিব!'

কামাল তাড়া করল, 'তবে রে…।'

খিঁচে দৌড়ুতে শুরু করল ডি. কস্টা। দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল তার পাটখড়ির মত রোগা শরীরটা। কামাল কয়েক পা মাত্র এগিয়ে ছিল, ফিরে এল সে বাড়ির ভিতর। লেবু বেরিয়ে এল গেটের আড়াল থেকে।

'কি রে, তুই লুকিয়ে ছিলি মনে হলো?'

লেবু বলল, 'ভ-ভ-ভ ভয়ে।'

'ভয়ে লুকিয়েছিলি? ডি. কস্টাকে ভয় করিস নাকি? কেন?'

লেবু বলল, 'ঠ-ঠ-ঠ-ঠকিয়ে দে-দে-দেবে।'

হাসি চেপে কামাল বলল, 'ঠকিয়ে টাকা পয়সা আদায় করে নিয়ে যাবে এই তোর ভয়?'

লেবু মাথা কাত্ করে বলল, 'জ্বী-জ্বী। আ-আ-মার বু-বুদ্ধি ক-ক-কম কি-কিনা!'

'বুদ্ধি যতই কম হোক, ওই ডি. কস্টাকে যেন বাড়ির ভিতর ঢুকতে দিসনে! শোন, জীপ নিয়ে খানিকক্ষণের মধ্যে মি. সিম্পসন আসবেন, গেট খুলে দিবি, বুঝলি? এখন গেট বন্ধ করে রাখ।'

লেবু গেট বন্ধ করে দিতেই কামাল বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

দুই

ড্রয়িংরুমে ফিরে এসে শহীদের পাশে বসে কামাল পট থেকে কাপে কফি ঢালতে ঢালতে বলল, 'ডি. কস্টা বড্ড বিরক্ত করছে।'

'মদ খাবার টাকার জন্যে এসেছিল বুঝি?'

চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠল কামালের, 'জানলি কিভাবে?'

'চট্টগ্রাম যাবার আগে পর পর সাতদিন বিশ টাকা করে দিয়েছি। কথা আদায় করে নিয়েছিল, রোজ দিতে হবে। গত দু'দিন নিয়েছে তোর মহুয়াদির কাছ থেকে।'

কামাল বলল, 'ব্ল্যাকমেইলিং করছে লোকটা। আমার কাছ থেকেও বিশ টাকা নিল এখন।'

শহীদ বলল, 'উপায় কি, দিয়ে যেতে হবে। ভাল কথা, কেসটা সম্পর্কে বল শুনি।'

কামাল মুখ খুলতে যাবে, নিচে থেকে ভেসে এল জীপের শব্দ। কামাল সোফা ত্যাগ করল হাতে কফির কাপ নিয়ে। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে, 'ওই আসছেন মি. সিম্পসন। ওর মুখেই শোন্ সব। মোস্ট ইন্টারেস্টিং কেস, শহীদ।'

সিঁড়িতে বুটজুতোর শব্দ পাওয়া গেল খানিক পর।

কামাল বসল শহীদের ডান পাশের সোফায়। মি. সিম্পসনকে দেখা গেল এক মুহূর্ত পর দোর-গোড়ায়।

'হ্যালো!'

শব্দটা উচ্চারণ করে ড্রয়িংরুমে ঢুকলেন মি. সিম্পসন। পরনে সিভিল ড্রেস। সাদা শার্ট, লাল টকটকে টাই, ব্রাউন রঙের গরম কাপড়ের স্যুট পরনে। মাথায় নতুন কেনা একটা হ্যাট। হাতে জ্বলন্ত পাইপ। বাঁ হাতে এরিনমোর টোবাকোর কৌটা।

শহীদ উঠে দাঁড়াল, 'আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

নিঃশব্দে করমর্দন করলেন মি. সিম্পসন। প্রথমে শহীদ, পরে কামালের সাথে।

শহীদ বলল, 'বসুন।'

সকলে আসন গ্রহণ করল। কারও মুখে কথা নেই কয়েক মুহূর্ত। মি. সিম্পসন বাঁ দিকে কাত হয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করলেন। কপালের ঘাম মুছলেন।

টকটকে লাল হয়ে আছে মুখটা। উত্তেজিত এবং নার্ভাস দেখাচ্ছে তাঁকে। কিন্তু নিজেকে তিনি সামলে রেখেছেন এখন পর্যন্ত।

নিস্তব্ধতা ভাঙল শহীদই, 'সত্যিই কি…?'

মি. সিম্পসন শহীদের প্রশ্নটা বুঝতে পেরে, ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'তাছাড়া উপায় কি, বলো? কেসটা সমাধানের সম্পূর্ণ বাইরে! আই. জি. সাহেবকে সম্ভাব্য সমাধান শোনাবার চেষ্টাও সফল হয়নি। অনুমান করে কিছু যে বলব, তারও উপায় নেই। কেসটা একটা বিকট ধাঁধা ছাড়া আর কিছুই নয়। নিশ্চয়ই শুনেছ কামালের মুখে…?'

শহীদ বলল, 'অস্থির হবার কিছু নেই। না, এখনও আমি কিছুই শুনিনি। কামাল, মি. সিম্পসনকে এক কাপ কফি দে।'

কামাল পট থেকে গরম কফি ঢালল কাপে। মি. সিম্পসন ধন্যবাদ বলে কাপটা ট্রে থেকে তুলে নিয়ে চুমুক দিলেন ঘন ঘন। বললেন, 'ঘটনাটা শোনার পর তুমিও আমাদের সাথে একমত হবে, কেসটা সত্যি সমাধানের বাইরে।'

শহীদ পাইপে অগ্নিসংযোগ করে ধোঁয়া ছাড়ল এক মুখ। বলল, 'মনে হয় না। অপরাধ যখন একটা ঘটেছে, অপরাধীর অস্তিত্ব তখন থাকতে বাধ্য। সে যত বড় বুদ্ধিমানই হোক, কোথাও না কোথাও সে, সামান্যতম হলেও, ভুল না করে পারে না। সেই ভুলটা কি, ধরতে পারলেই অপরাধীকে চেনা যাবে।'

'এই রকম যত থিওরি আছে সব আমি জানি, শহীদ।'

'অফকোর্স!'

মি. সিম্পসন বললেন, 'জেনেও স্বীকার করছি, এই কেসের মাথা মুণ্ডু কিছুই আমি বুঝতে পারছি না।'

শহীদ বলল, 'অনেক সময় হয় কি জানেন, ছোট্ট একটা জিনিস চোখে ধরা পড়লেই রহস্যের সমাধান হয়ে যায়। জিনিসটা সবার চোখের সামনে থাকে, কিন্তু কারও চোখে ধরা পড়ে না। এমন সময় নতুন এক লোককে সেখানে পাঠালে, তার চোখে জিনিসটা প্রথমেই ধরা পড়ে যায়। আমার মনে হয়, আপনি কাহিনীটা বললে আমার চোখেও তেমন কিছু ধরা পড়তে পারে…।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'পদত্যাগ আমি করব, এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ আমি জানি, এ কেসের সমাধান আমার দ্বারা অসম্ভব। তবে পদত্যাগ পত্র পেশ করার আগে তোমার সাথে কেসটা সম্পর্কে একবার আলোচনা করতে চাই আমি। তোমার ওপর আমার বিশ্বাস এবং আস্থা কতটুকু, বুঝিয়ে বলতে পারব না। যদিও এই কেসের ব্যাপারে তুমিও তেমন কিছু করতে পারবে বলে আমি মনে করি না, তবু সবটা তোমাকে শোনাতে চাই। শোনার পর তোমার মুখ থেকে কেসটা সম্পর্কে একটা মন্তব্য আশা করব আমি। তারপর অফিসে ফিরে গিয়ে পদত্যাগ পত্র পেশ করব।'

শহীদ মৃদু হাসল, 'হয়তো কাহিনীটা শোনার পর, সমাধানের আশ্বাস দিতে পারব আমি। সেক্ষেত্রে তো আপনার পদত্যাগের দরকার পড়বে না, কেমন?'

মি. সিম্পসন কথা বললেন না।

কামালও গম্ভীর।

শহীদ বলল, 'আচ্ছা, সে দেখা যাবে। আপনি শুরু করুন।'

শহীদের কথা শেষ হতে মি. সিম্পসন ধীরে ধীরে পাইপটা নামিয়ে রাখলেন তেপয়ের উপর। তারপর উঠে দাঁড়ালেন সোফা ছেড়ে।

'ও কি!'

শহীদ অবাক হয়ে বলল।

কোটের দুই সাইড-পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিতে দিতে মি. সিম্পসন বললেন, 'সূত্রগুলোও সাথে করে নিয়ে এসেছি। এই দেখো।'

দু'পকেট থেকে দুটো আগ্নেয়াস্ত্র বের করলেন মি. সিম্পসন। বসলেন। একটা পিস্তল, অপরটি রিভলভার--রাখলেন মধ্যবর্তী তেপয়ের উপর পাশাপাশি।

শহীদ চোখ নামিয়ে দেখল আগ্নেয়াস্ত্র দু'টির একটি আইভর-জনসন ·৩৮। অপরটি ব্রাউনিং ·৩২ অটোম্যাটিক।

হঠাৎ মৃদু ঝিরঝির শব্দ এল জানালা গলে।

কামাল নড়েচড়ে বসল, বলল, 'মাঘ মাসে বৃষ্টি! হাড় কাঁপানো শীত পড়বে এবার। মি. সিম্পসন, আর এক কাপ কফি চলবে নাকি?'

'চলবে।'

কামাল উঠে দাঁড়িয়ে অন্দর মহলের দিকে যাবার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁক ছাড়ল, 'মহুয়াদি, চার কাপ!'

কামাল ফিরে এসে বসল সোফায়।

মুচকি মুচকি হাসছিল শহীদ। মি. সিম্পসন ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে কিছু যেন বোঝার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সফল না হয়ে অগত্যা প্রশ্ন করলেন, 'চার কাপ, কামাল? এখানে তো আমরা তিনজন···।'

কামাল বলল, 'শহীদের বন্ধু এনাম আহমেদ লাইব্রেরী রুমে বিশ্রাম নিচ্ছে, তার জন্যেও···।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'ওহ্-হো! মাথার ঠিক নেই, ভদ্রলোকের কথা ভুলেই গেছি। তা, কেমন আছেন মি. আহমেদ? হাঁটাচলা করতে পারছেন?'

কামাল বলল, 'না। আরও কিছু দিন সময় লাগবে বলে মনে হয়।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'ভদ্রলোককে ডাকলে হয়। কাহিনীটা তিনিও শুনতেন। অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং ক্ষুরের মত ধারাল বুদ্ধি রাখেন তিনি, কথা বলে বুঝেছি তাঁর সাথে।'

কামাল বলল, 'কিন্তু ডাক্তারের কড়া নিষেধ, কথা বলা চলবে না।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'তবে থাক।'

শহীদ বলল, 'হ্যাঁ, এবার আপনি শুরু করুন, মি. সিম্পসন।'

মি. সিম্পসন নড়েচড়ে বসলেন সোফায়। নতুন করে পাইপে অগ্নিসংযোগ করে বললেন, 'প্রথম থেকেই শুরু করি। জজ ইব্রাহিম খাঁ লোদীকে তুমি চিনতে। তবু তাঁর সম্পর্কে দু'একটা কথা তোমাকে বলে নিই। জজ হিসেবে তিনি প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। জজ কোর্টের ক্রিমিন্যাল ডিভিশনের বিচারকের দায়িত্ব

পালন করেছেন তিনি সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বছর। বেশ ক'বছর আগে তিনি রফিক চৌধুরী নামে এক যুবককে পনেরো ঘা বেত এবং আঠারো মাসের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন, ডাকাতি করার অপরাধের শাস্তিস্বরূপ। বিচার চলাকালে, কোর্টরুমে, রফিক জজ লোদী সাহেবকে হুমকি দেয়। বলে, ছাড়া পেলে আপনাকে আমি দেখে নেব। এ ধরনের ঘটনা এর আগেও কোর্টরুমে ঘটেছে, নতুন কিছু নয়। অপরাধীরা প্রায়ই জজ সাহেবকে গালাগালি করে, হুমকি দেয়। কিন্তু সাধারণত ব্যাপারটা সীমিত থাকে কোর্টরুমেই। অপরাধীরা জেল থেকে ছাড়া পেয়ে জজ সাহেবকে খুঁজে বেড়ায় না খুন করার জন্যে বা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে। কিন্তু এ ঘটনাটা অন্য রকম, সম্পূর্ণ বিপরীত। রফিক চৌধুরী হুমকি দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সে জজ লোদী সাহেবকে খুন করে। আপাতদৃষ্টিতে এই হলো সত্য ঘটনা।'

শহীদ বলল, 'আপনি বলছেন আপাতদৃষ্টিতে—তার মানে প্রকৃত সত্য এটা নয়? প্রকৃত ঘটনা তাহলে কি?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'প্রকৃত ঘটনা কি তা আমি বা কামাল কেউই আমরা জানি না। ইব্রাহিম খাঁ লোদী সাহেব গতকাল সন্ধ্যার অল্প আগে বুকে গুলি খেয়ে নিহত হন। সাড়ে পাঁচটার সময়। কামাল এবং আমি, প্রকৃত পক্ষে, হত্যাকাণ্ডটি প্রত্যক্ষ করি। আমাদের চোখের সামনেই অপরাধটা ঘটে। লোদী সাহেব একা ছিলেন—বাড়ির ভিতরই, কিন্তু বাড়ির মূল অংশ থেকে কিছুটা দূরে, বিশেষভাবে তৈরি তাঁর নিজস্ব রেস্ট হাউজে। তাঁর কাছাকাছি গিয়ে তাঁকে গুলি করা, এক কথায়, অসম্ভব। সুতরাং রফিক চৌধুরী যদি তাঁকে খুন করে না থাকে, ধরে নিতে হয় কোন অলৌকিক শক্তি গুলি করেছে জজ সাহেবকে। অপরদিকে, যদি ধরে নেয়া হয় যে রফিক চৌধুরীই খুন করেছে জজ সাহেবকে, তাহলে স্বীকার না করে উপায় নেই রফিক চৌধুরী অলৌকিক শক্তির অধিকারী।'

সাগ্রহে শুনছে শহীদ। কৌতূহল ফুটে উঠেছে ওর চোখমুখে। বলল, 'বলে যান।'

'লোদী সাহেব সম্পর্কে বলি। বাষট্টি বছর বয়সে তিনি অবসর নিয়েছিলেন, একজন জজের জন্যে সকাল সকালই বলতে হবে। শারীরিক দিক থেকে সক্ষম ছিলেন তিনি, মানসিক দিকটাও সতেজ ছিল। শাস্তি দেবার সময় তিনি বিশেষভাবে লক্ষ রাখতেন অপরাধের চেয়ে শাস্তির ওজন যাতে বেশি না হয়। বেত্রাঘাত বা শারীরিক যন্ত্রণাদায়ক কোনরকম শাস্তি দিতে ঘোর আপত্তি ছিল তাঁর। বেত্রাঘাতের বিরুদ্ধে তিনি পত্র-পত্রিকায় লেখালেখিও করেছেন প্রচুর, ভাষণও দিয়েছেন সেমিনারে। অথচ রফিক চৌধুরীকে তিনি পনেরোটা বেত মারার নির্দেশ দেন। এটা একটা রহস্য। এর কারণ কেউ বুঝতে পারেনি।'

শহীদ বলল, 'রফিক চৌধুরী সম্পর্কে কিছু বলুন এবার।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'যুবক। সিনেমার হিরোদের মত নিখুঁত চেহারা। পোশাক-পরিচ্ছদের দিকে সজাগ দৃষ্টি। এর আগে কখনও কোন অপরাধ করেনি সে, ওই ডাকাতিই তার প্রথম অপরাধ। ব্যক্তিগত জীবনে একজন শিল্পী, ওয়েল

এডুকেটেড। কিন্তু যতদূর জানা যায়, তার আসল নাম রফিক চৌধুরী নয়। নাম তার যাই হোক, পুলিসের খাতায় তার নাম নেই।'

'ডাকাতি করল কোথায়, কিভাবে?'

মি. সিম্পসন পাইপে ঘন ঘন কয়েকবার টান দিলেন বটে কিন্তু ধোঁয়া বের হলো না দেখে ঠোঁট থেকে নামালেন সেটা। বললেন, 'বলছি।'

পাইপে অগ্নিসংযোগ করে ধোঁয়া ছাড়লেন গলগল করে, 'ডাকাতির অভিযোগ আনা হয় রফিকের বিরুদ্ধে ঠিক, কিন্তু এখানেও সন্দেহের ছায়া আছে।'

পাইপ তুলতে যাচ্ছিল শহীদ ঠোঁটে, হাতটা স্থির হয়ে গেল ওর, জিজ্ঞেস করল, 'কি রকম?'

'নিউ বেইলী রোডের একটা সুন্দর স্টেশনারি দোকানে ডাকাতিটা ঘটে। দু'বছর আগের এই মাঘ মাস, সময়টা সন্ধ্যা। গাঢ় কুয়াশা ছিল সেদিন। দোকানে ছিল একা দোকানদার। দোকানদার বুড়ো চোখে কম দেখে। সিগারেট কেনার নাম করে এক লোক তার দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়। বুড়ো সিগারেট দিচ্ছিল, লোকটা এই সময় তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। তারপর লাফ মেরে দোকানে উঠে একটা কাঁচের বোতল দিয়ে বুড়োকে বেশ ক'বার আঘাত করে। বুড়ো জ্ঞান হারায়। দোকানের ক্যাশ-ড্রয়ার থেকে খোয়া যায় দশ এবং পঞ্চাশ টাকার নোটের একটা বাণ্ডিল। নোটের বাণ্ডিলটা কাগজে ভাল ভাবে মোড়া ছিল। পরদিন সকালে দোকানদার ওই টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেবে বলে কাগজ দিয়ে মুড়ে রেখেছিল। প্যাকেটে ছিল নয় হাজার টাকা।

'রফিক চৌধুরীকে পুলিস নোটের বাণ্ডিল হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রায়-অন্ধকার রাস্তায়। পুলিসকে দেখেই সে প্যাকেটটা ফেলে দিয়ে ছুটে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু সফল হয় না, ধরা পড়ে সে পুলিসের হাতে। রফিক চৌধুরী দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল ওই এলাকা থেকে, এমন সময় ধরা পড়ে সে। তার বক্তব্য ছিল, একা রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল সে, এমন সময় দোকানটার দিক থেকে একটা বুড়ো লোকের চিৎকার ভেসে আসে। কি করা উচিত ঠিক করতে না পেরে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। খানিক পর ছুটন্ত পদশব্দ শুনতে পায়। একপাশে সরে দাঁড়াবার আগেই সে দেখে একজন লোক তার কাছে চলে এসেছে। লোকটাকে ভাল করে দেখার সুযোগ পায়নি ও। লোকটা ছুটে পালাবার সময় একটা প্যাকেট ছুঁড়ে ফেলে দেয়। প্যাকেটটা তার পায়ের কাছে এসে পড়ে। প্যাকেটটা তুলে নেয় সে। এমন সময় পুলিসকে ছুটে আসতে দেখে প্যাকেটটা ফেলে দিয়ে ছুটতে শুরু করে সে এবং প্রায় সাথে সাথে ধরা পড়ে।'

মি. সিম্পসন থামেন। ঘনঘন টান দেন পাইপে। নীলচে ধোঁয়া ছাড়েন এবং আবার মুখ খোলেন।

'বিচার চলাকালে কয়েকটা ব্যাপার সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রফিক চৌধুরীর বিরুদ্ধে প্রমাণগুলো তেমন শক্ত ছিল না। বুড়োর কথাই ধরো। ডাকাত রফিক চৌধুরীই কিনা সন্দেহাতীতভাবে সনাক্ত করতে পারেনি সে। জুরিরা প্রমাণাদির ওপর যতটা না জোর দিয়েছিল তার চেয়ে বেশি জোর দিয়েছিল রফিক

চৌধুরীর খিটখিটে মেজাজের ওপর। তাছাড়া, জজ সাহেবের দ্বারা তারা সবাই ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়। রফিক চৌধুরীর আচরণ জুরিদেরকে বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট করে চরমভাবে। তাকে কেন শাস্তি দেয়া হবে না—এই প্রশ্নের উত্তরে সে লোদী সাহেবকে বলে, "আপনি শুধু বোকা আর সেকেলে নন, আপনি অযোগ্য এবং অনুপযুক্তও বটে। আপনাকে আমি দেখে নেব।" শেষ কথাটা নিশ্চয়ই হুমকি, তাই না? তবে, লোদী সাহেব যখন বেত্রাঘাতের কথা ঘোষণা করেন, রফিক অসুস্থ হয়ে পড়ে, প্রায় জ্ঞান হারাবার মত অবস্থা দাঁড়ায় তার।'

শহীদ বলল, 'কিন্তু মি. সিম্পসন, ব্যাপারটা যেন কেমন লাগছে আমার কাছে। রফিক চৌধুরীর বিরুদ্ধে প্রমাণাদি যা ছিল, তাতে শাস্তি হয় না। আমি জানতে চাইছি, আপীল করেনি সে?'

'না, রফিক আপীল করেনি। শাস্তি ঘোষণা করার পর একটা কথাও উচ্চারণ করেনি সে। কি জানো, এই রফিক সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী অনেক কথা অনেকে বলে। কেউ বলে ছোকরা জাত হারামি, পেটে পেটে প্যাঁচানো বুদ্ধি, আবার কেউ বলে নির্দোষ, আদর্শবান সৎ ছেলেটাকে অকারণে ঝুলিয়ে দেয়া হলো। ঢাকা জেলে ছিল সে। জেলের ডাক্তার এবং সুপারিনটেণ্ডেন্টের ধারণা, রফিক অত্যন্ত নিরীহ, ভদ্র এবং বুদ্ধিমান যুবক। অপর দিকে ইন্সপেক্টর তৈয়ব আলির ধারণা, রফিক একনম্বরের বজ্জাত, ইঁচড়ে পাকা শয়তান একটা। সে যাই হোক, আঠারো মাসের জায়গায় পনেরো মাস জেল খাটে সে। গুড-কণ্ডাক্ট-এর জন্যে তিনমাস কমিয়ে দেয়া হয় শাস্তি। আজ থেকে ছয় সপ্তাহ আগে জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে সে।'

'ছাড়া পাবার পরও কি সে লোদী সাহেবকে হুমকি দেয়?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'না। ইন্সপেক্টর তৈয়ব তার বিরুদ্ধে অভিযোগ খাড়া করেছিল। রফিক জেল থেকে ছাড়া পাবার পর তৈয়ব একজন সিভিল ড্রেস পরা ওয়াচারকে তার ওপর নজর রাখার জন্যে নিযুক্ত করে। অল্প কিছুদিন চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখা হয় রফিকের ওপর। কিন্তু তার আচার-ব্যবহারে তেমন সন্দেহজনক কিছু দেখা যায়নি বলে তার ওপর নজর রাখার দরকার নেই মনে করে ইন্সপেক্টর তৈয়ব উঠিয়ে নেয় ওয়াচ। এরপর আর কোন ঘটনা ঘটেনি। হঠাৎ করে, গতকাল বিকেলে, ইন্সপেক্টর তৈয়ব একটা ফোন কল পায়। ফোন করে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি। সে ফোনে জানায়, অবৈধ এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে রফিক চৌধুরী এই মাত্র একটা আগ্নেয়াস্ত্র কিনেছে। এই যে, এইটা!'

তেপয়ের উপর রাখা দুটো আগ্নেয়াস্ত্রের মধ্যে আইভর-জনসন ·৩৮ রিভলভারটা আঙুল দিয়ে দেখালেন মি. সিম্পসন।

শহীদ হাত বাড়িয়ে তুলে নিল রিভলভারটা। পরীক্ষা করে দেখল, ম্যাগাজিন থেকে ছয়টার মধ্যে মাত্র একটি বুলেট খরচ করা হয়েছে।

'ফোন কল পেয়ে ইন্সপেক্টর তৈয়ব লোকজন পাঠিয়ে দেয় চারদিকে, রফিক চৌধুরীকে ধরে আনার জন্যে। এদিকে, আমি আমার চেম্বারে বসে গল্প করছিলাম কামালের সাথে। রফিক চৌধুরী আগ্নেয়াস্ত্র কিনেছে, তাকে ধরার জন্যে ইন্সপেক্টর লোক পাঠিয়েছে—এসব তখনও জানি না। এমন সময় ফোন এল।'

'কার ফোন?' শহীদের প্রশ্ন।

মি. সিম্পসন বললেন, 'জজ লোদী সাহেবের সাথে আমার বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাঁর বাড়িতেও বেশ ক'বার গেছি আমি। সেই সূত্রে তার মেয়েদের সাথেও পরিচয় হয়। ফোন করেছিল লোদী সাহেবের ছোট মেয়ে, শাহানারা। হিস্টিরিয়াগ্রস্তা রোগিণীর মত চিৎকার করছিল শাহানারা ফোনে। সে বলে, রফিক চৌধুরী বাবাকে খুন করার জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠেছে, আপনারা কিছু করুন এই মুহূর্তে!'

কামাল কোন ফাঁকে ড্রয়িংরুম থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, ওরা কেউ লক্ষ করেনি। ট্রে হাতে মহুয়া ঢুকল ভিতরে, জিজ্ঞেস করল, 'সেই ব্যাড এলিমেন্টটা কোথায় গেল আবার?'

শহীদ এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, 'আরে তাই তো! কোথায় গেল কামাল?'

সকলের অগোচরে সবজান্তার মত মাথা নাড়ল মহুয়া, ট্রে নামিয়ে রেখে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল সে ড্রয়িংরুম থেকে। করিডর ধরে এগিয়ে গিয়ে বাঁক নিল সে, দাঁড়াল লাইব্রেরীর বন্ধ দরজার সামনে।

লাইব্রেরীর ভিতর থেকে অদ্ভুত সব শব্দ বেরিয়ে আসছে। অস্পষ্ট শব্দ। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল মহুয়া। চিন্তার রেখা ফুটে উঠল তার কপালে। কেউ যেন ফোঁস ফোঁস করে হাঁপাচ্ছে। দুপদাপ শব্দও হচ্ছে।

মাথা নিচু করে কী-হোলে চোখ রাখল মহুয়া। লাইব্রেরীর বেশ খানিকটা দেখা যাচ্ছে। কামাল নেই কোথাও। তবে···।

হাসি চেপে রাখা কঠিন হয়ে উঠল মহুয়ার পক্ষে। কী-হোল দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে কুয়াশাকে। তার দাদা লাইব্রেরীর মেঝেতে বিছানো নরম কার্পেটে দুই হাঁটু আর দুই হাত দিয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে। কুয়াশার পিঠের উপর একটা স্কেলকে ছড়ির মত করে ধরে বসে আছে শহীদের একমাত্র পুত্র সন্তান রুবিন। মাত্র বছর দেড়েক বয়স রুবিনের। ইতিমধ্যেই মামার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে সে।

কুয়াশার মাথার পিছনে স্কেল দিয়ে টুকটুক করে বাড়ি মারছে রুবিন। আর জিভ দিয়ে টট্ টট্ শব্দ তুলে ঘোড়ারূপী মামাকে আরও জোরে দৌড়ুবার হুকুম দিচ্ছে।

সিধে হয়ে দাঁড়াল মহুয়া। মামা-ভাগ্নের কাণ্ড দেখে হাসি চেপে রাখা কঠিন, তাড়াতাড়ি সরে পড়া দরকার। কিন্তু কামাল কোথায় গেল তাহলে? আবার ড্রয়িংরুমের দিকে পা বাড়াল সে।

ড্রয়িংরুমে তখন মেলা শোরগোল।

তিন

মহুয়া ট্রে রেখে ড্রয়িংরুম থেকে বেরিয়ে যেতেই করিডরে ছুটন্ত পদশব্দ এবং স্যানন ডি. কস্টার আর্তনাদ ভেসে এল।

মুহূর্তে থমথমে হয়ে উঠল মি: সিম্পসনের মুখের চেহারা। তিনি জানতে চাইলেন, 'মি. ডি. কস্টা না?'

শহীদ উত্তর দেবার আগেই কামাল ডি. কস্টার একটা সরু হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করল, 'আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনছিল। আমি বেরুতেই দৌড়ে পালাচ্ছিল, সিঁড়ি থেকে ধরে এনেছি।'

মি. সিম্পসন নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'কামাল, ছেড়ে দাও ওকে। তবে দরজার কাছে পাহারায় থাকো। মি. ডি. কস্টা, আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব, আশা করি উত্তর দেবেন।'

ডি. কস্টাকে ছেড়ে দিল কামাল। ডি. কস্টা তার ডান হাতের কব্জি বাঁ হাত দিয়ে মেসেজ করতে করতে বলল, 'উট্টর ডিব কি ডিব না টাহা ডিপেণ্ড করে হাপনার কোশ্চেনের উপর।'

মি. সিম্পসন কঠিনদৃষ্টিতে ডি. কস্টার আপাদমস্তক দেখে নিলেন একবার। তারপর বললেন, 'এদিকে ঘুরঘুর করছিলেন কি মনে করে?'

'উট্টর ডিব না। হোয়াট ইজ ইওর সেকেণ্ড কোশ্চেন?'

মি. সিম্পসন জানতে চাইলেন, 'আমি কুয়াশার সন্ধান চাই। কোথায় সে?'

ডি. কস্টা ঠোঁট বাঁকা করে একটু হাসল। বলল, 'হাপনি কি কানা নাকি? হামার স্ট্রেণ্ড মি. কুয়াশা টো হাপনার চোখের সামনেই রহিয়াছেন, ডেকিটে পাইটেছেন না?'

এক পা এগুলেন মি. সিম্পসন ডি. কস্টার দিকে। সবিস্ময়ে বললেন, 'হোয়াট? কি বললেন?'

ডি. কস্টা হাসছে দাঁত বের করে।

কামাল ঢোক গিলল। শহীদের দিকে তাকাল একবার আড়চোখে। এমন সময় মহুয়া এসে ঢুকল ড্রয়িংরুমে।

কারও মুখে কোন কথা নেই।

'বলিলাম, মি. কুয়াশা হাপনার চোখের সামনেই রহিয়াছেন। হাপনি কানা টাই টাহাকে ডেকিটে পাইটেছেন না।'

মি. সিম্পসন ঝট্ করে তাকালেন শহীদের দিকে।

শহীদ মৃদু হাসল, 'বুঝতে পারছি না। আপনি ওকেই চেপে ধরুন, যদি বের করতে পারেন ধাঁধার উত্তর।'

ডি. কস্টার দিকে আরও এক পা এগোলেন মি. সিম্পসন। ডান হাতটা কোটের পকেটে ঢুকে গেছে তাঁর।

'পরিষ্কার করে বলুন, কোথায় সে?'

ডি. কস্টা বলল, 'টিনি ছড্ডবেশ নিয়া আছেন, টাই হাপনি টাহাকে চিনিটে পারিটেছেন না।'

গর্জে উঠলেন মি. সিম্পসন, 'কই! কোথায়? দেখিয়ে দিন আমাকে!'

ডি. কস্টা বলল, 'ডেকাইয়া ডিব? কিন্টু ডেকাইয়া ডিলে হাপনি যডি সাটে সাটে গুলি করেন?'

'একশোবার করব। আপনি শুধু বলুন কোথায় সে!'

ডি. কস্টা বলল, 'কিন্টু হাপনি বিশ্বাস করিবেন না।'

'বিশ্বাস করব না? নিশ্চয়ই বিশ্বাস করব!'

ডি. কস্টা আঙুল তুলে বলল, 'ঠিক টো?'

'ঠিক।'

ডি. কস্টা নিজের বুকের উপর আঙুল ঠুকতে ঠুকতে বলল, 'এই বাণ্ডাই মি. কুয়াশা, ছড্ডবেশে আছি!'

'কী! আমার সাথে ঠাট্টা!' বলেই লাফ দিয়ে পড়লেন মি. সিম্পসন। কিন্তু ডি. কস্টা তার আগেই ক্যাঙ্গারুর মত লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গেছে রুমের বাইরে, সেখান থেকে সিঁড়ির দিকে ছুটতে ছুটতে তারস্বরে চেচাচ্ছে সে, 'ফর গডস্ সেক, হামি মি. কুয়াশা নহি—হামাকে গুলি করিবেন না···!'

করিডর থেকে ড্রয়িংরুমে ঢুকে মি. সিম্পসন বিকট কণ্ঠে বললেন, 'দেখলে শহীদ! লোকটার স্পর্ধা দেখলে? আমার সাথে কেমন ঠাট্টা করে গেল?'

শহীদ হাসি চেপে বলল, 'কিন্তু আপনিই বা হঠাৎ এমন অস্থির হয়ে উঠলেন কেন কুয়াশার খোঁজ পাবার জন্যে?'

মি. সিম্পসন সোফায় বসলেন। বললেন, 'কেসটার সাথে কুয়াশা জড়িত থাকতে পারে, শহীদ। অকারণে বলছি না কথাটা। আমি অনেক আগে থেকেই জানি, লোদী সাহেবের সাথে কুয়াশার পরিচয় ছিল। লোদী সাহেবই একদিন আমাকে বলেছিলেন, আইন সংক্রান্ত জটিল সমস্যা দেখা দিলে তিনি কুয়াশার সাথে দেখা করেন—কুয়াশা তাঁর সমস্যার সমাধান করে দেয়।'

শহীদ বলল, 'পরিচয় ছিল, সে আমিও জানি। কিন্তু সম্পর্কটা ছিল বন্ধুত্বের মত, তাই না? কুয়াশা বন্ধুকে খুন করবে, এ আপনি ভাবলেন কিভাবে? কুয়াশা বন্ধুত্বের মর্যাদা দেয়—এ তো আপনিও ভালভাবে জানেন।'

'জানি। কিন্তু বন্ধুত্ব শেষ পর্যন্ত ছিল কিনা তা জানি না।'

শহীদ বলল, 'কুয়াশা একবার যাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করে তাকে কখনও শত্রুর তালিকায় ফেলে না, মি. সিম্পসন। বন্ধু শত্রুতে পরিণত হলেও কুয়াশা তাকে ক্ষমা করে। এ সবই তো আপনার জানা।'

কামাল মন্তব্য করল, 'আমরা কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক আলোচনায় সময় নষ্ট করছি।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'ঠিক, শহীদ, কুয়াশার ব্যাপারে পরে কথা বলব আমি। কাহিনীটা বলি আবার। হ্যাঁ, কোন্ পর্যন্ত যেন বলেছিলাম?'

শহীদ বলল, 'লোদী সাহেবের ছোট মেয়ে শাহানারা ফোন করল, ফোন পেয়ে আপনারা কি করলেন?'

মি. সিম্পসন পাইপে টোবাকো ভরতে শুরু করলেন। কামাল পট থেকে উত্তপ্ত কফি ঢালার কাজে হাত লাগাল।

মহুয়া একসময় নিঃশব্দে বেরিয়ে গেছে রুম থেকে।

মি. সিম্পসন বলতে শুরু করলেন ধীরেসুস্থে, 'আগেই বলেছি, কামাল আমার সাথে গল্প করছিল চেম্বারে বসে। রিসিভার রেখে দিয়ে ওকে বললাম, চলো, জজ

লোদী সাহেবের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি একবার। রফিক চৌধুরী নাকি তাঁকে খুন করার জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠেছে। কামাল কথাটা শুনেই একলাফে উঠে দাঁড়াল। আমরা দু'জন নিচে নেমে এসে একটা জীপে চড়লাম। স্টার্ট দিলাম আমি।'

পাইপে অগ্নিসংযোগ করে ধোঁয়া ছাড়লেন তিনি। তুলে নিলেন কফির একটা কাপ, চুমুক দিলেন ছোট ছোট করে পর পর ক'বার, বললেন, 'শহীদ, বাড়িটার আকার আকৃতি সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। লোদী সাহেবের নতুন বাড়ি এটা, বোধহয় যাওনি কখনও ওখানে, নাকি গেছ?'

'যাইনি।'

'বাড়িটাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে দশ ফিট উঁচু, মসৃণ একটা কংক্রিটের পাঁচিল। পাঁচিলের কোথাও কোন খাঁজ, গর্ত ইত্যাদি কিছুই নেই। পাঁচিলের মাথায় ভাঙা কাঁচের টুকরো ঢোকানো, চোর-টোর যাতে উঠতে না পারে। পাঁচিলের বাইরে দশ গজের মধ্যে কোন গাছপালা নেই। বাড়ির ভিতর ঢোকার পথ মাত্র দুটো। সদর গেট—এবং, পিছনের খিড়কি। সদর গেটে রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা একজন দারোয়ান থাকে। গেটের কাছেই একটা ছোট ঘরে থাকে সে। লোকটা প্রৌঢ়, নাম রমজান মিয়া। জীপ গেটের সামনে থামতে সে-ই গেট খুলে দেয়। তখন সাড়ে পাঁচটার মত বাজে। সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে, চারদিক প্রায় অন্ধকার। বাইরে এখন যেমন বৃষ্টি হচ্ছে, গতকাল তখনও এইরকম বৃষ্টি পড়ছিল ঝির ঝির করে।'

শহীদ পা দুটো লম্বা করে দিয়ে নড়েচড়ে বসল। আড়চোখে তাকাল একবার লাইব্রেরী রুমে ঢোকার মধ্যবর্তী বন্ধ দরজাটার দিকে। ব্যাপারটা লক্ষ করল কামাল। কিন্তু শহীদের মুখের চেহারায় কোনরকম ভাবান্তর লক্ষ করল না সে।

মি. সিম্পসন বলে চলেছেন, 'দারোয়ান রমজান মিয়া আমাদের বলল, জজ সাহেব তাঁর রেস্টহাউজে আছেন। মূল বিল্ডিং থেকে রেস্টহাউজটা দুশো গজ দূরে। রেস্টহাউজটা আকারে ছোট। মাত্র দুটো রুম। দুই রুমের মাঝখানে একটা লম্বা হলরুম। লোদী সাহেব একটি রুমকে লাইব্রেরী হিসেবে ব্যবহার করতেন। তিনি যে তাঁর লাইব্রেরী রুমে আছেন, দারোয়ান সে ব্যাপারে নিঃসন্দেহ ছিল। লোদী সাহেব নাকি তাঁর এক পুরানো বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন, দু'জন বৈকালিক চা পান করবেন বলে। সাড়ে তিনটের সময় গেটে ফোন করে তিনি কথাটা বলে রেখেছিলেন রমজান মিয়াকে, তাঁর বন্ধু এলে রজমান মিয়া যেন তাঁকে রেস্টহাউজে পাঠিয়ে দেয়।'

মি. সিম্পসন বিরতি নেবার জন্যে থামলেন। মৃদু একটু হাসলেন তিনি শহীদের দিকে তাকিয়ে। বললেন, 'অ্যাকশন শুরু হতে যাচ্ছে! এখন থেকে যা বলব, খুব মন দিয়ে শুনতে হবে তোমাকে।'

শহীদ পাইপ টানতে টানতে বলল, 'বলে যান।'

'বাঁ দিকের রাস্তাটা ধরে আমরা এগোতে শুরু করি। জীপ রেখে, পায়ে হেঁটে। সোজা, আমাদের সামনে রেস্ট হাউজটা—দেখতে পাচ্ছিলাম। রেস্টহাউজের প্রায় চারদিকেই ঝোপঝাড় আর গাছপালা আছে। তবে কোন ঝোপ বা কোন গাছই রেস্টহাউজের দশ-বারো ফিটের মধ্যে নেই। রেস্টহাউজের ঠিক মাঝামাঝি

জায়গায় একটা দরজা। দরজার মাথার উপর একটা বালব জ্বলছিল। দরজাটা খোলাই ছিল। খোলা দরজা পথে দেখা যাচ্ছিল স্বল্পালোকিত হলরুম। খোলা দরজার বাঁ দিকে লাইব্রেরী রুমের দেয়াল। দেয়ালের গায়ে দুটো জানালা। দুটো জানালার একটি বন্ধ, অপরটি খোলা। খোলা হলেও, ভারি পর্দা ঝুলছিল। তবে মৃদু আলোর আভাস পাচ্ছিলাম আমরা, পর্দার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছিল।'

'হলরুমে ঢোকার দরজাটা পুরোপুরি খোলা ছিল?'

মি. সিম্পসন শহীদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ। খোলা দরজা পথে আমরা হলরুমের ভিতর ভাস্কর্য মূর্তিগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম। এমন সময়, হঠাৎ করে দেখলাম লম্বা একটা লোক আমাদের কাছ থেকে দশ কি পনেরো গজ সামনের একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে খোলা দরজার দিকে তীরবেগে ছুটতে শুরু করেছে। ঠিক এই সময় বৃষ্টির বেগ বেড়ে গেল। চোখেমুখে বর্শার মত বৃষ্টির ফোঁটা বিঁধছিল। সেই সাথে মেঘের ডাক, বিদ্যুতের ঝলকানি। লোকটা দরজার কাছে পৌঁছে গেছে, এমন সময় চারদিক দিনের মত আলোকিত হয়ে উঠল। বিদ্যুতের আলোয় দেখলাম লোকটা আমাদের দিকে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চিনতে পারলাম তাকে, রফিক চৌধুরী।'

'থামলেন কেন, বলে যান!'

আবার মি. সিম্পসন বলতে শুরু করলেন, 'আমাদেরকে দেখেই রফিক তার প্যান্টের পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে ফেলল। কিন্তু আমাদেরকে গুলি করার কোন চেষ্টাই সে করেনি। লাফ দিয়ে খোলা দরজা দিয়ে হলরুমে ঢুকল সে। ছুটল লাইব্রেরীতে ঢোকার দরজার দিকে।'

কামাল বলল, 'এক মিনিট! একটা কথা বলতে ভুলে গেছেন আপনি, মি. সিম্পসন। রফিককে দেখেই আমি চিৎকার করে উঠি, দাঁড়াতে বলি তাকে, এবং তার দিকে দৌড়ুতে শুরু করি।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'ঠিক। ধন্যবাদ, কামাল। হলরুমের বাঁ দিকে লাইব্রেরী রুমে ঢোকার দরজা। রফিক সেদিকে ছুটছিল। কামাল ছুটছিল হলরুমের দরজার দিকে। আমিও ছুটছিলাম। কিন্তু কামাল আমার অনেক আগে ছিল। তখনও চিৎকার করে ডাকছিল ও রফিককে। ওর চিৎকারেই জজ লোদী সাহেব একমাত্র খোলা জানালার পর্দা সরিয়ে উঁকি দিয়ে বাইরে তাকান। জানালাটা হলরুমে ঢোকার দরজার কাছ থেকে মাত্র হাত দশেক দূরে। শহীদ, তোমাকে বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছি এই জন্যে যে, গোটা ঘটনাটায় কোনরকম জটিলতা বা ব্যাখ্যাতীত রহস্য কিছু ছিল না সেটা বোঝাবার জন্যে। জানালা দিয়ে যিনি উঁকি দিলেন তিনি যে জজ লোদী সাহেব তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। তাকে দেখেই আমি চিনতে পারি। সেই মুহূর্তে দিব্যি সুস্থ এবং জীবিত ছিলেন তিনি। তাঁর প্রকাণ্ড টাক পড়া মাথাটা চকচক করছিল বিদ্যুতের আলোয়। তিনি বিরক্তির সাথে হাঁক ছেড়ে জানতে চাইলেন, 'কে ওখানে?' পরমুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি রুমের দিকে, যেন কোন শব্দ শুনে শব্দের উৎস জানার জন্যে জানালার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালেন।

'ঘুরে দাঁড়ালেন—কেন?'

'ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে লক্ষ করলাম, রাগ রাগ ভাব ফুটে উঠল তাঁর চেহারায়। ঘুরে দাঁড়ালেন কেন? রফিক লাইব্রেরী রুমের দরজা খুলে লাইব্রেরীতে ঢুকে পড়েছিল ঠিক সেই সময়। ঢুকে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেয় সে। দরজা বন্ধ করার শব্দ পেয়েই জজ সাহেব ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন, তারপর ঘুরে দাঁড়ান।'

মি. সিম্পসন থামতেই কামাল শুরু করল, 'আমি ধাওয়া করছিলাম রফিককে। লাইব্রেরীতে ঢোকার একটি মাত্র দরজা, সেটি হলরুমের দেয়ালে। রফিককে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম আমি। লাইব্রেরীতে ঢোকার দরজাটা ভেজানো ছিল। রফিক সবেগে ছুটে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতেই খুলে গেল সেটা। ভিতরে লাফিয়ে ঢুকল সে, সাথে সাথে ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল দরজা। কী-হোলে সম্ভবত চাবি ছিল, দরজা বন্ধ করেই চাবি ঘুরিয়ে তালা লাগিয়ে দেয় সে। মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড পর আমি দরজার সামনে পৌঁছুই। মি. সিম্পসন, এর পরের ঘটনা আপনি বলুন।'

'লাইব্রেরী রুমে সহজে পৌঁছুতে হলে জানালা গলে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করাই উত্তম, বুঝতে পারলাম আমি। তাই পাকা রাস্তা ছেড়ে আমি ঘাসের উপর নামলাম। তখনও ছুটছি। কোনাকুনিভাবে, জানালার দিকে। জানালার কাছ থেকে যখন আমি বিশ কি বাইশ কদম দূরে, ঠিক তখন গুলির শব্দ কানে ঢুকল। তারপর জানালার কাছ থেকে যখন আমি দশ কদম দূরে, তখন শুনলাম দ্বিতীয় গুলির শব্দ।'

সোফায় সিধে হয়ে বসল শহীদ। জানতে চাইল, 'কি বললেন? দ্বিতীয় গুলির শব্দ শুনলেন?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'হ্যাঁ, শহীদ। দ্বিতীয় গুলির শব্দ শুনলাম। কালো কাপড়ের ভারি পর্দা ঝুলছিল বলে লাইব্রেরী রুমের ভিতরটা দেখতে পাচ্ছিলাম না আমি। ক'সেকেণ্ড পর জানালার সামনে পৌঁছুলাম আমি। হাত দিয়ে পর্দা সরালাম। দেখলাম, জানালার কাছ থেকে হাত তিনেক দূরে, বাঁ দিকে, ডেস্কের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন লোদী সাহেব। কোমরের নিচের অংশটা ঝুলছে, পা দুটো মাটিতে ঠেকে আছে। বোঝা যায়, ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, গুলি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন ডেস্কের ওপর। রুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল রফিক, হাতে উদ্যত রিভলভার, আইভর-জনসন। হতভম্ব, বোকা বোকা দেখাচ্ছিল তাকে। হিংস্র বা উত্তেজিত নয়, অস্থির বা আতঙ্কিত নয়, এমন কি মুষড়ে পড়া ভাবও তার মধ্যে দেখলাম না। অপরাধ ঘটিয়ে ফেলে অপরাধীরা আশ্চর্য সব কাণ্ড করে। কেউ হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে, কেউ ভয়ে ছুটোছুটি শুরু করে দেয়, কেউ আতঙ্কে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে—কিন্তু রফিকের মধ্যে এসবের কোনটাই দেখলাম না। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে আছে। জানালা গলে যখন ভিতরে ঢুকলাম, আমাকে যেন সে দেখতেই পেল না। এগিয়ে গিয়ে প্রথমেই আমি তার হাত থেকে আইভর-জনসনটা নিয়ে নিলাম। বাধা দিল না সে এতটুকু। এরপর আমি রুমের একমাত্র দরজার দিকে পা বাড়ালাম। কামাল তখনও দরজার গায়ে ঘুসি মারছিল। দরজা খুলে দিয়ে আমি লোদী সাহেবের লাশের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।'

'লোদী সাহেবের অর্ধেক দেহ ডেস্কের ওপর, বাকি অর্ধেক ঝুলছিল। ডেস্কের

ওপর চাইনীজ ড্রাগনের মত দেখতে একটা টেবিল-ল্যাম্প, পঁচিশ ওয়াটের বালব জ্বলছিল সেটার ভিতর। শেড থাকায় বালবের আলো শুধুমাত্র ডেস্কের উপরই পড়ছিল। গোটা রুমে এই একটাই বালব জ্বলছিল। লোদী সাহেবের বাঁ দিকে, ডেস্কের পাশেই রাখা ছিল একটা ডিক্টাফোন। রাবারের কাভারটা তোলা ছিল। লোদী সাহেব মারা গেছেন গুলি লাগার দু'চার সেকেণ্ড পরই। বুকের বাম দিকে গুলি লাগে তাঁর, গুলি করা হয় কাছাকাছি দূরত্ব থেকেই। গুলির শব্দ হয়েছিল দুটো। দুটো বুলেটেরই অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হলো। একটি বুলেট দিয়ে লোদী সাহেব নিহত হয়েছেন, সেটা তাঁর শরীরের ভিতর। অপর বুলেটটি ডিক্টাফোনের স্পীকিং-টিউবের মুখটাকে ভেঙে দিয়ে ছুটে গিয়ে বিঁধেছে দেয়ালের ভিতর। পরে এই বুলেটটা আবিষ্কার করি আমি এবং দেয়াল থেকে বের করি।'

শহীদ বলল, 'লাইব্রেরী রুমটা সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন আমাকে।'

'বলছি। বেশ বড়, চারকোনা রুম। লেদার চেয়ার আর বুক-কেস দিয়ে সাজানো। উত্তর দিকে, বুক-কেসের আড়ালে উঁচু একটা ইলেকট্রিক ফায়ার মেশিন ছিল।'

'ইলেকট্রিক ফায়ার মেশিন?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'হ্যাঁ, বাংলাদেশে সাধারণত শীত তেমন পড়ে না, তাই ফায়ারপ্লেস বা ইলেকট্রিক ফায়ার মেশিনের দরকার হয় না। কিন্তু গত বছর লণ্ডন থেকে বেড়িয়ে ফেরবার সময় মেশিনটা কিনে আনেন লোদী সাহেব। সে যাক, মেশিনটা অন্ করা ছিল। উত্তর দিকের দেয়ালে কোন জানালা বা দরজা নেই। পশ্চিম দিকের দেয়ালে দুটো জানালা, দরজা নেই। ভিতর থেকে দুটো জানালাই বন্ধ, ভারি কাঠের শাটার লাগানো, শাটারে আবার তালা মারা। দক্ষিণ দিকের দেয়ালে কোন দরজা নেই, আছে কেবল দুটো জানালা। দুটোর একটি বন্ধ, শাটার লাগানো, এবং শাটারে তালা মারা। অপরটি খোলা, কালো কাপড়ের ভারি পর্দা ঝোলানো। এই জানালাটা দিয়েই আমি ভিতরে প্রবেশ করি। এবং এই জানালাটা সর্বক্ষণ আমার দৃষ্টির মধ্যে ছিল। রুম থেকে বেরুবার আর একটি মাত্র পথ হলো, দরজা। একটিই দরজা। এবং সেই দরজার ওপর নজর ছিল সর্বক্ষণ কামালের, রফিক রুমে ঢুকে দরজায় তালা মারার পর থেকে।'

বিরতি নিয়ে মি. সিম্পসন বললেন, 'দুয়ে দুয়ে চারের মতই সহজ কেস! রফিককে আমরা রুমের ভিতর পাই লাশসমেত। আর কেউ রুমে ছিল না। থাকলে তার পক্ষে কোনক্রমেই পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। রুমের ভিতর কেউ লুকিয়েও ছিল না, থাকলে সার্চ করার সময় ধরা পড়তই সে। আমি এবং কামাল তন্নতন্ন করে গোটা রুমটা সার্চ করি। কোন গোপন পথ, গর্ত বা অন্য কিছু নেই, ছিল না। কি দাঁড়াল তাহলে? রফিক চৌধুরী দুটো গুলিই করেছে, একটি ব্যর্থ হয়েছে, অপরটি লোদী সাহেবের বুকে বিঁধেছে। ব্যর্থ বুলেটটি বিঁধেছে দেয়ালে। খুবই সহজ সরল ব্যাপার। কোন জটিলতা নেই, কোন রহস্য নেই। কিন্তু গণ্ডগোল হয়ে গেল সব যখন আমি রুটিন চেকের জন্যে রফিকের আইভর-জনসন রিভলভারটা চেক করতে গেলাম। রিভলভার খুলে সিলিণ্ডার চেক করতে গিয়ে দেখি, মাত্র একটি, আই

রিপিট, মাত্র একটি বুলেট খরচ হয়েছে আইভর-জনসন থেকে। ছয়টা বুলেটের মধ্যে পাঁচটাই রয়েছে রিভলভারের সিলিণ্ডারে। তারমানে, আইভর-জনসন থেকে দুটো নয়, মাত্র একটি বুলেট ছোঁড়া হয়েছে।'

'উপভোগ্য কাহিনী, সন্দেহ নেই।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'প্রথমে, শহীদ, আমরা নিজেদের চোখকে বিশ্বাসই করতে পারলাম না। অবশ্যই, রফিক লাইব্রেরীতে ঢুকে গুলি করতে পারে প্রথমে একবার, তারপর সাবধানে এবং দ্রুততার সাথে সিলিণ্ডার খুলে ব্যবহৃত কার্টিজ কেস ফেলে দিয়ে তার জায়গায় নতুন একটা বুলেট পুরে আবার গুলি করতে পারে, দ্বিতীয়বার। সেক্ষেত্রে পাঁচটি বুলেটই থাকার কথা আইভর-জনসনে।'

'রাবিশ!'

'ঠিক বলেছ! পাগল ছাড়া কে অমন কাণ্ড করতে যাবে? সিলিণ্ডারে পাঁচ-পাঁচটা বুলেট থাকা সত্ত্বেও কেউ কি নতুন করে বুলেট ভরে রিভলভারে? ভরে না। তাছাড়া, যদিও ওরকম করে থাকে রফিক, প্রশ্ন ওঠে, এক্সট্রা খোলটা তাহলে কোথায়? রুম সার্চ করে পাইনি আমরা কোন এক্সট্রা খোল। রফিককেও আমরা সার্চ করি—পাওয়া যায়নি।'

'রফিকের বক্তব্য কি?'

মি. সিম্পসন পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করলেন। বললেন, 'তাৎক্ষণিক প্রশ্নগুলোর উত্তর আমি লিখে রেখেছিলাম। পড়ছি, শোনো।'

প্রশ্ন: 'গুলি করে খুন করলে তাহলে জজ সাহেবকে শেষ পর্যন্ত, কেমন?'

উত্তর: 'জানি না।'

প্রশ্ন: 'জানি না মানে? গুলি করেছ, অস্বীকার করছ নাকি?'

উত্তর: 'গুলি করেছি ওর দিকে। তারপর অদ্ভুত কিছু একটা ঘটনা ঘটে গেছে। কি ঘটেছে তা আমি বলতে পারব না, বুঝতে পারিনি আমি।'

প্রশ্ন: 'পর পর দু'বার গুলি করেছ তুমি, তাই না?'

উত্তর: 'না, দু'বার গুলি করিনি। আমি মাত্র একবারই গুলি করেছি। ঠিক জানি না আমার গুলিটা ওর লেগেছে কিনা, তবে আমার গুলিতে ও পড়েও যায়নি, বা টলেও ওঠেনি···।'

প্রশ্ন: 'তুমি কি বলতে চাইছ, গুলি মাত্র একটাই করা হয়েছে?'

উত্তর: 'তা বলছি না। গুলি দুটোই হয়েছে। শব্দ শুনেছি আমি। কিন্তু দুটো গুলি আমি করিনি। কে করেছে, কোত্থেকে করেছে, কিছু বুঝতে পারিনি!'

প্রশ্ন: 'কোন্‌টা ছোঁড়ো তুমি? দ্বিতীয়টা, না প্রথমটা?'

উত্তর: 'প্রথমটা। রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াই আমি, সাথে সাথে গুলি করি। শয়তানের বাচ্চাটা জানালার দিক থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াচ্ছিল, ঠিক তখনই আমি গুলি করি।'

প্রশ্ন: 'তুমি বলতে চাও এই রুমে তুমি ছাড়াও আর একজন ছিল, এবং সেই দ্বিতীয় গুলিটা করেছে?'

উত্তর: 'আমি জানি না।'

প্রশ্ন: 'তুমি কাউকে দেখেছ রুমে ঢোকার পর?'

উত্তর: 'না। ডেস্কে ছাড়া রুমের আর কোথাও আলো নেই, অন্ধকারে ভাল দেখতে পাচ্ছিলাম না।'

প্রশ্ন: 'এই রুমে কেউ যদি থাকত, সে-ই যদি গুলি করত—তোমার চোখে কি সে ধরা পড়ত না? আলো রুমের সর্বত্র সমান হারে নেই ঠিক, কিন্তু একেবারে অন্ধকার তো নয় কোন অংশই।'

উত্তর: 'জানি না আমি। যা জানি, আপনাকে আমি তাই জানাবার চেষ্টা করছি মাত্র। বুড়ো শয়তানটাকে গুলি করি আমি, কিন্তু সে আহত হয়নি। আমার দিকে এগিয়ে আসছিল, দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে। এমন সময় দ্বিতীয় গুলির শব্দ পাই আমি। শয়তানটা দাঁড়িয়ে পড়ে সাথে সাথে দু'হাতে বুক চেপে ধরে। তারপর আরও দু'পা সামনে বাড়ে টলতে টলতে, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে যায় ডেস্কের উপর।'

প্রশ্ন: 'দ্বিতীয় গুলিটা কোন্ দিক থেকে ছুটে আসে?'

উত্তর: 'আমি জানি না।'

চার

মি. সিম্পসন নোটবুক বন্ধ করে পকেটে ভরলেন। পাইপে অগ্নিসংযোগ করে কিছুক্ষণ বিরতি নিয়ে ধূম্র উদ্‌গিরণ করলেন চুপচাপ, তারপর বললেন, 'এই সময়, কামাল একটা জিনিস আবিষ্কার করল। পশ্চিম দিকের দেয়ালের কাছে ঘুর ঘুর করছিল ও। উত্তর-পশ্চিম কোণে, চীনা মাটির একটা ফ্লাওয়ার ভাস দাঁড়িয়ে ছিল। সেটার পিছন দিকে তাকাতে দেখতে পায় ও খালি একটা কার্ট্রিজ কেস।'

কামাল কথা বলে উঠল এবার, 'আমি প্রথমে ভেবেছিলাম আইভর-জনসন ·৩৮ রিভলভার থেকে যে বুলেটটা ছোঁড়া হয়েছে এটি সেই বুলেটের কার্ট্রিজ কেস। কিন্তু মি. সিম্পসনকে দেখাতেই তিনি বললেন, না, এটা ·৩৮ রিভলভারের কার্ট্রিজ কেস হতেই পারে না।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'দেখেই বুঝতে পারি আমি, ওটা ·৩৮-এর না, ওটা ·৩২ অটোমেটিক-এর কার্ট্রিজ কেস। এরপর আমরা দু'জন ফ্লাওয়ার ভাসের ভিতরে তাকাই। এবং এটা পাই।'

মি. সিম্পসন তেপয়ের উপর রাখা আইভর-জনসন রিভলভারের পাশের আগ্নেয়াস্ত্র ব্রাউনিং ·৩২ অটোমেটিকটি আঙুল দিয়ে দেখালেন শহীদকে।

'ভাসের তলায় পড়েছিল অটোমেটিকটা। ফ্লাওয়ার ভাসটা হাত আড়াই লম্বা, তার ভেতর কেউ ফেলে দিয়েছিল। হাত ঢুকিয়ে নাগাল পাওয়া গেল না। লোদী সাহেবের ছাতার বাঁকানো হাতল দিয়ে তুলে ফেললাম আমি ব্রাউনিংকে। ব্যারেল নাকের কাছে নিয়ে গিয়ে শ্বাস নিতেই বারুদের গন্ধ পেলাম। ক্লিপে একটি বুলেট নেই দেখলাম। সেই বুলেটেরই কার্টিজ কেস ভাসের আড়াল থেকে কুড়িয়ে পায় কামাল। কার্টিজ কেসটা তখনও একটু একটু উত্তপ্ত ছিল। অর্থাৎ, বুঝলে শহীদ,

দ্বিতীয় গুলিটা যে ব্রাউনিং অটোমেটিক থেকে করা হয়েছে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ দেখলাম না। শুধু তাই নয়, প্রমাণ হয়ে গেল সেই সাথে, রুমের ভিতর দাঁড়িয়েই দ্বিতীয় গুলিটা করেছে কেউ ওই ·৩২ ব্রাউনিং দিয়ে। গুলি করার পর সে ব্রাউনিংটা ফেলে দেয় ভাসের ভিতরে।'

'কোন্ বুলেটটা লোদী সাহেবকে আঘাত করে?'

মি. সিম্পসন অদ্ভুতভাবে হাসলেন। বললেন, 'ওখানেই গণ্ডগোল, শহীদ। লোদী সাহেব কোন্ বুলেটের দ্বারা খুন হয়েছেন তা আমরা এখনও জানতে পারিনি।'

শহীদ তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'জানেন না? কেন, খুব সহজেই তো তা জানা সম্ভব! বুলেট ছোঁড়া হয় মাত্র দুটো। একটা ·৩৮ অপরটি ·৩২। একটি বুলেট লোদী সাহেবের বুকে বিদ্ধ হয়। অপরটি দেয়ালে। দেয়ালের বুলেটটা বের করেছেন আপনি, বলেছেন খানিক আগে আপনি। সেটা ·৩৮, না, ·৩২?'

পকেট থেকে একটা সাদা এনভেলাপ বের করলেন মি. সিম্পসন। এনভেলাপের মুখ খুলে সেটাকে উপুড় করে ধরলেন তেপয়ের উপর।

খট্ করে চ্যাপ্টা এক টুকরো সীসা পড়ল কাঠের তেপয়ের উপর।

'দেয়ালের ভিতর থেকে এটা পাওয়া গেছে। শক্ত ইঁটের দেয়াল, বুলেটটা প্রেশার খেয়ে কেমন চ্যাপ্টা হয়ে গেছে দেখো। দেখে বলা মুশকিল এটা কোন্ রিভলভার থেকে বেরিয়েছে। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, এটা ·৩৮ রিভলভারের বুলেট। অফিশিয়ালি এখন কিছুই বলব না, পোস্ট-মর্টেমের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত। ডাক্তার ইদ্রিস আজ সকালে পোস্ট-মর্টেম সারবেন। রিপোর্ট পাব খানিকক্ষণের মধ্যেই, আশা করছি।'

শহীদ সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে খানিকক্ষণ চিন্তা করল। তারপর প্রশ্ন করল মি. সিম্পসনের উদ্দেশে, 'ব্রাউনিংয়ে হাতের ছাপ পাওয়া যায়নি?'

'না। তবে রফিকের হাতে দস্তানা ছিল।'

'আপনি কি মনে করেন রফিকই দুটো হ্যাণ্ডগান থেকে দু'বার গুলি করেছিল?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'একটা সম্ভাবনা বৈকি। সে হয়তো দুটো আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে লাইব্রেরীতে ঢুকেছিল। পুলিসকে ধোঁকা দেবার জন্যে সে হয়তো অভিনয় করছে, বলছে, দ্বিতীয় গুলি সম্পর্কে যেন কিছুই জানে না।'

শহীদ বলল, 'কিন্তু আমার তা মনে হয় না। এই পদ্ধতিতে সে যদি ধোঁকা দিতে চাইত, তাহলে আগে থেকে সে কোন একটা পথ খোলা রাখার ব্যবস্থা করত, যে পথে কেউ পালাতে পারে। কারণ, পুলিসের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগবে, দ্বিতীয় গুলি যে ছুঁড়েছে, সে পালাল কোন্ পথে? পুলিস এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না পেলে তাকে ছাড়বে না, সে এটুকু অন্তত জানে।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'ঠিক। তাছাড়া, অনেকে বলছে বটে রফিক অভিনয় করছে কিন্তু আমার তা মনে হয় না। তার চোখেমুখে যে বিস্ময়ের ভাব আমি দেখেছিলাম, তা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম অভিনেতার পক্ষেও অভিনয়ের মাধ্যমে দেখানো সম্ভব নয়। কিন্তু, অপরদিকে, প্রকৃত ঘটনাই বা কি হতে পারে? কি বিশ্বাস করব

আমরা? রুমটা বাক্সের মত সীল করা। দুটো পথ ছাড়া বেরুবার কোন উপায় নেই। একটি পথের সামনে ছিল কামাল, অপরটির সামনে আমি। রুমের ভিতর ছিল একমাত্র রফিক। কি দাঁড়াচ্ছে? দুটো গুলিই ছুঁড়েছে রফিক—ধরে না নিয়ে আর কোন উপায় আছে কি? রফিক ছাড়া আর কে?'

'বিকল্প একটা ব্যাখ্যা আছে। দেখতে পাচ্ছেন না? '

'পাচ্ছি,' মি. সিম্পসন বললেন।

শহীদ বলল, 'বিকল্প ব্যাখ্যা সম্পর্কে কি ধারণা আপনার?'

'বিকল্পটা হলো, রফিক হয়তো কাউকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে। এমন হতে পারে, ধরা যাক, রুমের ভিতর আর একজন কেউ ছিল, তার কাছেই ছিল ব্রাউনিং অটোমেটিকটা। রফিক রুমে ঢুকে গুলি করল কিন্তু তার গুলি ব্যর্থ হলো। এক্স, যাকে আমরা চিনি না, দ্বিতীয় গুলিটা করল এবং তার গুলি বিদ্ধ হলো লোদী সাহেবের বুকে। কামাল ছিল দরজায়, আমি ছিলাম দক্ষিণ দিকের জানালায়, সুতরাং এক্স পশ্চিম দিকের একটা জানালা খুলে রুম থেকে বেরিয়ে গেল। এবং রফিক সেই জানালার কবাট বন্ধ করল, শাটার বন্ধ করল এবং শাটারের তালা বন্ধ করল।'

শহীদ বলল, 'সুতরাং ধরা যাক, রফিক লোদী সাহেবকে খুন করেনি। এখন দেখা যাক, কোথাও এমন কেউ আছে কিনা যে লোদী সাহেবকে খুন করতে চায়? বাড়ির লোকজন বা বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কেউ কি···?'

'বাড়ির মধ্যে লোকজন কম। বিপত্নীক ছিলেন তিনি। স্ত্রী মারা গেছেন বছর পাঁচেক আগে। দুই মেয়ে। বড় মেয়ে, ছাব্বিশ, নাম ইলোরা। ছোট মেয়ে, চব্বিশ, শাহানারা। বাড়িতেই থাকে আরও একজন, মেয়েদের সিরু কাকা ওরফে সিরাজ সাহেব। বয়স ষাটের উপর। লোদী সাহেবের লিগ্যাল ক্লার্ক বা সেক্রেটারি। এছাড়া আছে চাকর-বাকর, দারোয়ান।'

'বন্ধু-বান্ধব?'

'ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলতে একজনই। তিনি বিখ্যাত ব্যারিস্টার সুফী সরফরাজ খান সাহেব। গতকাল তাঁরই রেস্টহাউজে চা পান করতে আসার কথা ছিল।'

শহীদ বলল, 'সুফী সরফরাজ খান? তিনি দেশের সবচেয়ে বড় ক্রিমিন্যাল লইয়ার।'

'হ্যাঁ, পুলিস যতগুলো ওয়েল-প্রিপেয়ার্ড কেস দাঁড় করিয়েছে, মি. সরফরাজ তার প্রায় প্রত্যেকটি বানচাল করে দিয়ে, অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস করে নিয়ে গেছেন। অত্যন্ত উপযুক্ত এবং ধুরন্ধর আইনবিদ।'

'তিনি কি চা পান করতে এসেছিলেন?'

'না। দেরি হয়ে গিয়েছিল, তাই লোদী সাহেবের কাছে ক্ষমা চাইবার জন্যে ফোন করেছিলেন। কিন্তু তখন লোদী সাহেব বেঁচে নেই।'

শহীদ জানতে চাইল, 'বাড়ির প্রত্যেকের জবানবন্দী নেয়া হয়েছে কি? আপনি বলেছেন, ছোট মেয়েটা অর্থাৎ শাহানারা আপনাকে ফোন করে জানায়, রফিক তার বাবাকে খুন করার জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠেছে। রফিককে সে ব্যক্তিগতভাবে

চেনে?'

'চেনে। শাহানারার সাথে কথাও বলেছি আমি। গতকাল বাড়িতে একমাত্র ওর সাথেই কথা বলার সুযোগ পাই আমি। বড় মেয়েটি, ইলোরা, এবং বুড়ো কেরানী সিরু কাকা সে-সময় বাড়িতে ছিল না।'

'শাহানারাকে আপনি কি জিজ্ঞেস করেছিলেন, রফিককে কতটুকু চেনে সে? রফিকের সাথে তার সম্পর্কটা কি পর্যায়ের?'

'খুঁটিয়ে প্রশ্ন করা সম্ভব ছিল না। খুব মুষড়ে পড়েছিল সে বাবার মৃত্যুতে। আমার প্রশ্নের উত্তরে সে বলে, রফিককে মোটামুটি চিনি, তবে খুব একটা পছন্দ করি না তাকে, যদিও রফিক আমার সাথে সবসময় ভাল ব্যবহার করে এসেছে এ পর্যন্ত। শাহানারা আরও বলে, একটা ক্লাবে পরিচয় হয় তার সাথে রফিকের। লা লেজুয়ানা ক্লাবে। উল্লেখ করা দরকার, এই ক্লাবে নিয়মিত যাতায়াত করে বড় মেয়েটি, ইলোরা। তবে, শহীদ, আমার ধারণা, ইলোরা বা শাহানারা, হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে এদের দু'জনের কেউই কোনভাবে জড়িত নয়।'

শহীদ বলল, 'কিন্তু একটু আগে আপনি স্বীকার করেছেন, কাউকে রক্ষা করবার জন্যে রফিক অভিনয় করছে, এটা একটা সম্ভাবনা।'

'স্বীকার করেছি নাকি? না, ব্যাপারটা তা নয়, শহীদ। আমি আলোচনার স্বার্থে কথাটা ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু আসলে, ওরকম কিছু ঘটা সম্ভব নয়।'

'কেন?'

'গুলির আগে বা পরে দক্ষিণ দিকের জানালা আমার দৃষ্টিসীমার মধ্যে ছিল। গুলির আগে বা পরে ওই জানালা দিয়ে কেউ ঢোকেনি বা বেরিয়ে আসেনি। রুমের একমাত্র দরজা, সেখানে ছিল কামাল। আর পথ কই? পশ্চিম দিকের জানালা দুটো অবশিষ্ট থাকে, তাই না? কিন্তু দারোয়ান রজমান মিয়ার কাছ থেকে আমরা পরে জানতে পারি, গত একবছরের মধ্যে পশ্চিম দিকের দুটো এবং দক্ষিণ দিকের অপর একটি জানালায় কেউ হাত দেয়নি। হাত যে সত্যি কেউ দেয়নি, তার প্রমাণ আমরাও পাই। মরিচা ধরে এমন আঁটা হয়ে গেছে শাটার এবং কবাটের কব্জা যে আমি এবং কামাল, দু'জন গায়ের জোরে, ঝাড়া দশ মিনিট টানাটানি করার পর খুলতে সমর্থ হই একটি মাত্র জানালা। প্রত্যেকটি জানালা খুলতে রীতিমত গলদঘর্ম হতে হয় আমাদেরকে। সুতরাং কেউ জানালা খুলে পালিয়ে গেছে, রফিক তারপর জানালা বন্ধ করে দিয়েছে—এ অসম্ভব!'

শহীদ পাইপে টোবাকো ভরার জন্যে তেপয় থেকে কৌটা তুলে নিতে নিতে বলল, 'তার মানে ঘুরে ফিরে আবার সেই একই জায়গায় এসে দাঁড়াচ্ছি আমরা!'

'ঠিক তাই, শহীদ। চারকোনা রুমটার একদিকে কোন জানালা নেই, একদিকে একটি মাত্র দরজা, আর একদিকে দুটো জানালা, সর্বশেষ দিকে আরও দুটো জানালা। মোট চারটে জানালার একটি মাত্র খোলা। সেটা আমার পাহারায় ছিল। একটি মাত্র দরজা, সেটির পাহারায় ছিল কামাল। বাকি থাকে তিনটে জানালা, যেগুলোর যে কোন একটি খুলতে দশ মিনিট করে সময় লাগে। সুতরাং,

আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য যে রফিক চৌধুরীই দুটো গুলি ছুঁড়েছে—তা না হলে, অলৌকিক শক্তি এই ঘটনার সাথে জড়িত, ধরে নিতে হয়।'

ক্রিং! ক্রিং!'

হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলল কামাল ক্রেডল থেকে। কয়েক সেকেণ্ড পর রিসিভারটা বাড়িয়ে দিল সে শহীদের দিকে, 'অপরিচিত এক মহিলা, তোর সাথে কথা বলতে চাইছেন।'

রিসিভার নিয়ে শহীদ কানে ঠেকাল। হ্যাঁ, হুঁ, ঠিক আছে, এখুনি, বেশ—ছোট ছোট কিছু শব্দ উচ্চারণ করে রিসিভারটা যথাস্থানে নামিয়ে রাখল শহীদ।

প্রশ্ন করল মি. সিম্পসনকে, 'রফিক এখন কোথায়? নিশ্চয়ই জেল হাজতে?'

'হ্যাঁ।'

শহীদ বলল, 'ছেলেটার সাথে আমি কথা বলতে চাই। একা ওকে কি এখানে কিছুক্ষণের জন্যে একবার আনানো যায় না?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'কাজটা ঠিক আইনসঙ্গত নয়। তবে একান্তই যদি প্রয়োজন বলে মনে করো তুমি···।'

'প্রয়োজন তো বটেই। তবে এখন নয়, পরে। কামাল, গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক। মেহমান—মেহমান না বলে মক্কেল বলাই ভাল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে তসরিফ আনছেন!'

'মক্কেল আসছেন? কে?' মি. সিম্পসন অবাক হয়ে জানতে চান।

শহীদ বলল, 'মিস শাহানারা। এবং তার সাথে প্রখ্যাত ব্যারিস্টার সুফী সরফরাজ খান সাহেবও আসছেন।'

পাঁচ

ব্যারিস্টার সুফী সরফরাজ খানের বয়স পঞ্চাশ হলেও, দেখে মনে হয় পঁয়ত্রিশ কি চল্লিশ। প্রায় ছয়ফুট লম্বা তিনি। ইংরেজদের মত গায়ের রঙ। চঞ্চুনাসা। পরনে দামী ট্রপিক্যাল কাপড়ের কমপ্লিট স্যুট। শহীদের ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করলেন গম্ভীরভাবে, হাতে সুগন্ধী হ্যাভানা চুরুট থেকে নীলচে ধোঁয়া উঠছে।

ড্রয়িংরুমে ব্যারিস্টারের পিছু পিছু ঢুকল শাহানারা। প্রথম দর্শনেই মেয়েটাকে অপরূপ সুন্দরী বলে সার্টিফিকেট দেয়া চলে। সে যে চলনে বলনে আচারে ব্যবহারে আধুনিকা তা বোঝা যায় মুখের সপ্রতিভ ভাব, হাত-কাটা ব্লাউজ, পিন দিয়ে শরীরের সাথে আঁট করে জড়ানো দামী শিফন, সুরুচির নিদর্শন কারুকার্যময় ভ্যানিটি ব্যাগ এবং উঁচু হিলওয়ালা পায়ের জুতা দেখেই।

মি. সিম্পসনকে দেখে একটু যেন অবাক হলো শাহানারা, কিন্তু প্রায় সাথে সাথে সহাস্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল সে, 'মি. সিম্পসন, আপনাকে এখানে আশা করিনি। যাক, ভালই হলো। আমি যে কারণে এখানে এসেছি, তা আপনারও জানা দরকার।'

সকলের সাথে করমর্দন সেরে ওরা আসন গ্রহণ করল।

ব্যারিস্টার সরফরাজ খান বললেন, 'মি. শহীদ, লোদী সাহেবের পারিবারিক বন্ধু হিসেবে আমি শাহানারার সাথে এখানে এসেছি। শাহানারা কিছু তথ্য পেতে আগ্রহী…'

শাহানারা ব্যারিস্টারকে বাধা দিয়ে থামিয়ে দিল, বলল, 'না, ঠিক তা নয়। মি. শহীদ, খোলাখুলি বলছি আমি। আমি এসেছি আপনার সাহায্য চাইতে।'

শহীদ বলল, 'বলুন, কিভাবে আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারি?'

'আমাকে নয়, সাহায্য দরকার রফিকের।'

কামাল এবং মি. সিম্পসন চমকে উঠে দু'জনে একযোগে উচ্চারণ করল, 'রফিকের সাহায্য দরকার?'

শাহানারা দু'জনের কারও দিকে না তাকিয়ে শহীদের চোখে চোখ রেখে বলল, 'রফিকের সাহায্য দরকার। কারণ, আমার বিশ্বাস, পুলিস তাকে অকারণ সন্দেহে গ্রেফতার করেছে। আমার বিশ্বাস, বাবাকে সে খুন করেনি।'

ব্যারিস্টারকে অপ্রতিভ দেখাল একটু।

শহীদ তাঁর উদ্দেশেই প্রশ্ন করল, 'ঘটনা সম্পর্কে বিশদ জানা আছে আপনার, মি. খান?'

'কাগজে যা পড়েছি, তার বেশি এখনও বিশেষ কিছু জানার সুযোগ ঘটেনি আমার। শাহানারা এখানে আসছে শুনে ওকে সঙ্গ দেবার জন্যে চলে এসেছি আমি। সে যাই হোক, মি. শহীদ, আমি শুধু জানতে চাই, রফিক চৌধুরীই যে হত্যাকারী এ ব্যাপারে কি তেমন কোন সন্দেহ আছে?'

শহীদ প্রশ্নটা নিয়ে খানিক ভাবল। তারপর বলল, 'আছে বৈকি, তবে এ সন্দেহটাকে আনরীজনেবল্ ডাউট বলতে চাই আমি। ভাল কথা, মিস শাহানারা, আপনাকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।'

'বেশ তো।'

শহীদ বলল, 'কিছু মনে করবেন না, রফিক চৌধুরীর প্রতি আপনার কি বিশেষ কোন দুর্বলতা আছে?'

'না-না! ভুল বুঝবেন না আমাকে, প্লীজ, মি. শহীদ। হৃদয়ঘটিত কোন সম্পর্ক ওর সাথে আমার নেই। ওকে সম্ভবত আমি একটু অপছন্দই করি। তবে আমার সাথে আশ্চর্য ভাল ব্যবহার করে এসেছে ও সবসময়। হয়তো সেজন্যেই ওর এই বিপদে আমি স্থির থাকতে পারছি না।'

শহীদ বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন, ডাকাতির দায়ে ওর শাস্তি হয়েছিল? ডাকাতি করতে গিয়ে এক অসহায় বৃদ্ধকে মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলে…।'

'জানি! কিন্তু বিশ্বাস করি না। পুলিস আসল ডাকাতকে ধরতে না পেরে নিরীহ রফিককে ধরে হাজতে ভরে। রফিককে আমি যতটা চিনি, তার পক্ষে ও-কাজ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ও নিজে আমাকে বলেছিল, অকারণে ওকে শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। মি. শহীদ, আপনি জানেন না, কিন্তু আমি জানি,

রফিক একটা আদর্শবান ছেলে। ওর মত ভাল মানুষ আমার জীবনে আমি আর দেখিনি। যুদ্ধকে ঘৃণা করে ও, মারামারি সমর্থন করে না, মহাত্মা গান্ধীর ভক্ত ও। একটা গোপন সংস্থার সক্রিয় সদস্য ও। সংস্থার নীতি হলো, পৃথিবীতে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে, শারীরিক নির্যাতন বন্ধ করতে হবে, মানুষকে না খেয়ে মরতে দেয়া চলবে না, ধনী লোককে আরও ধনী হতে দেয়া চলবে না—ইত্যাদি। আপনিই বলুন, যে ছেলে এই সব মহৎ উদ্দেশ্যের জন্যে রাতদিন খাটাখাটনি করে, তার পক্ষে ডাকাতি করা কি সম্ভব?'

'হুঁ। কতদিনের পরিচয় তার সাথে আপনার?'

'বছর তিন চার হবে।'

'কি করে সে?'

'সে একজন শিল্পী।'

শহীদ বলল, 'আর মাত্র একটা প্রশ্ন। আপনি বলছেন, আপনার বিশ্বাস, রফিক আপনার বাবাকে খুন করেনি। অথচ আপনিই মি. সিম্পসনকে ফোন করে বলেছিলেন...'

'হ্যাঁ, বলেছিলাম। তবে সত্যি সত্যি সে খুন করতে যাচ্ছে তা ভেবে ফোন করিনি আমি। ঘটনাটা ব্যাখ্যা করে বললে বুঝতে পারবেন। আসলে ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম আমি। হয়েছিল কি, গতকাল সাড়ে তিনটে এবং চারটের মধ্যে রাস্তায় দেখা হয়েছিল আমার সাথে রফিকের। চারটে বা আরও কিছু আগে থেকে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছিল, তাই না? মতিঝিলের কাছাকাছি লাভলি রেস্টুরেন্টের কাছে ওকে আমি দেখতে পাই। মাথা নিচু করে হনহন করে হাঁটছিল ও। দেখে মনে হচ্ছিল রাগে ফায়ার হয়ে আছে। গাড়ি দাঁড় করিয়ে ডাকি ওকে। কাছে আসে, কিন্তু কথা বলতে অস্বীকার করে। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করতেও কোন উত্তর দিতে রাজি হয় না। লাভলি রেস্টুরেন্ট দেখা যাচ্ছিল, ওকে বললাম, চা খাবে নাকি? অনেক করে বলতে রাজি হলো। রেস্টুরেন্টে ঢুকে বসতে না বসতে, ফেটে পড়ল ও, বাবাকে যা-তা বলে গালমন্দ করতে শুরু করল। এর আগে রফিককে আমি রাগতে দেখিনি। সুতরাং ভয় পেয়ে যাই আমি। ওকে শান্ত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হই। শেষ পর্যন্ত বলি, তুমি যদি না থামো, বাধ্য হব আমি চলে যেতে। পাল্টা জবাব দিয়ে বলে ও, যাও! কিন্তু যাবার আগে শুনে যাও, তোমার বাবাকে আজ আমি খুন করবই। রেস্টুরেন্টে ওকে রেখে আমি গাড়িতে ফিরে আসি। ওখান থেকে পাবলিক লাইব্রেরীতে যাই, একটা বই নিয়ে সোজা ফিরে আসি বাড়িতে। গেটে দারোয়ান রমজান ছিল, তাকে আমি সাবধান করে দিয়ে বলি, কেউ যেন বাড়ির ভিতর ঢুকতে না পারে। রমজানকে কথাটা বলে নিজের রুমে চলে আসি। কিন্তু রফিকের শেষ কথাটা কোনমতে মন থেকে সরাতে পারিনি। অস্থিরভাবে পায়চারি করতে থাকি। তখন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল, বৃষ্টির বেগ বেড়ে গিয়েছিল—পরিবেশটা আমাকে আরও অস্থির এবং আতঙ্কিত করে তোলে। তারপর একসময়, কি করছি না করছি না ভেবেই ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলে ডায়াল করি,

মি. সিম্পসনকে বলি…'

শহীদ বলল, 'বুঝেছি। আচ্ছা, আপনার বাবা কি রফিককে চিনতেন?'

একটু ইতস্তত করল শাহানারা, 'চিনতেন বৈকি। জানতেনও আমি রফিকের সাথে মেলামেশা করি।'

'নিশ্চয়ই পছন্দ করতেন না?'

'না। কিন্তু কারণটা জানি না। তবে আমার উপস্থিতিতে রফিকের সাথে বাবার সাক্ষাৎ হয়নি কখনও।'

শহীদ প্রশ্ন করল, 'তাহলে, আপনি কি মনে করেন রায় দেবার সময় আপনার বাবা ব্যক্তিগত অপছন্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন? ঠিক আছে, এ প্রশ্নটার উত্তর না দিলেও চলবে। আপনাদের পারিবারিক বন্ধু, মি. খান, চান না আপনি এ প্রশ্নের উত্তর দেন। ভাল কথা, আপনি কি জানেন, রফিক স্বীকার করেছে যে দুটোর মধ্যে একটি গুলি সে-ই ছুঁড়েছে?'

শাহানারার চোখ দুটো বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠল, 'না তো! কী আশ্চর্য! সে যদি নিজেই স্বীকার করে থাকে…!'

'না, আপনার বাবাকে সে খুন করেছে একথা স্বীকার করেনি। তার বক্তব্য, সে যে গুলিটা করে সেটা আপনার বাবাকে স্পর্শ করেনি। সমস্যা ওখানেই।'

শহীদ সংক্ষেপে ঘটনাটা ব্যাখ্যা করে শোনাল, তারপর বলল, 'সুতরাং বুঝতেই পারছেন, পুলিস রফিককেই অভিযুক্ত করবে, অন্য কাউকে খুনী বলে সন্দেহ করার মত পাওয়া না গেলে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, তেমন কাউকে পাওয়া যাবে না। আপনার বাবাকে খুন করতে পারে, এমন কেউ আছে বলে মনে করেন আপনি?'

'বাবাকে খুন করতে পারে এমন কেউ? নাহ্! পৃথিবীতে তেমন লোক আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না! বাবা আদর্শ মানুষ ছিলেন, তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত।'

'পারিবারিক জীবনে তিনি কি কারও বিরূপতার কারণ ছিলেন?'

শাহানারা সবিস্ময়ে বলল, 'কি বলছেন আপনি, মি. শহীদ? বাবা অন্য ধরনের মানুষ ছিলেন। জীবনে তিনি আমাদের দু'বোনকে কখনও ধমক মারেননি। বাবা সর্বক্ষণ আদর্শ, মহত্ত্ব, মানবতা—ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কথা বলতেন। স্বীকার করি, তিনি প্রায় প্রত্যেকদিনই আমাদেরকে একত্রিত করে বক্তৃতা মত দিতেন। ভবিষ্যৎ পৃথিবীটাকে কিভাবে স্বর্গতুল্য করে তোলা যায়, সে ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব মতবাদ ছিল। ধৈর্য ধরে তাঁর বক্তব্য শুনতে হত আমাদের। বাড়িতে আমরা সবাই এতে করে একটু অস্বস্তি বোধ করতাম, কিন্তু সে এমন কিছু নয়।'

শহীদ ব্যারিস্টারের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি, মি. খান?'

'নাহ্, লোদীর কোন শত্রু ছিল না। থাকতে পারে না।'

শহীদ বলল, 'আর কিছু বলবার নেই আপনার?'

অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল তাঁর কণ্ঠস্বর, তেপয়ের উপর রাখা ব্রাউনিং অটোমেটিকটার দিকে আঙুল দেখিয়ে তিনি বললেন, 'ও, তাহলে দ্বিতীয় গুলিটা করা হয়েছে এই ব্রাউনিং দিয়ে? বাহ্, গোটা ব্যাপারটা চমৎকার মোড় নিল দেখছি। মি. শহীদ, আমি জানি না রফিক চৌধুরী গিল্টি অর নট গিল্টি। কিন্তু এখন আমি জানি, তার পক্ষ সমর্থনের জন্যে আমি রাজি হব না···কারণ, এই ·৩২ ব্রাউনিং অটোমেটিকটার মালিক আমি স্বয়ং!'

ছয়

সুন্দরী শাহানারা বিস্ময়ের আতিশয্যে দুর্বোধ্য একটা শব্দ উচ্চারণ করে ঝুঁকে পড়ল ব্যারিস্টার সরফরাজ খানের দিকে।

ব্যারিস্টার সাহেব বিনাবাক্যব্যয়ে সোফা ত্যাগ করলেন। কোটের বুক পকেট থেকে রেক্সিন দিয়ে বাঁধাই করা একটা নোটবুক বের করলেন। নোটবুকের মত দেখতে হলেও জিনিসটা তা নয়।

নির্বিকার পাইপ টানছে শহীদ। একটু যেন কৌতুক বোধ করছে ও।

কামাল এবং মি. সিম্পসন বিস্মিত হয়ে পড়েছেন। ব্যারিস্টারের দিকে অবিশ্বাসভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

ব্যারিস্টার হাতের জিনিসটা বাড়িয়ে দিলেন শহীদের দিকে, বললেন, 'মি. শহীদ, এই হলো আমার ব্রাউনিং অটোমেটিকের লাইসেন্স। সিরিয়াল নাম্বার মিলিয়ে দেখুন, হুবহু মিলে যাবে।'

শহীদ ঠোঁট থেকে পাইপ নামিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রশ্ন করল, 'মি. খান, আপনি কি স্বীকার করতে যাচ্ছেন লোদী সাহেবের হত্যাকারী আপনি নিজে?'

ব্যারিস্টার সাহেবের ক্লিনশেভ মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। তিনি শহীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গড লাভ আস, আই ডিড নট কিল হিম, ইফ দ্যাটস হোয়াট ইউ থিঙ্ক। লোদীকে আমি ভালবাসতাম। জানি, অসাধারণ একটা পরিস্থিতিতে পড়ে গেছি আমি। এখানে ঢোকার পরপরই ব্রাউনিংটাকে দেখে সন্দেহ হয় আমার। কিন্তু এতক্ষণ বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। মনে করছিলাম, আমারটার মত দেখতে, নিশ্চয়ই আমারটা নয় এটা। কিন্তু সিরিয়াল নাম্বার দেখে সব সন্দেহ দূর হয়ে গেছে। অটোমেটিকটা আমারই। শেষ বার এটাকে আমি দেখেছি আমার নিজস্ব চেম্বারের ডেস্কে, বাঁ দিকের সবচেয়ে নিচের দেরাজে।'

'রফিকের পক্ষে কি সেখান থেকে এটাকে চুরি করা সম্ভব?'

'ব্যারিস্টার সাহেব খানিক চিন্তা করলেন, তারপর জবাবে বললেন, 'মনে হয় না। প্রায় অসম্ভবই বলতে পারেন। রফিককে আমি চিনি না। আমার চেম্বারে কখনও সে যায়নি। তবে, সিঁদ কেটে বা গোপন কোন পদ্ধতিতে চুরি করে থাকলে, বলতে পারি না।'

'শেষ কবে দেখেছেন এটাকে?'

'এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারব না। দুঃখিত। বছর খানেকের মধ্যে ডেস্কের নিচের দেরাজটা খুলিনি আমি। কে জানে, বছর খানেক আগেই হয়তো চুরি হয়েছে এটা। আবার, দু'চারদিন আগেও চুরি হয়ে থাকতে পারে।'

'কে চুরি করতে পারে? কাউকে আপনার সন্দেহ হয় কি? লোদী সাহেবের বাড়ির মানুষ কেউ?'

'সন্দেহ কাকে করব বলুন? তবে, পরিচিত অনেকেই আমার চেম্বারে যাতায়াত করে। তাদের মধ্যে যে কেউ চুরি করতে পারে।'

শহীদ বলল, 'কিছু মনে করবেন না, মি. খান, আমি জানতে চাই গতকাল বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন?'

'সাড়ে তিনটে পর্যন্ত ছিলাম কোর্টে। ওখান থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম। সাড়ে চারটের সময় লোদীর সাথে চা খাবার কথা ছিল। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে, বাড়ি ফিরে আমার মুহুরির মুখে শুনলাম আমার এক বন্ধু ব্যারিস্টার জাহিদ হোসেন হাই প্রেশারে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, এবং লেকসার্কাস মার্ডার মিস্টরির আসামীদের দায়িত্ব আমাকে নেবার অনুরোধ জানিয়ে গেছে সে। মার্ডার কেসটা খুবই জটিল, আশা করি সংবাদপত্রে এ সম্পর্কে পড়েছেন। কেসের ট্রায়াল ছিল আজ। মুহুরির মুখে সব শুনে লোদীর সাথে চা খাবার পরিকল্পনা বাতিল করে দিলাম। কোর্টে আসামীদের হয়ে লড়তে হলে ব্রীফ নিয়ে বসতে হবে। তাই বসলাম। চারটে থেকে ছ'টা পর্যন্ত ব্রীফ নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম আমি। ছ'টার পর হঠাৎ আমার মনে পড়ে লোদীর কথা। চা খেতে যাবার কথা অথচ যাইনি, সময়ও চাওয়া হয়নি—ব্যস্তভাবে ফোন করি লোদীর বাড়িতে···কিন্তু কাকে ফোন করব! লোদী তখন বেঁচে থাকলে তো!'

'চারটে থেকে ছয়টা পর্যন্ত, সব সময়, চেম্বারেই ছিলেন আপনি? আপনার এই বক্তব্যের স্বপক্ষে সাক্ষী দেবে কেউ?'

'আউটার রুমে আমার মুহুরি ছিল। প্রায় ছয়টা পর্যন্তই ছিল সে। আমি ছিলাম ভিতরের চেম্বারে। আমার চেম্বার থেকে বেরুবার ওই একটাই পথ, মুহুরির রুমের ভিতর দিয়ে।'

দাঁত দিয়ে পাইপ চেপে ধরে শহীদ সোফা ত্যাগ করল অকস্মাৎ। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে ও যেন একটু সম্মান প্রদর্শন করল ব্যারিস্টার এবং শাহানারাকে, তারপর নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, 'আর একটি অনুরোধ রাখব আপনাদের কাছে আমি। আপনাদের মূল্যবান আধঘণ্টা সময় আমাকে দান করতে হবে। আশা করি···'

শাহানারা বলল, 'বুঝলাম না।'

'আপনারা পাশের স্টাডিরুমে মাত্র আধঘণ্টার জন্যে অপেক্ষা করুন, আমরা জরুরী একটা কাজ সেরে নিই এই ফাঁকে, তারপর আবার আপনাদের সঙ্গে কথা বলব আমি।'

ব্যারিস্টার খান কিছু যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু শহীদ তাঁকে প্রতিবাদের

সুযোগ না দিয়ে কামালের উদ্দেশে বলে উঠল, 'কামাল, মিস শাহানারা এবং মি. খানকে লাইব্রেরী রুমে পৌঁছে দিয়ে আয়।'

কামাল সোফা ছেড়ে পা বাড়াল, বলল, 'আমার সাথে আসুন আপনারা, প্লীজ!'

অগত্যা কাঁধ ঝাঁকিয়ে ব্যারিস্টার খান কামালকে অনুসরণ করলেন। শাহানারাও।

কামাল লাইব্রেরী রুমের দরজার কাছে পৌঁছুবার আগেই, বন্ধ দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল।

ইনভ্যালিড চেয়ারে বসে রয়েছে কুয়াশা। মুখে স্মিত হাসি। চলমান চেয়ার নিয়ে লাইব্রেরী থেকে ড্রয়িংরুমে ঢুকল সে। সহাস্যে সকলের উদ্দেশে বলল, 'গুডমর্নিং, অল অফ ইউ!'

মি. সিম্পসন সোফা ত্যাগ করে এগিয়ে গেলেন সহাস্যে, 'হ্যালো, মি. আহমেদ! কেমন আছেন? মাত্র দু'দিনের আলাপে মনের ওপর এমন একটা ছাপ মেরে দিয়েছেন, আপনাকে আমি ভুলতেই পারছি না।'

করমর্দন করল ওরা।

ব্যারিস্টার খান লাইব্রেরীতে ঢুকে পিছন ফিরে তাকালেন একবার, নিচু গলায় শাহানারার উদ্দেশে বললেন, 'ভদ্রলোক কে বলো তো? একটু যেন চেনা চেনা লাগছে?'

শাহানারা বলল, 'আশ্চর্য সুন্দর চেহারাখানা, তাই না? বাঙালী পুরুষ এমন দেখা যায় না।'

ভদ্রতাসূচক হাসি হেসে কামাল মধ্যবর্তী দরজাটা বন্ধ করে দিল ধীরে ধীরে।

শহীদ মুচকি হেসে বলল, 'মি. সিম্পসন, এবার আপনার ক্ষমতা কাজে লাগান। থানা হাজত থেকে রফিককে আনাবার ব্যবস্থা করুন।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'করছি ব্যবস্থা। মি. আহমেদ, আমার অনুরোধ, এই রহস্যময় কেসটা সম্পর্কে আপনিও একটু মাথা ঘামান। আপনাকে আমি এক ফাঁকে সংক্ষেপে সব শুনিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে, ফোন করে রফিককে আনাবার ব্যবস্থা করি।'

কামাল বলল, 'আমি যাই, মহুয়াদিকে চা দিতে বলি।'

কামাল পা বাড়াল অন্দর মহলের দিকে। মি. সিম্পসন রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করতে শুরু করলেন থানায়।

শহীদ পাইপে টোবাকো ভরছে মাথা নিচু করে। একসময় চোখ তুলে তাকাল ও কুয়াশার দিকে। ইনভ্যালিড চেয়ারে বসে আছে সে। কোলের উপর পাঁচ সের ওজনের একটা মোটা বই। বইটা খোলা। কুয়াশা পড়ায় মগ্ন। মুচকি একটু হাসল শহীদ।

দ'জন কনস্টেবল পনেরো মিনিটের মধ্যে হাজির হলো রফিক চৌধুরীকে

নিয়ে। ত্রিশ-একত্রিশ বছর বয়স রফিকের। হ্যাণ্ডসাম। মুখটা ম্লান হলেও, দু'চোখে বুদ্ধির দীপ্তি। নিঃশব্দে ড্রয়িংরুমে ঢুকল সে। হাতে হাতকড়া লাগানো থাকলেও, দাঁড়াবার ভঙ্গিতে পরাজয়ের কোন লক্ষণ নেই।

'বসুন।' শহীদের কণ্ঠস্বর শুনে তাকাল রফিক। বসল একটা চেয়ারে। কনস্টেবল দু'জন দাঁড়াল তার দু'পাশে।

কোনরকম ভূমিকা না করে শহীদ সরাসরি প্রশ্ন করল, 'রেস্টহাউজে, আই মীন, লোদী সাহেবের লাইব্রেরী রুমে আসলে যা ঘটেছে, আপনি পরিষ্কার করে সব বলছেন না কেন?'

রফিক বলল, 'আসলে কি ঘটেছে তা জানলে তো বলব! শয়তানটাকে গুলি করেছিলাম, জানি গুলি লাগেনি···ব্যস! এর বেশি আমি কিছু দেখিনি। তবে আরও একটা গুলির শব্দ শুনেছিলাম আমি। সেই গুলিটাই লাগে ওর। চেয়েছিলাম নিজের হাতে খুন করব শয়তানটাকে—কিন্তু মিস করি আমি।'

'কে খুন করেছে সেটাই আবিষ্কার করতে চাই আমরা। ভাল কথা, আপনি একজন আর্টিস্ট, তাই না?'

'আমি একজন পেইন্টার। শিল্পী বলে নিজেকে দাবি করি না।'

শহীদ প্রশ্ন করল, 'আপনার রাজনৈতিক বিশ্বাস কি?'

রফিক গড় গড় করে বলতে শুরু করল, 'সংঘর্ষে বিশ্বাস করি না। যুদ্ধকে ঘৃণা করি। আমরা এমন একটা পৃথিবী কায়েম করতে চাই যে পৃথিবীতে যুদ্ধ, হিংসা, নির্যাতন এবং অভাব থাকবে না।'

'কিভাবে, কোন পদ্ধতিতে তা সম্ভব?'

'অত্যাচারী শোষকদের উৎখাত করার মাধ্যমে তা সম্ভব। আমলাদের পদচ্যুত করে, ক্ষমতাবান অন্ধদের বিতাড়িত করে, রক্ষণশীল অভিভাবকদের জ্যান্ত কবর দিয়ে তা সম্ভব।'

'জজ লোদী সাহেব কি রক্ষণশীল ছিলেন?'

'রক্ষণশীলদের চূড়ামণি ছিল শয়তানটা।'

'তাঁর প্রতি এত ক্রোধ কেন আপনার?'

রফিক বলল, 'অবাধ মেলামেশায় বিশ্বাস ছিল না তার। রক্ষণশীল ছিল। সবচেয়ে বড় কারণ, আমাকে ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করত না বলে ক্ষমতার অপব্যবহার করে আমাকে বেত্রাঘাত এবং আঠারো মাসের জেলের হুকুম দেয়। এতে করে সমাজের চোখে সে আমাকে নষ্ট বলে প্রমাণ করে।'

'মিস শাহানারার সাথে আপনার সম্পর্ক কি?'

'তাকে চিনি। এইটুকুই সম্পর্ক। এই কেসে তাকে টেনে আনার কোন মানে হয় না। সে এ ব্যাপারে কিছুই জানে না।'

শহীদ বলল, 'হুঁ। আচ্ছা, এবার বলুন, গতকাল বিকেলে লোদী সাহেবের বাড়িতে আপনি ঢুকেছিলেন কিভাবে।'

'আমার সাথে শাহানারার দেখা হয় রাস্তায়। ও আমাকে চা খেতে নিয়ে যায়

লাভলীতে। মেজাজ খারাপ ছিল, ওকে দেখে কি যে হলো, বলেই ফেললাম, তোমার বাবাকে আজ আমি খুন করতে যাচ্ছি। দুঃখ পায় ও, আমাকে শান্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু আমার মেজাজ আরও খারাপ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আমাকে রেস্টুরেন্টে রেখে বেরিয়ে যায় ও, যাবার সময় বলে যায়, পাবলিক লাইব্রেরীতে যাচ্ছে ও। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে যাবার পর ওকে আমি ফলো করি। ও পৌঁছুবার মিনিট সাতেক পর আমি পাবলিক লাইব্রেরীর সামনে পৌঁছাই। ওর গাড়িটা তখনও দাঁড়িয়েছিল, আশপাশে কেউ নেই দেখে আমি ওর গাড়ির পিছন দিকের বনেট খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ি। খানিক পর গাড়িতে এসে ওঠে শাহানারা। সোজা বাড়ি ফেরে ওখান থেকে। গ্যারেজে গাড়ি রাখে ও, বেরিয়ে যায়। খানিক পর গাড়ির পিছন থেকে আমিও বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু আমি জানতাম না ওর বাবা ঠিক কোথায় আছে। আধ ঘন্টা সময় নষ্ট করি আমি এদিক ওদিক উঁকি মেরে। একটা জানালা দিয়ে তারপর ঢুকি বাড়ির ভিতর। শাহানারাকে একটা রুমের ভিতর বসে থাকতে দেখি আমি। কি যেন চিন্তা করছিল। আমাকে ও দেখতে পায়নি। জানালা দিয়ে গোপনে দেখছিলাম ওকে আমি। এই সময় বাটলার লোকটা রুমে ঢোকে, জানতে চায় শাহানারা চা খাবে কিনা।'

'বলে যান, বলে যান।'

'শাহানারা বলে, হ্যাঁ, চা খাব। তারপর সে বাটলারকে বলে, বাবার চা তৈরি করতে হবে না, কারণ, বাবা রেস্টহাউজে আছেন। মোটকথা, ওদের কথাবার্তা শুনেই আমি বুঝতে পারি, শয়তানটা কোথায় আছে। এরপর জানালা গলে আবার আমি বেরিয়ে আসি বাড়ির বাইরে, পা বাড়াই রেস্টহাউজের দিকে।'

'তখন ক'টা বাজে?'

'জানি না। ওখান থেকে সোজা আমি রেস্টহাউজের দিকে চলে যাই। দরজা দিয়ে হলরুমে ঢোকার আগেই দেখতে পাই মি. সিম্পসন এবং তার এক সঙ্গীকে ওই ওখানে।' কামালকে দেখিয়ে দিয়ে কথা শেষ করল রফিক।

শহীদ বলল, 'ওঁরা আপনাকে দেখেন সাড়ে পাঁচটার সময়। বেশ, বলে যান। সবটা শুনতে চাই আমি।'

'এর আগে হাজার বার বলেছি আমি। তবু, ফের বলছি। দরজা পেরিয়ে আমি হলরুমে ঢুকি। লাইব্রেরীতে ঢোকার দরজাটা ওই হলরুমেই। দরজাটা খোলা কিনা জানতাম না। কিন্তু ধাক্কা দিতেই সেটা খুলে গেল। ভিতরে ঢুকে বন্ধ করতে গিয়ে দেখি কী-হোলে চাবি ঢোকানো রয়েছে। দেরি না করে চাবি ঘুরিয়ে তালা লাগিয়ে দিই দরজায় আমি। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখি বুড়ো শয়তানটা জানালার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, শব্দ পেয়ে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে আমার দিকে। আমি কয়েক পা এগিয়ে যাই, দাঁড়াই কামরার মাঝখানে, তারপর গুলি করি।'

'এর মধ্যে তিনি কিছুই বলেননি?'

'বলেছিল, কি চাও···বা ওই ধরনের কিছু। জানালার কাছ থেকে এগিয়ে আসছিল সে, ডেস্কের দিকে। হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে রেখে ছিল, আমার হাতে

রিভলভার দেখে ভয়ে সম্ভবত। গুলি করলাম, কিন্তু সে থামল না। যেমন এগিয়ে আসছিল তেমনি এগিয়ে আসতে লাগল। ডেস্কের একেবারে কাছাকাছি চলে আসতে, আমাকে চমকে দিয়ে আর একটা গুলির শব্দ হলো। শয়তানটা বুক ধরে টলতে লাগল। তারপর মুখ থুবড়ে পড়ল ডেস্কের ওপর।'

'আচ্ছা, আপনি পিস্তল-রিভলভার চালাতে অভ্যস্ত?'

'না। এর আগে শখের বশে দু'একবার রাইফেল চালিয়েছি।'

'রুমের ভিতর আর কাউকে আপনি দেখেননি?'

'না।'

মি. সিম্পসনের দিকে তাকাল শহীদ, 'একটা প্রশ্ন, মি. সিম্পসন। রুমের ভিতর এমন কোন যান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে কি যেটার সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পিস্তলের গুলি ছোঁড়া সম্ভব, মানুষের সাহায্য ছাড়াই?'

'একেবারে অসম্ভব, শহীদ। আমি আর কামাল রুমটা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি। গোপন পথ বা ওই ধরনের কোন কিছুর কথাও তুমি বাদ দিতে পারো, রুমের ভিতরে একটা ইঁদুরের গর্ত পর্যন্ত নেই। তা ছাড়া, ব্রাউনিংটা পাওয়া গেছে রুমেরই ভিতর একটা ফ্লাওয়ার ভাসে, রুমের ভিতর থেকেই ওটা ব্যবহার করা হয়েছে।'

শহীদ খানিক চিন্তা করার পর বলল, 'ঠিক। আমরা ধরে নিতে পারি দ্বিতীয় গুলিটা যে-ই করে থাকুক, করেছে সে রুমের ভিতর থেকেই। রফিক চৌধুরী, বলুন তো, আপনি যখন গুলি করেন, লোদী সাহেব তখন আপনার কাছ থেকে ঠিক কতটা দূরে ছিলেন?'

'পনেরো ফিট হবে।'

'হুঁ। ঠিক আছে। ধরে নেয়া যাক, কেউ গুলি করার পর ব্রাউনিংটা ফ্লাওয়ার ভাসের ভিতর ফেলে দেয়। শব্দ হবার কথা। আপনি তেমন কোন শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন কিনা মনে করে দেখুন তো?'

রফিক বলল, 'কোন শব্দই পাইনি আমি। পেলে মনে থাকত।'

শহীদ বলল, 'রফিক চৌধুরী, যা বলতে চাইছেন আপনি তা যে সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব, বুঝতে পারছেন তো? আপনি বলতে চাইছেন ওই রুমের ভিতর আরও একজন লোক ছিল; যার গুলিতে লোদী সাহেব খুন হয়েছেন—অথচ তাকে আপনি দেখেননি, তাকে আপনি পালাতেও দেখেননি। ব্যাপারটা অসম্ভব নয়?'

এমন সময় বাধা দিল টেলিফোনটা।

কামাল রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল, বলল, 'মি. সিম্পসন, আপনার ফোন।'

রিসিভার নিয়ে মি. সিম্পসন কথা বলতে শুরু করলেন। মিনিট খানেক কথা বলার পর রিসিভার নামিয়ে রাখলেন তিনি।

অস্বাভাবিক গম্ভীর ও চিন্তিত দেখাচ্ছে তাঁকে।

শহীদই প্রশ্ন করল, 'কি খবর, মি. সিম্পসন?'

মি. সিম্পসনের কণ্ঠস্বরটাও থমথমে শোনাল। তিনি বললেন, 'পোস্ট-মর্টেমের

রিপোর্ট তৈরি করেছেন ডাক্তার ইদ্রিস।'

কামাল ব্যগ্রকণ্ঠে জানতে চাইল, 'কি বলা হয়েছে রিপোর্টে? লাশের শরীরে কত ক্যালিবারের বুলেট পাওয়া গেছে?'

রফিক হঠাৎ টলতে টলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। অস্থির উত্তেজনায় কাঁপছে সে। পোস্ট-মর্টেমের রিপোর্টের উপর জীবন-মরণ নির্ভর করছে তার। লাশের শরীরে যদি ·৩৮ আইভর-জনসনের বুলেট পাওয়া যায়, নির্ঘাত মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে তাকে।

মি. সিম্পসন বললেন, 'রিপোর্টে কি বলা হয়েছে তা ডাক্তার ইদ্রিস আমাকে বললেন না। লাশ পরীক্ষা করে তিনি নাকি এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য উদঘাটন করেছেন, শুনে মূর্ছা যাবার মত অবস্থা হবে আমার। ডাক্তার ইদ্রিস অন্তত তাই বললেন। তিনি স্বয়ং আসছেন রিপোর্ট সঙ্গে নিয়ে। সামনাসামনি বলবেন।'

কুয়াশা ৬৮

প্রথম প্রকাশ: জুন, ১৯৭৭

এক

পুলিস সার্জেন ডাক্তার ইদ্রিস মোটামুটি প্রৌঢ়, মাথা জুড়ে চকচকে টাক। পরনে হালকা নীল রঙের স্যুট। সদা হাস্যময় ভদ্রলোক। কিন্তু ড্রয়িংরুমে তিনি ঢুকলেন নীরস ভঙ্গিতে। চাপা একটা উত্তেজনা রয়েছে তাঁর ভিতর, লক্ষ করল সবাই।

শহীদ অভ্যর্থনা জানিয়ে বসতে অনুরোধ করল ডাক্তার ইদ্রিসকে। ভদ্রলোক বসলেন একটি চেয়ারে, সকলের কাছ থেকে একটু দূরে।

মি. সিম্পসন বললেন, 'ইদ্রিস সাহেব, আমরা সবাই আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি। আপনার রিপোর্ট না পেলে আর এক পাও এগোতে পারব না আমরা।'

মি. সিম্পসন তেপয়ের উপর রাখা আগ্নেয়াস্ত্র দুটো দেখিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, 'আমাদের মতামত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। একদলের ধারণা, লোদী সাহেব নিহত হয়েছেন ·৩৮ আইভর-জনসন রিভলভার থেকে নিক্ষিপ্ত বুলেটের দ্বারা, গুলিটা করা হয়েছে পনেরো ফুট দূর থেকে। অপরদল এই বক্তব্য স্বীকার করছে না, তারা বলছে, লোদী সাহেব নিহত হয়েছেন ·৩২ ব্রাউনিং থেকে নিক্ষিপ্ত বুলেটের দ্বারা, গুলি করা হয়েছে পঁচিশ ফুট দূর থেকে। কোন্ দলের ধারণা সত্য?'

'কোন দলের ধারণাই সত্য নয়,' ডাক্তার বললেন।

সিধে হয়ে বসল শহীদ, অত্যন্ত ধীরে ধীরে।

মি. সিম্পসন কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে আচমকা রাগত কণ্ঠে বললেন, 'তার মানে?'

'বললাম তো, দু'দলের ধারণাই ভুল। আসলে, স্যার, জজ লোদী সাহেব খুন হয়েছেন এর্কম্যান (Erkmann) এয়ার পিস্তলের পেলেটে। বুলেটটা ·৩৮ বা ·৩২ নয়—লাশের দেহে পাওয়া গেছে ·২২ ক্যালিবারের পেলেট। গুলি করা হয়েছে মাত্র দশ ফুট দূরত্ব থেকে।'

ড্রয়িংরুমে বজ্রপাত ঘটলেও বুঝি সবাই এমনভাবে বিস্ময়ে পাথরের মূর্তিতে পরিণত হত না।

অবিশ্বাসের দৃষ্টি সকলের চোখে। সবাই তাকিয়ে আছে ডাক্তার ইদ্রিসের দিকে। একজন শুধু ব্যতিক্রম।

সে কুয়াশা। কোন ভাবান্তর নেই তার মধ্যে। চূড়ান্ত নাটক ঘটে যাচ্ছে ড্রয়িংরুমের ভিতর, সে যেন তা জানেই না। মাথা নিচু করে পাঁচ সের ওজনের

মোটা বইটা নিমগ্নচিত্তে পড়ছে সে।

পলক পড়ছে না মি. সিম্পসনের চোখে। নিস্তব্ধতা ভাঙলেন তিনিই, 'ডাক্তার, আমি জিজ্ঞেস করছি আপনি সুস্থ? মদ খেয়ে মাতলামো করছেন না তো?'

ডাক্তার ইদ্রিস হাসলেন। বললেন, 'জীবনে ও-জিনিস স্পর্শ করিনি।'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন ওই বন্ধ রুমের ভিতর একটা নয়, দুটো নয়, তিন তিনটে গুলি ছোঁড়া হয়েছে?'

'আপনাদের কেস সম্পর্কে বিশেষ কিছু আমি জানি না, মি. সিম্পসন। আমি শুধু জানি, লাশ পরীক্ষা করে নিঃসন্দেহভাবে আবিষ্কার করেছি, লোদী সাহেব নিহত হয়েছেন ·২২ ক্যালিবারের গুলি খেয়ে। এবং মাত্র দশ ফুট দূর থেকে তাঁর বুকে গুলি ছোঁড়া হয়। এই যে পেলেটটা, সাথে করে নিয়ে এসেছি আমি।'

পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করলেন ডাক্তার। এনভেলাপ থেকে ছোট্ট একটা সীসার টুকরো বের করে রাখলেন তেপয়ের উপর। বললেন, 'এই পেলেট শুধু মাত্র এর্কম্যান এয়ার পিস্তল থেকে ছোঁড়া যেতে পারে। আরও একটা তথ্য জানাতে পারি আমি আপনাকে। সেটা হলো এর্কম্যান এয়ার পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়লে শব্দ হয় খুবই কম, প্রায় শুনতে না পাবারই মত।'

মি. সিম্পসন ঝট্ করে তাকালেন রফিকের দিকে, 'আপনার কিছু বলবার আছে?'

রফিক ঘটনার আকস্মিকতায় বোকার মত দাঁড়িয়ে ছিল চেয়ার ত্যাগ করে। বোকার মতই বলল সে, 'আমি···আমি···কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'আপনি তৃতীয় গুলিটার শব্দ শোনেননি বা কাউকে ছুঁড়তেও দেখেননি?'

'না!'

শহীদ মুখ খুলল এবার, 'মি. সিম্পসন, সার্চ করার সময় কোন এয়ার পিস্তল পাননি আপনারা রুমের ভিতর?'

'না। পাব কোত্থেকে? থাকলে তো!'

'রফিক চৌধুরীকে ভাল করে সার্চ করেছিলেন?'

কামাল জবাব দিল মি. সিম্পসনের হয়ে, 'কয়েকবার। এয়ার পিস্তল তো দূরের কথা, একটা আলপিনও ছিল না ওর পকেটে বা শরীরের অন্য কোথাও।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'রফিক চৌধুরী তিন তিনটে আগ্নেয়াস্ত্র সাথে নিয়ে লোদী সাহেবকে খুন করার জন্যে গিয়েছিল এটা কল্পনা করা একমাত্র পাগলের পক্ষেই সম্ভব। তিনটে আগ্নেয়াস্ত্র বহন করা জটিল ব্যাপার। তারচেয়ে একটা মেশিনগান নিয়ে যাওয়া অনেক সহজ! ·২২ পেলেট তো আইভর-জনসন বা ব্রাউনিংয়ে ভরে ছোঁড়া অসম্ভব।'

'অসম্ভব।'

রফিক ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে উঠছে নিজের অনুকূল অবস্থা সম্পর্কে। হঠাৎ সে গলায় অস্বাভাবিক জোর এনে জানতে চাইল, 'মাফ করবেন, এতে করে কি এখন প্রমাণ হয় না যে আমি প্রকৃত খুনী নই?'

শহীদ বলল, 'হ্যাঁ, তাই প্রমাণ হয়। বোধহয় বেঁচে গেলেন এ যাত্রা। মি.

সিম্পসন, রফিক চৌধুরীকে যথাস্থানে পাঠিয়ে দিন আপাতত, পরে দেখা যাবে ওকে কবে নাগাদ মুক্তি দেয়া যায়।'

মি. সিম্পসনের ইঙ্গিতে কনস্টেবলদুজন রফিককে সাথে নিয়ে বেরিয়ে গেল ড্রয়িংরুম থেকে।

শহীদ বলল, 'খুবই ইন্টারেস্টিং কেস, সন্দেহ নেই। আসুন দেখা যাক, আমরা কি পজিশনে দাঁড়িয়ে আছি। এখন আর কোন সন্দেহ নেই যে, তিনটে আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে তিনটে গুলি ছোড়া হয়েছে। একটা আইভর-জনসনের গুলি, একটা ব্রাউনিংয়ের গুলি, একটা নিখোঁজ এর্কম্যান এয়ার পিস্তলের গুলি। সমস্যা হলো, একটা বুলেট আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। তিনটের মধ্যে মাত্র দুটো বুলেট পাওয়া গেছে। মি. সিম্পসন, দেয়াল খুঁড়ে আপনি যে বুলেটটা বের করেছেন, দিন তো সেটা।'

তেপয় থেকে চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া বুলেটটা তুলে শহীদের হাতে দিলেন মি. সিম্পসন। শহীদ বুলেটটার ওজন অনুভব করতে করতে বলল, 'আপনার ধারণা এটা ·৩৮ রিভলভারের বুলেট, আমারও তাই মনে হয়। ডাক্তার, আপনিও দেখুন!'

বুলেটটা নিয়ে দেখলেন ডাক্তার। বললেন, '·৩৮, কোন সন্দেহ নেই। এই ওজনের অনেক বুলেট বের করেছি আমি মানুষের শরীর থেকে।'

শহীদ বলল, 'ঠিক আছে। রফিক স্বীকার করেছে, ·৩৮ বুলেট ছোঁড়ে সে। গুলিটা দেয়ালে লাগে। তারপর কি ঘটে? তারপর মাত্র চার কি পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে কি কি ঘটনা ঘটে? ভাল কথা, ডাক্তার, আপনি বললেন এর্কম্যান এয়ার পিস্তলে শব্দ হয় না বললেই চলে। একেবারেই কি শব্দ হয় না?'

'হয়। এই ধরুন, আলো জ্বালাবার জন্যে ইলেকট্রিক সুইচ অন্ করলে যেমন খুট্ করে মৃদু শব্দ হয়, তেমনি।'

শহীদ বলল, 'তখন বৃষ্টি হচ্ছিল। রুমের ভিতর খুট্ করে শব্দ হলে রফিকের কানে সে শব্দ না ঢোকারই কথা। কিন্তু সমস্যা অন্যখানে। পাওয়া যাচ্ছে না ·৩২ ব্রাউনিং-এর বুলেট। কোথায় গেছে সেটা? কোথায় আছে এখন সেটা?'

কেউ শহীদের প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করল না।

শহীদ আপনমনেই বলে চলেছে, 'প্রথমে গুলি করল রফিক। ব্যর্থ হলো সে, তার গুলি গিয়ে বিঁধল দেয়ালে। তারপর দ্বিতীয় শব্দ হলো, যে-শব্দ মি. সিম্পসন পরিষ্কার শুনতে পেয়েছেন জানালার দিকে দৌড়ুবার সময়। এটা ব্রাউনিংয়ের গুলির শব্দ। এই বুলেটটা পাওয়া যাচ্ছে না। শেষবার কেউ এর্কম্যান এয়ার পিস্তল থেকে গুলি ছোঁড়ে, যে গুলিতে নিহত হন লোদী সাহেব। কিন্তু এদিকে এয়ার পিস্তলটা পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ খুনী যে পালাবে, তারও উপায় নেই। পালাবার একমাত্র পথ জানালাটা, সেখানে মি. সিম্পসন ছিলেন। দরজাটা তো বন্ধই ছিল।'

আবার চুপ করল শহীদ। তারপর সতেজ গলায় বলল, 'আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু বিশ্বাস না করলেও, ঘটনাটা ঘটেছে। আপনাদের কোন সাজেশন আছে?'

আড়চোখে কুয়াশার দিকে একবার তাকাল শহীদ। কুয়াশা আগের মতই নির্বিকার।

কামাল বলল, 'আমার শুধু একটা প্রশ্ন আছে। রফিক যে খুনী নয় এটা এখন নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত সত্য?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'প্রতিষ্ঠিত সত্য।'

শহীদ বলল, 'আগিও তাই মনে করি। তাকে খুনী বলে মনে করার কোন যুক্তি নেই আমাদের হাতে।'

পকেট থেকে ছোট একটা নোট বই বের করে মি. সিম্পসন লিখতে শুরু করলেন, সেই সাথে মুখে বলে চললেন, 'তিনটে প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে শহীদ। একটার সাথে আর একটার যোগ আছে, অবশ্যই। (১) একই লোক কি একম্যান এয়ার পিস্তল এবং ব্রাউনিং দিয়ে পরপর দুটো গুলি করেছে? এবং তা যদি না হয়, রুমের ভিতর কি রফিক ছাড়াও আরও দু'জন মানুষ ছিল? (২) ব্রাউনিং দিয়ে গুলি করা হয়—কিন্তু তার আগের মুহূর্তে, না, তার পরের মুহূর্তে এয়ার পিস্তল দিয়ে গুলি করা হয়? (৩) উভয় ক্ষেত্রেই প্রশ্ন হলো, প্রকৃত খুনী কোন্ জায়গায় দাঁড়িয়েছিল?'

মি. সিম্পসন মুখ তুলতে শহীদ বলল, 'সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন হলো তিন নম্বরটা। ডাক্তার সাহেবের রিপোর্ট অনুযায়ী লোদী সাহেবকে গুলি করা হয়েছে দশ ফুট দূর থেকে। তবু কেন রফিক খুনীকে দেখতে পেল না? রফিকের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সে দাঁড়িয়েছিল লোদী সাহেবের কাছ থেকে মাত্র পনেরো ফুট দূরে। মি. সিম্পসন, আমার বিশ্বাস, সুপরিকল্পিত একটা ধাঁধার মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছে আমাদেরকে। কেউ বুদ্ধি খাটিয়ে একটা গোলকধাঁধা তৈরি করেছে, আমরা তার মধ্যে ঘুরে মরছি।'

কামাল বলল, 'তুই কি বলতে চাইছিস আবার সেই পুরানো কথাটা? রফিক কাউকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে?'

'কিন্তু তাও তো সম্ভব না। রফিক যদি কাউকে বাঁচাবার চেষ্টাও করে, সেই মানুষটা বের হলো কোন্ পথ দিয়ে রুমের ভিতর থেকে? নিঃসন্দেহে আরও একজন মানুষ ছিল রুমের ভিতর, সম্ভবত আরও দু'জন ছিল। একজন, দু'জন বা পাঁচজন মানুষ লোদী সাহেবকে লক্ষ করে গুলি করল—তাদের মিছিলটা মাত্র তিন কি চার সেকেণ্ডের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল?'

ঘনঘন মাথা দোলাল শহীদ। সকৌতুকে তাকাল ডাক্তারের দিকে। তারপর বলল, 'ডাক্তার, তেমন কোন ওষুধ আছে নাকি? মানুষকে গায়েব করে দিতে পারে, এমন কোন ওষুধ?'

'নেই।'

শহীদ প্রশ্ন করল, 'মৃত্যু কি তৎক্ষণাৎ হয়েছিল?'

'প্রায়। হয়তো চার কি পাঁচ সেকেণ্ড বেঁচে ছিল গুলি খেয়ে।'

শহীদ সোফা ত্যাগ করল, 'সেক্ষেত্রে, আর আলোচনা করে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। বৈঠকখানায় বসে এ কেসের সমাধান হবে না। আমি অকুস্থলে যেতে চাই। কামাল গাড়ি বের কর।'

মি. সিম্পসনও সোফা ত্যাগ করলেন। তাকালেন দু'চোখ ভরা আশা নিয়ে, 'মি. এনাম আহমেদ, আপনিও চলুন না আমাদের সাথে।'

'আমি?' কুয়াশা মুখ তুলে বিস্মিতকণ্ঠে বলল।

'বাড়ির ভিতর বসে বসে তো হাঁপিয়ে উঠেছেন। শরীর যদি সুস্থ থাকে, চলুন না, একটু মৃদু বাতাস খেয়ে আসবেন। কেসটা কোন্ দিকে মোড় নেয়, তাও দেখার সুযোগ পাবেন।'

শহীদ বলল, 'যদি আপত্তি না থাকে, চলো। কেসটা খুবই ইন্টারেস্টিং, বুঝলে? রীতিমত নাকানি চোবানি খাওয়াতে শুরু করেছে।'

কুয়াশা মৃদু হাসল। বলল, 'আমার তা মনে হয় না।'

'মানে? কি মনে হয় না তোমার?' কামাল জানতে চাইল।

কুয়াশা বলল, 'খুব জটিল কেস, এটা বিশ্বাস করি না। সে যাক, যেতে না হয় চাইলাম, কিন্তু মহুয়াদি কি অনুমতি দেবেন? তিনি যে কড়া শাসনে রেখেছেন আমাকে।'

কামাল বলল, 'সে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। আমি জানতাম, তুমি যেতে চাইবে। তাই মহুয়াদিকে হাতে-পায়ে ধরে আগে থেকেই রাজি করিয়ে রেখেছি।'

কুয়াশা বলল, 'তবে আর আপত্তি কিসের। চলো, যাই।'

কুয়াশা ইনভ্যালিড চেয়ার ত্যাগ করে সিধে হয়ে উঠে দাঁড়াল।

মি. সিম্পসন অবাক হয়ে বললেন, 'আপনি দেখছি দিব্যি হাঁটতেও পারেন। সেরে উঠেছেন, তবু কেন বসে আছেন পঙ্গুর মত ইনভ্যালিড চেয়ারে?'

'মহুয়াদির নির্দেশ অমান্য করলে ঘাড়ে মুণ্ডু থাকবে?'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন মি. সিম্পসন।

শহীদ বলল, 'কামাল, ব্যারিস্টার খানের অ্যালিবাই সত্য কিনা পরীক্ষা করা দরকার। এই কাজের দায়িত্ব তুই নে। তোর কাছ থেকে রিপোর্ট পাবার পর ওদেরকে মুক্তি দেব। আধ ঘণ্টার মধ্যে পারবি না রিপোর্ট করতে?'

'আশা করি। কিন্তু ওদেরকে লাইব্রেরীর ভিতর আটকে রাখাটা কি উচিত হবে?'

শহীদ বলল, 'কেসটা জটিল একদিকে মোড় নিয়েছে, ওদেরকে ছেড়ে দিলে ওরা এমন সব কাণ্ড করে বেড়াবে যার ফলে জটিলতা আরও শতগুণ বাড়বে বৈ কমবে না। অকুস্থল এবং পরিবেশ পরীক্ষা করার সময় আমি ব্যারিস্টার সাহেবের উপস্থিতি চাই না।'

কামাল বলল, 'কিন্তু ব্যারিস্টার সাহেবের অ্যালিবাইটা মজবুত বলেই মনে হচ্ছে। তিনি লোদী সাহেবের একমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কেন খুন করবেন? তাঁর মোটিভ কি হতে পারে? আর মিস শাহানারার কথা যদি বলিস, তাকে সন্দেহের বাইরে রাখা চলে অনায়াসে। কারণ তার অ্যালিবাইটা এয়ারটাইট। স্বয়ং রফিক সমর্থন করেছে।'

শহীদ বলল, 'ওদেরকে কেন, আমি এখন কাউকেই খুনী বলে সন্দেহ করছি না। কিন্তু ভেবে দেখ, বাড়ির ভিতর রফিক ছাড়া বাইরের কোন লোক যদি ঢুকে না থাকে, খুন করল কে? নিশ্চয়ই বাড়ির কোন লোক? শাহানারা সন্দেহের উর্ধ্বে, মানি। ব্যারিস্টারের অ্যালিবাই যদি সত্য হয় তাহলে তিনিও সন্দেহের বাইরে

থাকছেন। বাকি থাকে কে?'

কুয়াশা আবার বসে পড়েছে তার চেয়ারে। বইয়ের পৃষ্ঠায় মগ্ন সে আবার। যেন এতটুকু আগ্রহ বা উৎসাহ নেই তার এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে।

মি. সিম্পসন গভীর মনোযোগের সাথে শহীদ এবং কামালের কথোপকথন শুনছেন। ডাক্তার ইদ্রিস বিদায় নিয়ে চলে গেলেন এইমাত্র।

কামাল বলল, 'বাকি থাকে বড় মেয়ে ইলোরা, বুড়ো কেরানী সিরু কাকা এবং বাড়ির চাকরবাকর।'

শহীদ বলল, 'এদের মধ্যেই কেউ প্রকৃত খুনী। চল্, রওনা হওয়া যাক।'

নিচে নামল ওরা দল বেঁধে। শহীদের ফোক্সওয়াগেনে চড়ল শহীদ একা। কামাল বেরিয়ে গেল তদন্তে তার মটরসাইকেল নিয়ে। মি. সিম্পসন কুয়াশার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন নিজের জীপের দিকে, 'মি. আহমেদ, আপনার মূল্যবান সঙ্গ দিয়ে আমাকে গৌরবান্বিত করুন।'

মি. সিম্পসনের সকৌতুক আবেদনের জবাবে কুয়াশা সহাস্যে বলল, 'মি. সিম্পসন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আমার মত একজন লে-ম্যানকে আপনি এই জটিল হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়াতে চাইছেন কেন?'

'আপনি লে-ম্যান? আপনি যদি লে-ম্যান হন, আমরা তাহলে কি? আমরা তাহলে নো-ম্যান। দেখুন, মি. আহমেদ, নিজেকে আপনি গোপন করে রাখার চেষ্টা করলে কি হবে, আপনার প্রকৃত পরিচয় আমি ভাল করেই জানি।'

কুয়াশা শান্তস্বরে জানতে চাইল, 'জানেন নাকি? বলুন, কি আমার প্রকৃত পরিচয়?'

মি. সিম্পসন জীপে স্টার্ট দিয়ে বললেন, 'আপনি লণ্ডনে ছিলেন দীর্ঘ তেরো বছর। ওখানে আপনি কবিতা লিখতেন ইংরেজীতে। চারটে বই বেরিয়েছে আপনার। রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন একটি। কেমিস্ট্রিতে আপনি পণ্ডিত, লণ্ডন ইউনিভার্সিটির হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট ছিলেন পাঁচ বছর। কানাডায় খামার আছে আপনার, বার্ষিক আয় পঞ্চাশ লাখ ডলার। আপনি এগারোটা ভাষা জানেন। আপনি···।'

আঁতকে ওঠার ভান করে কুয়াশা বলল, 'সর্বনাশ! এত খবর যোগাড় করলেন কোত্থেকে? নিশ্চয়ই শহীদের কাছ থেকে? কি জানেন, আমার বিষয়ে ও সব সময় একটু বাড়িয়ে বলে।'

'এতটুকু বাড়িয়ে বলেনি, ওকে আমি চিনি। মোট কথা, আপনি একটা প্রতিভা এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আপনি নিজেকে গোপন করে রাখতে চান, জানি না এর কি কারণ!'

কুয়াশা বলল, 'আত্মপ্রচার কি ভাল?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'ভাল নয়, স্বীকার করি। কিন্তু আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করি, যেখানে গুণের কদর নেই। তাই আত্মপ্রচার ছাড়া উপায় কি?'

কুয়াশা বলল, 'আমি একমত নই। প্রকৃত গুণী মানুষকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারে না। আত্মপ্রচার তারই দরকার যার কোন গুণ নেই।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'নীতিবোধ আপনার প্রবল, আপনার সাথে তর্ক করে পারব না। প্রায় এসে গেছি আমরা। আপনার সাথে পরে বিশদ আলোচনা করার ইচ্ছা রইল। ভাল কথা, মি. আহমেদ, এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আপনার মতামত কি?'

কুয়াশা বলল, 'মতামত দিতে পারি। কিন্তু পাল্টা প্রশ্ন করবেন না বা ব্যাখ্যা চাইবেন না—রাজি?'

মি. সিম্পসন কুয়াশার দিকে অবাক হয়ে তাকালেন। নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন তিনি—'হ্যাঁ, রাজি।'

'কেসটা আসলে তেমন জটিল নয়। খুনী কে তা আমি জানি না। তবে খুনীকে যে চেনে তাকে আমি চিনি।'

মি. সিম্পসন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কুয়াশার দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, কুয়াশা বলল, 'কোন প্রশ্ন নয়। আরে, অ্যাক্সিডেন্ট করবেন যে!'

কুয়াশার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে মি. সিম্পসন গাড়ি চালনায় মনোনিবেশ করতে চেষ্টা করলেন।

তাঁর ভিতরে উত্তেজনা টগবগ করে ফুটছে, কিন্তু সে উত্তেজনা বেরুবার পথ পাচ্ছে না।

দুই

বৃষ্টি থেমেছে। তবে আকাশ মেঘে ঢাকা।

জীপের পিছনে থামল শহীদের ক্রিমসন কালারের ঝকঝকে ফোক্সওয়াগেন। পুলিসের গাড়ি দেখে দারোয়ান রমজান মিয়া তাড়াহুড়ো করে গেট খুলে দিয়ে কপালে হাত ঠেকাল।

মি. সিম্পসন জীপ থেকে নেমেই প্রশ্ন করলেন, 'কেমন আছ, রমজান? নতুন কিছু ঘটেছে নাকি?'

'ভাল আছি, হুজুর। না, হুজুর। ইনিসপেক্টর হুজুর রেস্ট হাউজে কি যেন খোঁজাখোঁজি করছেন···হুজুর!' রমজান মিয়ার চোখেমুখে ভয়ের ভাব।

'কি ব্যাপার, রমজান?'

রমজান মিয়া বলল, 'হুজুর, ইনিসপেক্টর হুজুর আমার কথা বিশ্বাস করতেছেন না। তিনি বলতেছেন পাঁচিল টপকে গতকালকে কেউ বাড়ির ভিতর ঢুকেছিল।'

'তুমি কি বলো? ঢোকেনি কেউ?'

'ঢুকতে পারে না, হুজুর। আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে···হতে পারে না, হুজুর। পাঁচিল টপকাতে হলে, হুজুর, মই লাগবে। মই কেউ যদি আনেও, আশপাশের লোকজন তো কেউ কানা না, হুজুর···'

মি. সিম্পসনের পাশে এসে দাঁড়াল কুয়াশা। শহীদও পৌঁছুল।

'বাড়ির পিছন দিকের গেট?'

সাথে সাথে উত্তর এল, 'তালা মারা, হুজুর। ছোট বেগম সাহেবা গতকাল

পাঁচটার দিকে বাড়ি ফিরে হুকুম দেন, কেউ যেন বাড়ির ভিতর ঢুকতে না পারে, আর পিছনের গেটে তালা দিতে হবে। তালা দিয়ে আসি আমি। তালার চাবি একটা ছোটো বেগমসাহেবার কাছে, আর একটা আমার কাছে। দুটোই চাবি, হুজুর।'

'তোমার বড় বেগমসাহেবা এবং সিরু কাকা গতকাল ঘটনার সময় বাড়ি ছিল না। কখন এরা বেরোয়?'

'চারটে বাজতে পনেরো বিশ মিনিট আগে বড় বেগম সাহেবা। সোয়া চারটের সময় সিরু কাকা, হুজুর।'

শহীদ প্রশ্ন করল এবার, 'তোমার সাহেব রেস্ট হাউজে ক'টার সময় যান?'

'সাড়ে তিনটের সময়, হুজুর।'

'ছোট বেগম সাহেবা বেরোন কখন?'

'ওই রকম সময়েই, হুজুর।'

'সিরু কাকা বাড়ি থেকে বেরুবার প্রায় সাথে সাথে বৃষ্টি শুরু হয়, তাই না?'

রমজান মিয়া অবাক চোখে শহীদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'জ্বী, হুজুর। সিরু কাকা যাবার পাঁচ মিনিট পরই বৃষ্টি নামে। এর পঁচিশ ত্রিশ মিনিট পর ছোটো বেগমসাহেবা···।'

'গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফেরে তাই না?'

'জ্বী, হুজুর।'

গাড়িতে এসে উঠল আবার ওরা। গেট পেরিয়ে এগোল গাড়ি দুটো। প্রশস্ত রাস্তা। দু'পাশে বাগান। গাড়ি বারান্দায় গিয়ে থামল গাড়ি দুটো।

মূল বাড়িটা তিন তলা। সেকেলে ধরনের বাড়ি। চেহারাটা ভারিক্কি। ইদানীং হোয়াইটওয়াশ করা হয়েছে। শহীদ লক্ষ করল প্রত্যেকটি জানালায় কবাট ছাড়াও কাঠের শাটার রয়েছে।

কাঁধে গামছাওয়ালা একজন প্রৌঢ় চাকর পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ওদেরকে হলঘরে। হলঘরে ঢোকার আগেই শহীদ লোকটাকে জিজ্ঞেস করে তার নাম জেনে নিল। একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে কেরামত। গায়ের রঙ কয়লার মত। মুখের চেহারা দেখে মনে হয় চাপা স্বভাবের। লোকটার একটা বদভ্যাস হলো, আড়চোখে তাকায়। হলঘরে ঢোকার সময় ধরা পড়ে গেল সে। শহীদের সাথে চোখাচোখি হতেই অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল।

'বড় বেগমসাহেবাকে ডেকে দেব হুজুর? উনি আপনাদের কাছে যাবেন বলছিলেন···।' ওরা নরম সোফায় আসন গ্রহণ করতে হাত কচলাতে কচলাতে বলল কেরামত।

'আমি নামছি, কেরামত।'

সকলে মুখ তুলে তাকাল মেয়েলি একটি কণ্ঠস্বর শুনে। ঠাণ্ডা, সুরহীন সাদামাঠা কণ্ঠস্বর। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে কথাটা বলল। কাউকে বলে দিতে হলো না, লোদী সাহেবের বড় মেয়ে মিস ইলোরা ও। ধীরে ধীরে নেমে আসছে। কেরামত ডান কাঁধ থেকে গামছাটা বাঁ কাঁধে রাখতে রাখতে বেরিয়ে গেল হলঘর থেকে।

বোঝা যায় ইলোরা সুন্দরী ছিল, ভাবল শহীদ। সৌন্দর্য এখন আর অবশিষ্ট নেই। বয়সের চেয়ে বেশি বড় মনে হয় চেহারা দেখে। লাবণ্যহীন মুখ। রুজ লিপস্টিকের বহুল ব্যবহার মুখে। পরনে জর্জেটের নীল শাড়ি। পায়ে হালকা স্যাণ্ডেল। ছোট বোন শাহানারার চেয়ে একটু বেশিই লম্বা সে। দু'বোনের চেহারা দু'রকম, কারও সাথে কোন মিল নেই। ইলোরার হাতে বড়সড় একটা ভ্যানিটি ব্যাগ দেখা যাচ্ছে।

ইলোরা নিচে নেমে আসতে মি. সিম্পসন সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। শহীদ লক্ষ করল ইলোরা আর সকলকে বাদ দিয়ে বারবার কেবল একজনের দিকে তাকাচ্ছে। সেই একজন হলো কুয়াশা। ইলোরা কথা বলার সময়ও কুয়াশার দিকে তাকিয়ে রইল, 'আমাদের সৌভাগ্য, আপনাদের মত সম্মানীয় ব্যক্তিদের আগমন ঘটেছে এ-বাড়িতে। মি. সিম্পসন, আপনার কাছে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম আমি।'

'শুনেছি। কি কারণে যাচ্ছিলেন?'

ইলোরা উত্তর না দিয়ে হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলল। বলল, 'জিনিসটা আপনাকে দিয়ে দিই।' বলে, ভ্যানিটি ব্যাগের ভিতর থেকে রূপালী রঙের একটা পিস্তল বের করল সে। পিস্তলের ব্যারেলটা অস্বাভাবিক লম্বা।

'এটা একটা এর্কম্যান এয়ার পিস্তল।' ইলোরাই কথা বলল আবার।

শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'সে তো দেখতেই পাচ্ছি—কোথায় পেলেন আপনি ওটা?'

'আমার বেডরুমের ভিতর যে টেবিলটা আছে, সেটার নিচের দেরাজ থেকে।' শহীদের চোখে চোখ রেখে বলল ইলোরা।

তিন

মেয়েটি তার এই পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের জীবনের তুলনায় অনেক বেশি অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে এসেছে, যার ফলে আশ্চর্যজনক কোন ঘটনাই তাকে তেমন আলোড়িত করতে পারে না আর, ইলোরার শান্ত ভাবভঙ্গি এবং সহজভাবে কথা বলার কায়দা দেখে ভাবল শহীদ।

'রহস্যটা যে কি জানি না আমি। কে এটা আমার বেডরুমে রাখল, কি তার উদ্দেশ্য—একমাত্র সেই জানে। বাবা এটা দিয়ে খুন হননি। এটা আবিষ্কার করার পর প্রথমে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম, ভেবেছিলাম লুকিয়ে ফেলব, তা না হলে পুলিস আমাকে সন্দেহ করতে পারে। কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবনা চিন্তা করার পর ঠিক করলাম, এমনিতেই খুনের রহস্যটা জটিল, তার ওপর এটা লুকিয়ে ফেললে আরও জটিলতার সৃষ্টি হবে।'

শহীদকে দেখিয়ে মি. সিম্পসন বললেন, 'ওর পরিচয় তো দিয়েইছি। এই কেসের দায়িত্ব এখন ওর কাঁধে। আমরা ওকে অনুরোধ করেছি এই কেসের সমাধান বের করতে। শহীদ, তুমি মিস ইলোরাকে প্রশ্ন করতে পারো।'

শহীদ ছদ্মবেশধারী কুয়াশার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার বন্ধু এনাম আহমেদ আমাকে সাহায্য করছেন। আহমেদ, তুমি কি কোন প্রশ্ন করতে চাও?'

কুয়াশা সহাস্যে বলল, 'প্রয়োজন দেখি না। তুমি শুরু করো, দরকার মনে করলে আমিও দু'একটা প্রশ্ন করব।'

শহীদ ইলোরার দিকে তাকাল। দেখল, ইলোরা তাকিয়ে আছে পলকহীন চোখে কুয়াশার দিকে।

'মিস ইলোরা, আপনার কি ধারণা এয়ার পিস্তলটা কেউ শত্রুতা করে আপনার বেডরুমে রেখেছিল?'

'তা ছাড়া কি!'

শহীদ মি. সিম্পসনের হাত থেকে এয়ার পিস্তলটা নিয়ে পরীক্ষা করল। বলল, 'একটা গুলি ব্যবহার করা হয়েছে।'

ইলোরা বলল, 'হত্যাকাণ্ডের সাথে এই এয়ার পিস্তলের কোন সম্পর্ক নেই, তাই না? মি. সিম্পসন আমাকে গতকালই বলেছেন, দুটো আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে বাবাকে খুন করার জন্যে। একটা ব্রাউনিং, আর একটা আইভর-জনসন। এয়ার পিস্তলের কথা উনি বলেননি।'

শহীদ বলল, 'এ প্রসঙ্গটা আপাতত স্থগিত থাক। আচ্ছা, এর আগে এই এয়ার পিস্তলটা আর কোথাও দেখেছিলেন?'

'দেখেছি মানে? হাজারবার দেখেছি। এটা তো বাবার এয়ার পিস্তল।'

শহীদের চোখের পাতা এতটুকু কাঁপল না, 'তাই নাকি? আপনার বাবা কোথায় রাখতেন এটাকে?'

'রেস্টহাউজে। লাইব্রেরী রুমের ভিতর। রাইটিং টেবিলের দেরাজে।'

'শেষবার কবে দেখেছেন এটাকে?'

'গতকাল বিকেলে, ওই ড্রয়ারেই।'

কুয়াশা চুরুট ধরাল, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'আমার একটা প্রশ্ন আছে।'

ইলোরা মিষ্টি হেসে তাকাল কুয়াশার দিকে, 'বলুন, মি. আহমেদ।'

কুয়াশা ইলোরার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, 'বলতে পারেন, মিস ইলোরা, কেন এ বাড়ির লোকজন আপনার বাবাকে তেমন পছন্দ করতেন না? আমি লক্ষ করেছি, আপনি এবং আপনার ছোটবোন বেশ স্বাভাবিক আচরণ করছেন, সহজভাবে কথা বলছেন। বাবার মৃত্যু কি আপনাদেরকে দুঃখিত করেনি?'

মি. সিম্পসন কুয়াশার দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। কুয়াশার প্রশ্নটা শুনে মাথা দোলাতে লাগলেন তিনি, চোখেমুখে প্রশংসার ভাব ফুটে উঠল তাঁর।

ইলোরা আরও সুন্দর ভঙ্গিতে হাসল। আরও সহজ ভঙ্গিতে বলল, 'দুঃখ প্রকাশ করার ধরাবাঁধা কোন নিয়ম নেই, মি. আহমেদ। তাছাড়া আপনারা অপরিচিত, আউটসাইডার, আপনাদের সামনে ভাবাবেগ প্রকাশ করাটা কি অশোভন একটা ব্যাপার হবে না? এখানে আমি প্রসঙ্গত আরও একটা কথা উল্লেখ করতে চাই। বাবা ঠিক আমাদের আপন বাবা ছিলেন না। আমাকে বাবা যখন

বিয়ে করেন আমরা তখন ছোট ছিলাম। আমাদের আপন বাবা মারা যান শাহানারা জন্মাবার এক বছর পরই। এই তথ্য আপনাদেরকে জানাবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তবু সবই বলা দরকার মনে করে…'

কুয়াশা বলল, 'না জানালে ক্ষতি ছিল না। কারণ এ-তথ্য আমার আগেই জানা ছিল। আপনার বাবার সাথে অল্প-স্বল্প পরিচয় ছিল আমার। সে যাক। মিস ইলোরা, আপনাকে একটা কথা আমাদের এখন জানানো দরকার। সেটা হলো, আপনার বাবা আসলে এই এয়ার পিস্তলের গুলিতেই নিহত হয়েছেন।'

ইলোরা বলল, 'বলেন কি? তার মানে সত্যি সত্যি কেউ আমাকে বিপদে ফেলার জন্যে ওটা আমার বেডরুমে…'

ইলোরাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে কুয়াশা বলল, 'অন্তত, তাই মনে হচ্ছে। বাড়ির ভিতর বাইরের কোন লোক ঢুকতে পারে না, সুতরাং বাড়ির কোন লোকই আপনার শত্রু। কাউকে আপনি সন্দেহ করেন?'

'সন্দেহ করব? নাহ্, কাকে সন্দেহ করব? বাড়ির ভিতর কেউ আমার শত্রু নেই।'

'আপনার বাবার সাথে আপনার সম্পর্ক কি রকম ছিল বলবেন কি?'

'স্বভাবতই ভাল ছিল। বাপের সাথে মেয়ের যেমন থাকে।' ইলোরা একটু যেন অসহায় বোধ করল উত্তরটা দেবার সময়।

কুয়াশা পরবর্তী প্রশ্ন করল, 'আপনার বাবার সয়-সম্পত্তি টাকা পয়সার উত্তরাধিকারী আপনারা দু'বোনই তো?'

'হ্যাঁ। তাঁর যা কিছু আছে প্রায় সবই দিয়ে গেছেন আমাদেরকে। সিরু কাকা কিছু নগদ টাকা পাবেন। পুরানো চাকরবাকরও কিছু কিছু পাবে। বাকি সবই আমাদের দু'বোনের।'

কুয়াশা বলল, 'পিস্তলটা—এটা কি আপনার বাবা আত্মরক্ষার জন্যে সব সময় নিজের সাথে রাখতেন?'

'আত্মরক্ষার জন্যে—তা নয়। তা কেন রাখবেন। বাবার কোন শত্রু ছিল না। বাবা এটা রেখেছিলেন অ্যান্টিক হিসেবে অনেকটা।'

'শত্রু ছিল না বলছেন কেন? রফিক চৌধুরী আপনার বাবাকে খুন করবে বলে হুমকি দিয়েছিল।'

ইলোরা কিছু যেন ভাবল। তারপর বলল, 'কি জানেন, রফিক যে বাবাকে হুমকি দিয়েছিল কোর্টে, এ আমি গতকাল রাত্রে জেনেছি। শাহানারা না বললে আমার জানাই হত না। শোনার পর প্রথমে আমি বিশ্বাসই করিনি। তারপর বাবার সাথে রফিকের তিক্ত সম্পর্কের কথা মনে পড়ে যেতে, বিশ্বাস হয়।'

'আপনার বাবার সাথে রফিকের পরিচয় ছিল তাহলে?'

ইলোরা অবাক হয়ে বলল, 'ছিল বৈ কি। তবে কোথায়, কবে ওদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়, পরিচয় হয়—জানি না। বাবা মাঝেমধ্যে রফিকের নাম উচ্চারণ করে গালাগালি করতেন। বলতেন, ছেলেটা ইঁচড়ে পাকা এবং ডবল হারামি। এ থেকেই বুঝতাম, বাবা তাকে সহ্য করতে পারতেন না।'

'রফিক চৌধুরী সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?'

'ভাল। না, ভাল না। কি জানেন, ঠিক বোঝানো যাবে না ব্যাপারটা। ওকে আমার কেন জানি না, ভালই লাগে। খুব সরল ও। সম্ভবত একটু রগচটা, কিন্তু মনটা উদার। ওর কোন কোন স্বভাব একেবারেই পছন্দ নয় আমার। যেমন, সহ্যগুণ কম ওর। বড্ড ব্যস্ত, কারণেও অকারণেও।'

কখন থেকে যেন মি. সিম্পসন পকেট থেকে নোট বুক বের করে কুয়াশার প্রশ্ন এবং ইলোরার উত্তরগুলো শর্টহ্যাণ্ডে দ্রুত লিখে নিতে শুরু করেছেন।

শহীদ বসে বসে পাইপ টানছে চোখ কান সজাগ রেখে।

'গতকাল বিকেল থেকে সন্ধ্যার পর পর্যন্ত—কোথায় সময় কাটান, আপনি মিস ইলোরা?'

'অ্যালিবাই, না? বলছি। বিকেলের অধিকাংশ সময়ই আমি ব্যয় করি বাবার জন্যে একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি বাছাই করার জন্যে একদল মেয়ের ইন্টারভিউ নিয়ে। এতদিন সিরু কাকাই এই দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। কিন্তু সিরু কাকার বয়স হয়েছে, কাজে তিনি ভুল করছেন অহরহ, বাবা তাই একজন নতুন লোক চাইছিলেন। আমি ঠিক করি, পুরুষ নয়, মেয়ে সেক্রেটারি নিয়োগ করব। বাবাকে যে একটু আধটু সেবা যত্নও করতে পারবে। দরকার হলে তাকে আমরা বাড়িতে থাকার ব্যবস্থাও করে দিতে পারব।'

কুয়াশা বলল, 'কিন্তু এ কথা তো আপনি গতকাল মি. সিম্পসনকে বলেননি? বাড়ির ভিতর গতকাল বিকেলে একদল চাকুরিপ্রার্থী মহিলা ছিল তাহলে?'

ইলোরা বলল, 'কিন্তু এর সাথে হত্যাকাণ্ডের কোন সম্পর্ক নেই। বাবা খুন হবার দু'ঘণ্টা আগে তারা বিদায় নিয়ে চলে যায় সবাই। দারোয়ান রমজান এ ব্যাপারে আপনাদেরকে কনফার্ম করতে পারবে। ওরা চলে যাবার পর আমি বাবার কাছে যাই, রেস্টহাউজে।'

'রেস্টহাউজে যান কেন?'

একটু যেন অপ্রতিভ বোধ করল ইলোরা। খানিক ইতস্তত করার পর বলল, 'হাত খরচার জন্যে কিছু টাকার দরকার ছিল আমার, তাছাড়া বাবাকে জানাবার প্রয়োজনও ছিল যে নতুন এক মেয়েকে নির্বাচন করেছি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে।'

'গিয়ে কি দেখলেন?'

'বসেছিলেন ডেস্কের পিছনে। টাকা চাইতে তিনি নিচের দেরাজটা খুলে চেক-বইটা বের করলেন, তখনই আমি দেখতে পাই দেরাজের ভিতর এয়ার পিস্তলটা।'

'দেরাজে তালা মারা ছিল কি?' প্রশ্নগুলো একা কুয়াশাই করছে।

'ঠিক বলতে পারব না। লক্ষ করিনি। তবে তালা মারা থাকার কথা। কারণ, বাবা যে বইটা লিখছিলেন সেটার পাণ্ডুলিপি ওই ড্রয়ারেই রাখতেন। ওহ্—এবার মনে পড়েছে, হ্যাঁ, তালা খুলতে দেখেছি আমি বাবাকে! ভুলে গিয়েছিলাম।'

'পরে কি তালা লাগিয়েছিলেন?'

'তা আমি লক্ষ করিনি। তবে নিশ্চয়ই লাগিয়েছিলেন, আমার ধারণা।'

'আর উল্লেখযোগ্য কিছু আপনার চোখে পড়েনি?'

'না। বাবা কাজের সময় বিরক্ত হতে চান না। আমাকে দেখে ঠিক যে বিরক্ত হয়েছিলেন তা বলব না। ডিক্টাফোনে গড়গড় করে কথা বলছিলেন তিনি, এই সময় আমি যাই।'

'ডিক্টাফোনে নিশ্চয়ই বইয়ের কোন চ্যাপ্টার বলছিলেন?',

'হ্যাঁ। লিখতে কষ্ট হচ্ছিল ইদানীং, তাই তিনি ডিক্টাফোন ব্যবহার করছিলেন। সিরু কাকা লেখার কাজ করেন সাধারণত। আমাকে দেখে তিনি বিরক্তির ভাব প্রকাশ না করলেও বিশেষ কথা বলেননি। নতুন প্রাইভেট সেক্রেটারি কথা বলতে তিনি শুধু বললেন, গুড। তারপর মেয়েটির নাম-ধাম লিখে নিলেন। বললেন, আর একবার খোঁজ খবর নিয়ে দেখতে হবে মেয়েটি কেমন।'

'কবে থেকে তার জয়েন করার কথা?'

'আগামী মাস থেকে।'

'ঠিক আছে, বলে যান।'

ইলোরা বলল, 'বাবা বললেন, ব্যারিস্টার আসবেন চা খেতে, রমজান যেন তাঁকে সোজা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেয়। বাবাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, যদিও জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন ছিল না, চা বাড়ি থেকে পাঠাতে বলে যাব কিনা?'

'জিজ্ঞেস করবার প্রয়োজন ছিল না কেন?'

ইলোরা বলল, 'রেস্টহাউজে বাবা যখন থাকতেন কেউ বিরক্ত করুক তা তিনি একেবারেই চাইতেন না। রেস্টহাউজের অপর কামরাটায়, হলরুমের পুব দিকে ইলেকট্রিক হিটার, কেটলি, কাপ পিরিচ—সব ব্যবস্থা আছে। দরকার হলে তিনি নিজেই চা তৈরি করে নিতেন। আমি জিজ্ঞেস করতে বললেন, দরকার নেই। ব্যারিস্টার এলে আমিই তৈরি করে নেব। এরপর আমি বাবাকে বলি, ইলেকট্রিক ফায়ারের মেশিনটা অন্ করে দিয়ে যাই, যা শীত পড়েছে।'

'অন্ করেছিলেন?'

'করেছিলাম।'

কুয়াশা তাকাল মি. সিম্পসনের দিকে, 'অন্ ছিল? আপনারা যখন সার্চ করেন?'

'ছিল।'

কুয়াশা মি. সিম্পসনের উদ্দেশে বলল, 'ধন্যবাদ।' তারপর তাকাল ইলোরার দিকে, 'আপনি বলে যান।'

'রেস্টহাউজ থেকে বেরিয়ে আসি আমি এরপর, সোজা গেট দিয়ে বেরিয়ে যাই বাড়ির বাইরে। তখন পৌনে চারটে বাজে।'

কুয়াশা বলল, 'ঠিক, এবং তারপর?'

ইলোরা হঠাৎ কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। কিছু বলতে গিয়েও বলল না। মুখটা কেমন যেন কঠিন হয়ে উঠল মুহূর্তের জন্যে। তারপর মাথা নিচু করে কিছু ভাবল।

মুখ তুলে কুয়াশার দিকে তাকিয়ে রইল দীর্ঘ দশ সেকেণ্ড, তারপর নিস্তব্ধতা

ভাঙল, 'দুঃখিত, মি. আহমেদ। এরপরের ঘটনা আমি বলতে পারছি না। আর কিছু বলবার নেই আমার।'

'বাড়ি ছেড়ে বেরোবার পর কোথায় গিয়েছিলেন, কি করেছিলেন—বলতে চান না? কেন?'

'ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাই।'

কুয়াশা বলল, 'কিন্তু দারোয়ান ইতিমধ্যেই আমাদেরকে জানিয়েছে আপনি ঢাকা ক্লাবে গিয়েছিলেন...'

'কী! রমজান বলেছে? বড় বেশি বাচাল হয়ে গেছে দেখছি ও! কিন্তু...লাভ নেই ঢাকা ক্লাবে খোঁজ নিয়ে, মি. আহমেদ। আমি সেখানে যাইনি। যাবার কথা ছিল কিন্তু বাড়ি থেকে বের হবার ঘন্টা আড়াই-তিন আগে আমি একটা ফোন পাই, প্রোগ্রামটা তাই বাতিল করে দিই কিন্তু এসব আমার নিজস্ব ব্যাপার। আপনাদের না জানলেও চলবে।'

'চলবে না। কারণ, আমরা একটা হত্যাকাণ্ডের কিনারা করতে এসেছি এখানে। সব কথা জানতে হবে আমাদের।'

'বলব না, তার কারণ, আপনারা কথাটা বিশ্বাসই করবেন না। তা ছাড়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেখানে গিয়েছিলাম সেখানে আমি সত্যি গিয়েছিলাম কি না তা প্রমাণও করতে পারব না আমি। অ্যালিবাই হিসেবে আমার বক্তব্য টিকবে না।'

'মিস ইলোরা, এতে করে আপনি আমাদের সন্দেহের চোখে পড়ছেন, বুঝতে পারছেন তো!'

'পারছি। কিন্তু আমি...নিরুপায়।'

এমন সময় বৃদ্ধ এক লোক ধীরস্থির পদক্ষেপে হলঘরে ঢুকল। সকলে তাকাল তার দিকে। বৃদ্ধ, প্রায় অক্ষম, বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে।

'সিরু কাকা, আসুন। এঁরা বাবার হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে এসেছেন। মি. সিম্পসন, আমাকে কিছুক্ষণের জন্য ক্ষমা করতে হবে, মাথাটা বড্ড ধরেছে।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি বিশ্রাম নিতে যান। দরকার হলে ডেকে পাঠাব আবার।'

চলে গেল ইলোরা দোতলায় ওঠার সিঁড়ি দিয়ে।

বৃদ্ধ সিরু কাকা একে একে সকলকে দেখল। বসল একটা চেয়ারে। ক্লান্ত বৃদ্ধ একটু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আমি বোধহয় স্যারদেরকে বিরক্ত করলাম। কিন্তু বারান্দা দিয়ে যাবার সময় দেখলাম কেরামত দরজায় কান লাগিয়ে আপনাদের কথাবার্তা চুরি করে শোনার চেষ্টা করছে। দেখুন দেখি, কি বাজে স্বভাব। ভাল কথা, সাহেবের খুনী কে? নিশ্চয়ই ওই ছোকরা?'

শহীদ বলল, 'ওই ছোকরা মানে?'

'ওই ছোকরা ছাড়া সাহেবকে আর কে খুন করবে?'

শহীদ বলল, 'আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না? আপনি কি রফিক চৌধুরীর কথা বলছেন?'

'ওর নাম ওটা নয়। অবশ্য ওই নামেই বদমাশটা পরিচয় দেয় নিজের। কিন্তু

ওর নাম জাহাঙ্গীর তরফদার, সাহেবের এককালের বন্ধু বারী তরফদারের একমাত্র ছেলে। ওই ছোকরা—গুড ফর নাথিং! অকর্মার ধাড়ী। সাহেব নীতিবান মানুষ ছিলেন, শাস্তি দিয়ে নীতির জয়ই ঘোষণা করেন তিনি!'

এতগুলো কথা উত্তেজনার সাথে বলে ঘনঘন হাঁপাতে থাকে সিরু কাকা।

শহীদ বলল, 'রফিক ওরফে জাহাঙ্গীর সম্পর্কে আর কি জানেন, সিরাজ সাহেব?'

'জানিনাটা কি বলুন? শয়তানটা বেশ ভাল ছিল। চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে পড়ত। ছাত্র সংস্থার অ্যাকটিভ লীডার ছিল, ব্রড জাম্পে রেকর্ড করেছিল পর পর দু'বার ভার্সিটির বার্ষিক স্পোর্টসে। ভাল জুডো জানে। শূটিং প্রতিযোগিতায় পদক পেয়েছে একবার। কিন্তু বাবা মারা যাবার পর ঢাকায় এসে ছোকরা একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। মাথার ওপর গার্জেন নেই, কাউকে জবাবদিহি করতে হয় না—ভাল থাকে কি করে? বাবার টাকা দু'দিনে উড়িয়ে দিয়ে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে লাগল···।'

শহীদ বলল, 'এক মিনিট। আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার জানে তাহলে রফিক।'

'জানে মানে? সে রাইফেল শূটিংয়ে মেডেল পেয়েছিল, স্যার। রিভলভারেও থার্ড হয়েছিল।'

'কিন্তু সে যে আজ আমাকে বলল, 'জানে না?'

সিরু কাকা তাচ্ছিল্যভরে বলল, 'বলবেই তো! এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, ছোকরা এক নম্বরের মিথ্যেবাদী।'

শহীদ এয়ার পিস্তলটা তুলে ধরল উপর দিকে, 'এটা কার বলতে পারেন?'

'সাহেবের, স্যার।'

শহীদ জানতে চাইল, 'শেষবার কখন দেখেছেন মনে পড়ে?'

'কয়েকদিন আগেও তো দেখেছি। তবে ঠিক কবে দেখেছি বলতে পারব না। সাহেব ওটা রাখতেন ডেস্কের নিচের ড্রয়ারে।'

'গতকাল বিকেলে রেস্টহাউজে গিয়েছিলেন আপনি?'

সিরু কাকা বলল, 'গিয়েছিলাম। অল্প একটু সময়ের জন্যে। গত পরশুদিন একটা লাইব্রেরী থেকে ক'খানা রেফারেন্সের বই আনতে বলেছিলেন, গতকাল যাবার সময় আর কোন বই আনতে হবে কিনা জানার জন্যে গিয়েছিলাম। পাঁচ মিনিটের বেশি ছিলাম না সাহেবের কাছে। চারটের খানিক পর আমি বাড়ি থেকে বের হই, তার একটু পরই বৃষ্টি নামে।'

'রেস্টহাউজে গিয়ে কি দেখেন আপনি?'

'সাহেব কথা বলছিলেন, ডিক্টাফোনে। একটা কথা···।' কথাটা শেষ করল না বৃদ্ধ।

'বলুন।'

ইতস্তত করল খানিক সিরু কাকা, তারপর বলল, 'তখন যদি জানতাম সাহেব খুন হতে যাচ্ছেন, তাহলে···।' আবার চুপ করে গেল বৃদ্ধ।

শহীদ বলল, 'যা বলতে চান বলে ফেলুন। মনে রাখবেন, আমরা আপনার

সাহেবের হত্যাকারীকে চিহ্নিত করতে এসেছি। আপনি গত বিশ বছর ধরে লোদী সাহেবের কাজ করছেন, আপনি নিশ্চয়ই চান খুনী ধরা পড়ুক?'

'বলছি। জানালার বাইরে পায়ের আওয়াজ পেয়েছিলাম আমি।'

'কোন্ জানালার বাইরে?'

'পশ্চিম দিকের। কিন্তু জোরে বাতাস বইছিল বলে মনে করেছিলাম, অন্য কোন শব্দ। কিন্তু এখন যেন মনে হচ্ছে, আওয়াজটা কোন মানুষেরই ছিল।'

'আপনি একাই শুনেছিলেন?'

'না। সাহেবও শুনেছিলেন। সাহেবকে বরং আমি বলি, ওটা পায়ের শব্দ নয়, বাতাসের শব্দ। কিন্তু একমুহূর্ত পর দক্ষিণ দিকের একটা জানালার বাইরের শাটারে কেউ যেন ধাক্কা মারে। এই শব্দ বেশ জোরে হয়। এবার আমি নই, সাহেবই আমাকে বলেন, গাছের ডাল ভেঙে পড়েছে শাটারের গায়ে। কিন্তু কথাটা যেন তিনি নিজেই বিশ্বাস করেননি! কারণ তখুনি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন তিনি। পর্দা সরিয়ে কবাট খুললেন, শাটার খুললেন, তারপর উঁকি মেরে বাইরে তাকালেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পাননি।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'এই জানালাটা দিয়েই আমি রুমে ঢুকেছিলাম।'

শহীদ সিরু কাকাকে প্রশ্ন করল, 'তারপর আপনি কি করলেন?'

'বিদায় নিয়ে চলে গেলাম। বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীতে। ওখান থেকে বাড়ি ফিরি পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে, এসে শুনি সাহেব খুন হয়েছেন।'

শহীদ বলল, 'সিরাজ সাহেব, আমরা এখন পর্যন্ত যা জানতে পেরেছি তাতে একথা বলা চলে যে রফিক চৌধুরী ওরফে জাহাঙ্গীর তরফদার লোদী সাহেবকে খুন করেনি। আর একটা কথা, এই এয়ার পিস্তলের গুলিতেই খুন হয়েছেন তিনি। লোদী সাহেব খুন হবার পাঁচ কি সাত সেকেণ্ড পর মি. সিম্পসন লাইব্রেরীতে ঢোকেন। লাইব্রেরী রুমটা তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়, কিন্তু সেখানে পাওয়া যায়নি এয়ার পিস্তলটা। যদি পাওয়া যেত, তাহলে সন্দেহ করা যেত রফিকই তিনটে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে তিনবার গুলি করেছে। তর্কের খাতিরে বলা যেতে পারে, রফিক দুটো আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে গুলি করেছে। কিন্তু যে দুটো আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে গুলি করেছে সে দুটোর একটি বুলেটও লোদী সাহেবের মৃত্যুর জন্যে দায়ী নয়। সুতরাং, রফিক খুনী নয়। অপরদিকে, এয়ার পিস্তলটা পাওয়া গেছে আজ সকালে, এ-বাড়িতে। তার মানে, খুনী এ বাড়িতেই আছে।'

বৃদ্ধ সিরু কাকা মাথায় হাত দিয়ে কাঁপতে লাগলেন, 'এসব আমি কি শুনছি, স্যার! এত জটিল হয়ে গেল! কিন্তু স্যার···আমার এখনও বিশ্বাস, ওই ছোকরাই ধোঁকা দেবার জন্যে এতসব চাল চেলেছে। ছোকরাকে আমি এতটুকু বিশ্বাস করি না। ও সব পারে।'

'সব পারে মানে? নিশ্চয়ই তার অলৌকিক ক্ষমতা নেই?'

সিরু কাকা বলল, 'তাও পারে। ও ছোকরা দিনকে রাত বানিয়ে ফেলতে পারে। ভেবে দেখুন, দারোয়ান থাকা সত্ত্বেও, বাড়িতে ঢুকল কি ভাবে সে? পাঁচিল টপকানো তো এককথায় অসম্ভব।'

শহীদ বলল, 'এর উত্তর আমরা পেয়েছি। রফিক মিস শাহানারার গাড়ির পিছনের বনেট তুলে ভিতরে লুকিয়ে ছিল। গ্যারেজে গাড়ি ঢোকার পর সে বেরোয়।'

হলঘরের দরজার কাছ থেকে ভেসে এল খুক্ খুক্ কাশির শব্দ। কাশিটা দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যেই কাশা হয়েছে, সুতরাং সকলে দরজার দিকে তাকাল।

প্রৌঢ় কেরামত, বাড়ির চাকর কাম বাটলার পায়ে পায়ে ভিতরে ঢুকল। আড়চোখে দেখে নিল সকলকে একবার করে। সকলের কাছ থেকে পাঁচ সাত হাত দূরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। হাত কচলাচ্ছে। কিছু বলতে চায়। কিন্তু কেউ জিজ্ঞেস না করলে মুখ খুলতে ভরসা পাচ্ছে না যেন।

'কি?' শহীদ নিস্তব্ধতা ভাঙল।

কেরামত মিয়া চোখ তুলে তাকাল, 'একটা কথা বলব, হুজুর।'

'দাঁড়িয়ে আছ কেন চুপ করে, বলো?'

কেরামত ঘন ঘন ঢোক গিলল, 'হুজুর, আপনাদের কথা শুনছিলাম, মাফ করে দেবেন। আমি যে কথাটা বলতে এসেছি...'

'থামলে কেন, বলো?'

'যার কথা আপনারা আলোচনা করছেন এই রফিক সাহেব, মিথ্যে কথা বলেছেন, হুজুর। তিনি ছোট বেগমসাহেবার গাড়ির পিছনে চড়ে বাড়ির ভিতর ঢুকেছেন, এটা মিথ্যে কথা।'

সিরু কাকা প্রায় বিরক্তির সাথে বলল, 'কেরামত, তুই আবার এমন গুছিয়ে কথা বলতে শিখলি কোথা থেকে?'

'কথা বলি না, সিরু কাকা, কিন্তু তার মানে এই নয় যে বলতে পারি না। আমার ওপর আপনি সব সময় খেপে থাকেন। কি কারণ, সিরু কাকা?'

'হারামজাদার কথা শোনো! তুই যে আড়ি পেতে সকলের কথা শুনিস, এর জন্যে তো তোকে এ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে হাজারবার, আমিই তো প্রত্যেকবার তাতে বাধা দিয়ে তোর উপকার করেছি।'

শহীদ প্রশ্ন করল, 'কত দিন কাজ করছ এ বাড়িতে তুমি, কেরামত?'

'এগারো বছর, হুজুর।'

শহীদ বলল, 'ঝগড়া থাক। যা বলছিলে, রফিক যে গাড়ির পিছনে চড়ে এ-বাড়িতে ঢোকেনি, তা প্রমাণ করতে পারবে?'

চার

কেরামত আড়চোখে তাকাল সিরু কাকার দিকে, 'পারব, হুজুর। তাহলে বলি। ছোট বেগমসাহেবার গাড়িতে ছাতা ছিল না, জানতাম হুজুর, তাই গাড়ি নিয়ে তিনি যখন ফিরে এলেন, আমি ছাতা নিয়ে ছুটে যাই গ্যারেজে। গেটে গাড়ির আলো দেখেই আমি ছাতা নিয়ে ছুটি। গ্যারেজে যখন পৌঁছাই, তিনি তখনও গাড়ি থেকে নামেননি। গাড়ির পিছনের সীট এবং পিছনের ঢাকনি খুলেই ভিতরটা আমি দেখি

বেগমসাহেবা কিছু কিনেটিনে এনেছেন কিনা। কিছু আনেননি। কিন্তু, হুজুর, কোন মানুষকেও আমি দেখিনি।'

'গাড়ির পিছনের ঢাকনি তুলেও দেখেছিলে?'

কেরামত বলল, 'ধমক খেয়ে ওটা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, হুজুর।'

'কি রকম?'

কেরামত বলল, 'ছোট বেগমসাহেবা কিছু কিনে আনলে গাড়িতেই তা রেখে আসেন। আগে আমি খুঁজে দেখতাম না। একবার তো পাঁচসের খাসীর মাংস গাড়ির ওই পিছনের ঘরটায় পাঁচদিন ছিল, পচে একেবারে…'

'হুঁ। বুঝেছি। আর কিছু বলবার আছে তোমার?'

কেরামত মিয়া হাত কচলাতে কচলাতে বলল, 'জ্বী, হুজুর।'

শহীদ বলল, 'বলো তা হলে।'

কেরামত বলল, 'হুজুর, সাহেব খুন হয়েছেন ঠিক ক'টার সময়?'

'সাড়ে পাঁচটার সময়। কেন?'

কেরামত মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, 'হুজুর, আমরা চাকরবাকররা যে কেউ দায়ী নই সেই কথাই আমি এখন আপনাদেরকে বুঝিয়ে বলতে চাই। আমি, বাবুর্চী আর চাকরানী হ্যাঁদার মা—এই আমরা তিনজন, আরও একজন হলো দারোয়ান রমজান। রমজানের কথা বাদ দিই, সে তো সব সময় গেটেই ছিল। আমরা এই তিনজন যে সাহেব খুন হবার সময় রেস্টহাউজের কাছাকাছি ছিলাম না, এই কথাটা আপনাদেরকে জানাতে চাই হুজুর।'

'তখন কোথায় ছিলে তোমরা সবাই?'

কেরামত বলল, 'আমরা তিনজন হুজুর একসাথে ছিলাম, রান্নাঘরে। ছয়টার আগে আমরা কেউ সেখান থেকে একবারের জন্যেও বের হইনি। আমরা হুজুর চাকরবাকর মানুষ, আমাদের হয়ে কেউ তো বলবে না। তাই নিজেদের সাফাই আমাকেই গাইতে হলো, হুজুর।'

শহীদ বলল, 'রফিক আমাদেরকে বলেছে, সে প্রথমে মনে করেছিল লোদী সাহেব বাড়ির মূল অংশে কোথাও আছেন। একটা খোলা জানালা গলে সে ভিতরেও ঢুকেছিল। সেই সময় নাকি ড্রয়িংরুমে বসেছিল তোমাদের ছোট বেগমসাহেবা, তাকে নাকি তুমি চা-এর কথা জিজ্ঞেস করো?'

'জ্বী, হুজুর, জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি। আর একটা কথা, হুজুর…' কিন্তু অভ্যাস অনুযায়ী কেরামত হাত কচলাতে শুরু করল আবার, কথাটা শেষ করল না। তার মুখ বা নাকের সামনে মাছি বা পোকা কিছুই নেই, তবু সে হাত ঝাপটা দিচ্ছে মাছি বা পোকা তাড়াবার মত করে।

'কিছু বলবে আরও?'

কেরামত মিয়া আড়চোখে তাকাল সকলের দিকে। তারপর মুখ তুলে দেখে নিল সিঁড়ির মাথাটা। কেউ নেই সেখানে। বলল, 'হুজুর, আমি জানি বড় বেগমসাহেবা গতকাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন।'

'জানো? কিভাবে জানলে?'

কেরামত বলল, 'বলছি, হুজুর। চাকরবাকর মানুষ, হুজুর, কি বলতে কি বলে ফেলব। তবু বলব কথাটা, কেননা এ বাড়ির নেমক খাচ্ছি আজ এগারো বছর, এ বাড়ির কারোর বিপদ হলে চুপ করে থাকি কি করে! হুজুর, চাকরানী হ্যাঁদার মা কথাটা আমাকে বলেছে।'

'কি কথা?'

কেরামত বড্ড বেশি ভণিতা করে। শহীদ একটু বিরক্ত হলো লোকটার প্রতি।

'হুজুর, হ্যাঁদার মার এক দেওরের মেয়ে ম্যাট্রিক পাস করেছে। হ্যাঁদার মা চাইছিল তাকে সাহেবের সেকরেটারির কাজটা পাইয়ে দিতে। বড় বেগমসাহেবাকে বহু অনুরোধও করেছিল সে, কিন্তু তিনি রাজি হননি। হ্যাঁদার মা চাকরানী, তার কোন আত্মীয় এ বাড়িতে লেখাপড়ার কাজ করার জন্যে আসবে, বড় বেগমসাহেবা তা ভাল বলে মনে করেননি। কিন্তু, তবু, হ্যাঁদার মা আজ তার সেই দেওরের মেয়েকে ফোন করতে বলে। তাই, গতকাল যতবার ফোন এসেছে, হ্যাঁদার মা নিচের ড্রয়িংরুমে গিয়ে রিসিভার তুলে কথাবার্তা শুনেছে। তার দেওরের মেয়ে গতকাল ফোন করেনি। কিন্তু লাভ হয়েছে এই যে, বড় বেগমসাহেবাকে যে লোকটা ফোন করে হুমকি দিয়েছিল...'

'ফোন করে হুমকি দিয়েছিল? কে সে!'

কেরামত বলল, 'লোকটা নিজের নাম বলেনি হুজুর। তবে যা বলেছিল, হ্যাঁদার মা মনে রেখেছে সব। একটা পুরুষ লোক বড় বেগমসাহেবাকে, বলে—"আমিন খসরুকে যদি চটাতে না চান বত্রিশ নম্বর এলাহী রোডে গিয়ে আপনার নামে লেখা চিঠিটা নিয়ে আসবেন। যদি না যান, নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারবেন আপনি।"—এই কথাগুলি বলে ফোন ছেড়ে দেয় লোকটা, হুজুর।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়লেন মি. সিম্পসন, 'আমিন খসরু, অ্যাঁ? শুনলে, শহীদ?'

গম্ভীর হয়ে উঠল শহীদের মুখের চেহারা। বলল, 'হুঁ।'

আমিন খসরু কুখ্যাত একজন অপরাধী। গা ঢাকা দিয়ে আছে সে আজ মাস তিনেক ধরে পুলিসের ভয়ে। তার পেশা হলো, যুবতী মেয়েদেরকে সুযোগ পেলেই ব্ল্যাকমেইল করা। গত মাস ছয়েক ধরে তার অপরাধের নানা কাহিনী ঢাকার সংবাদপত্রে প্রায় রোজই থাকে। পুলিস শত চেষ্টা করেও লোকটাকে গ্রেফতার করতে সমর্থ হচ্ছে না। বছর খানেক আগে একবার গ্রেফতার হয়েছিল সে, কিন্তু ব্যারিস্টার সুফী সরফরাজ খান ছিলেন তার পক্ষ সমর্থক আইনজীবী, সেবার বেকসুর খালাস পায় আমিন খসরু। কিন্তু এখন পুলিসের হাতে অনেক শক্ত প্রমাণ মওজুদ, গ্রেফতার হলে শাস্তি এড়াবার তার কোন উপায় নেই।'

শহীদ বুঝতে পারল, ইলোরা কেন গতকাল বিকেলে তার মুভমেন্ট সম্পর্কে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে চায়নি। আমিন খসরু ব্ল্যাকমেইল করছে—এটা গর্বের কথা নয়! একথা প্রকাশ পেলে প্রকাশ পাবে ব্ল্যাকমেইলিংয়ের কারণও। কারণটা নিশ্চয়ই ইলোরার পদস্খলন সংক্রান্ত অর্থাৎ তার চারিত্রিক দুর্বলতার কোন গোপনীয় ঘটনা।

কেউ কিছু বলবার আগেই সিঁড়ির মাথায় দেখা গেল ইলোরাকে। প্রায় ঝড়ের

মত নেমে এল সে নিচে।

'কেরামত, বেরোও এখান থেকে। তোমাকে আমি পরে মজা বোঝাব।' রুদ্ধশ্বাসে বলল ইলোরা।

অনেকক্ষণ পর কথা বলল কুয়াশা। শান্ত কিন্তু অস্বাভাবিক দৃঢ় তার কণ্ঠস্বর, 'না, কেরামত। তুমি এখানেই থাকো।'

ইলোরা বলে উঠল, 'আপনি!'

কুয়াশা বলল, 'আমরা আইনের লোক, মিস ইলোরা। আমাদের দাবি আগে। আপনি ওর প্রতি চটছেন, এটা আমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকছে। প্রকৃতপক্ষে, ও আপনার উপকার করারই চেষ্টা করেছে।'

ইলোরা বলল, 'কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাবার অধিকার আমি চাকরবাকরদের দিতে পারি না। আপনারাও আইনের লোক হোন বা না হোন, দয়া করে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন না।'

'বর্তমান পরিস্থিতিতে এ-বাড়ির সকলের ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাথা ঘামাব আমরা। মিস ইলোরা, আপনার সমস্যাটা আমরা হৃদয়ঙ্গম করি। কিন্তু একটা ব্যাপার বোঝাবার চেষ্টা করুন, গতকাল আপনার বাবা খুন হবার সময় আপনারা কে কোথায় ছিলেন, এ আমাদেরকে জানতেই হবে। এখন বলুন, বত্রিশ নম্বর এলাহী রোডে আপনি গিয়েছিলেন কিনা। গিয়ে থাকলে, কতক্ষণ ওখানে ছিলেন। ওখান থেকে কোথায় যান তারপর।'

ইলোরা মাথা নিচু করে ভাবতে লাগল।

কুয়াশা বলল, 'বোঝাই যাচ্ছে, অনেক নিরীহ মেয়ের মত আপনিও শয়তান আমিন খসরুর ব্ল্যাকমেইলিংয়ের শিকার হয়ে পড়েছেন। তবে আপনি যদি না চান, ব্ল্যাকমেইলিংয়ের ব্যাপারে আমরা আপনাকে কোন প্রশ্ন করব না।'

'কথা দিচ্ছেন এ ব্যাপারে খোঁজ খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা করবেন না? দেখুন, ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়লে আমার মানসম্মান থাকবে না। আমাকে হয়তো··· হয়তো আত্মহত্যাই করতে হবে।'

ইলোরা, যাকে মনে হয়েছিল শক্ত ধাতু দিয়ে তৈরি কঠিন প্রকৃতির মেয়ে, ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

কুয়াশা বলল, 'কথা দিচ্ছি।'

শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছে দ্রুত নিজেকে সামলে নিল ইলোরা। নিচু গলায় ধীরে ধীরে সে বলল, 'দেখুন, গতকাল যে লোকটা ফোন করেছিল তাকে আমি চিনি না। আমিন খসরুর নাম করে সে আমাকে ভয় দেখিয়েছিল মাত্র। এর আগে আমিন খসরুর সাথে···থাক সে-কথা। বাড়ি থেকে সোজা লোকটার দেয়া ঠিকানায় আমি যাই। এলাহী রোডে বত্রিশ নম্বরই নেই। উনত্রিশেই শেষ হয়ে গেছে। ওই রোডে একটি মাত্র স্টেশনারি দোকান আছে, এক অ্যাংলো বুড়ী সেটা চালায়। বত্রিশ নম্বর খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত বিরক্ত হয়ে যাই আমি। রোডটার এ মাথা থেকে সে মাথা পর্যন্ত অমন দশ বারো বার হাঁটাহাঁটি করি। কিন্তু বত্রিশ নম্বর পাইনি। এখন বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই, ঘটনাটা আমার পক্ষে প্রমাণ করা সম্ভব নয় কেন? একটা রাস্তায়

ঘণ্টা দেড়েক ঘোরাফেরা করেছি, কার খেয়েদেয়ে কাজ নেই আমাকে চিনে রাখবে?'

কুয়াশা বলল, 'হুঁ। ঠিক আছে, আপনি যেতে পারেন।'

ইলোরা যেন যাবার জন্যে তৈরি হয়েই ছিল, অনুমতি পেতেই সে ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল।

ইলোরা চলে যেতে কুয়াশা কেরামতের দিকে তাকাল, 'রফিক চৌধুরীকে আগে কখনও দেখেছ এ বাড়িতে?'

'না, হুজুর। কখনও আসেননি।'

কুয়াশা বলল, 'ঠিক আছে, তুমিও যাও।'

এমন সময় হলঘরের দরজায় উদয় হল ইউনিফর্ম পরা ইন্সপেক্টর শুকুর চৌধুরী। বলল, 'স্যার, আমি কিছু ক্লু পেয়েছি। যার ফলে কেসটা সম্পূর্ণ অন্য দিকে মোড় নিতে যাচ্ছে। নতুন দৃষ্টিতে দেখতে হবে, স্যার, এখন...'

পাঁচ

শহীদই প্রশ্ন করল, 'আপনি আবিষ্কৃত ক্লুগুলো কি বলুন।'

কপালে হাত ঠেকিয়ে সম্মান দেখাল ইন্সপেক্টর, এগিয়ে এসে দাঁড়াল আরও সামনে, 'পায়ের কিছু ছাপ পাওয়া গেছে। অত্যন্ত পরিষ্কার ছাপ। কিন্তু আসল ব্যাপার এ নয়। আমি একটা বুলেট পেয়েছি, ·৩২ অটোমেটিকের, সম্ভবত ব্রাউনিং-এরই।'

'কোথায় পেয়েছেন, ইন্সপেক্টর?'

ইন্সপেক্টর বলল, 'জানালার কাছ থেকে খানিকদূরের একটা গাছের গা থেকে। ওই জানালা দিয়ে মি. সিম্পসন লাইব্রেরীতে ঢুকেছিলেন।'

নিস্তব্ধতা।

'কিন্তু, স্যার, কিছু পায়ের ছাপ-এর কোন অর্থ বোঝা যাচ্ছে না। দেখে মনে হয় খুনী পশ্চিমদিকের একটা জানালা দিয়ে পালিয়ে গেছে—কিন্তু পশ্চিম দিকের জানালা তো খোলাই যায় না, এখনও।'

এমন সময় ফোন এল।

কামাল ফোন করে রিপোর্ট দিল। শহীদ নির্দেশ দিল তাকে, 'ব্যারিস্টার এবং মিস শাহানারাকে ছেড়ে দে, কামাল।'

আকাশ সেই আগের মতই আছে, থমথমে। যে কোন মুহূর্তে গর্জন এবং বর্ষণ শুরু হয়ে যেতে পারে। রেস্টহাউজের পশ্চিম দিকে পৌঁছুল ওরা সবাই ইন্সপেক্টরের পিছু পিছু। ইন্সপেক্টর রমজান মিয়াকে দাঁড় করিয়ে রেখে গিয়েছিল। রমজান কপালে হাত ঠেকিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াল।

ইন্সপেক্টর দাঁড়াল পশ্চিম দিকে বাঁ পাশের জানালার সামনে। এই জানালার ঠিক ওপরে, লাইব্রেরীর ভিতর, ফ্লাওয়ার ভাসটা দাঁড়িয়ে আছে, যেটার ভিতর ব্রাউনিং পিস্তলটা পাওয়া গেছে।

দেয়ালের পর থেকে বেশ খানিকটা জায়গা ইট দিয়ে ঘেরা, ফুল গাছ লাগাবার জন্যে। গ্রীষ্মকালে ফুল গাছ সম্ভবত লাগানো হয়েছিল, এখন সে সব গাছের অস্তিত্ব নেই। দেয়াল যতটা, ততটা লম্বা জায়গাটা। চওড়া দশ ফুটের মত।

জানালাটার ঠিক নিচে, এবড়োখেবড়ো নরম মাটির উপর জুতোর দাগ। বেশ বড় বড় দাগ। বৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু দাগগুলো এখনও চেনা যায় জুতোর দাগ বলে।

কুয়াশা কথা বলল প্রথম, 'গতকাল এগুলো দেখেননি, মি. সিম্পসন?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'কি জানেন, মি. আহমেদ, ভিতর থেকে জানালাগুলো একটাও খোলা সম্ভব নয় প্রমাণ পেয়ে বাইরেটা আর দেখার প্রয়োজন বোধ করিনি…!'

কুয়াশা বলল, 'ভুল করেছেন। সে যাক, জুতোর দাগগুলো দেখছেন—আশ্চর্য না?'

মি. সিম্পসন ঠিক যেন বুঝতে পারলেন না কুয়াশার কথা, কিন্তু শহীদ বলল, 'তুমি কি বলতে চাইছ, বুঝতে পেরেছি, এনাম। জানালার কাছ থেকে কেউ যেন এদিকে এসেছে, আসার দাগ সবগুলো। গোড়ালির দাগ দেখে তাই প্রমাণ হয়।'

কুয়াশার প্রশ্ন, 'তাহলে, লোকটা যে-ই হোক, জানালার কাছে গেল কিভাবে? যাবার দাগ নেই কেন? লোকটা কি উড়তে পারে নাকি?'

মি. সিম্পসন অবাক হয়ে বললেন, 'তাই তো। এ কি রহস্য!'

কুয়াশা বলল, 'মি. সিম্পসন, সত্যিই কি জানালা খোলা অসম্ভব? কিংবা প্রশ্নটা বরং এভাবে করি, লোদী সাহেবকে খুন করে খুনী এই জানালা খুলে বেরিয়ে আসতে পারে না?'

'সেন্ট পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, তা সম্ভব নয়। আমি এবং কামাল একটা জানালা খুলতে দশ মিনিট সময় ব্যয় করেছি। খুনী সময় পেয়েছে মাত্র পাঁচ কি সাত সেকেণ্ড, তার পক্ষে জানালা খুলে বেরিয়ে আসা এই অল্প সময়ে সম্ভব নয়। তা ছাড়া রুমে ঢুকে আমি জানালা বন্ধ দেখেছি। রফিক যদি খুনীকে সাহায্য করার জন্যে জানালা বন্ধ করতে যেত, তাতেও অন্তত দশ মিনিট সময় লাগত। কারণ, বন্ধ করার সময়ও ওই রকম সময় লেগেছিল আমাদের।'

শহীদের দিকে তাকিয়ে কুয়াশা বলল, 'জুতোর দাগ দেখে কত নম্বর জুতো বলতে পারবে?'

'সম্ভবত দশ নম্বর।'

কুয়াশা বলল, 'আমারও তাই ধারণা। মি. সিম্পসন, বলতে পারেন এ বাড়ির কে দশ নম্বর জুতো পরে?'

'এখুনি বলতে পারব না। তবে রফিক নয়, আমি জানি। সে লম্বা হলেও, ছয় কি সাত নম্বর জুতো পরে সে।'

কুয়াশা তাকাল ইন্সপেক্টরের দিকে, 'আর কি দেখাবার আছে আপনার?'

ইন্সপেক্টর বলল, 'দক্ষিণ দিকে চলুন, মি. আহমেদ। যে গাছটায় বুলেট পাওয়া গেছে সেটা দেখবেন, গাছটার চারদিকে আরও কিছু পায়ের ছাপও আছে—ওগুলো আবার পুরুষের নয়, মেয়েমানুষের জুতোর ছাপ!'

কুয়াশা যেন খুশি হয়ে উঠল। বলল, 'গুড। এই রকম কিছুই আশা করছিলাম আমি?'

কেন সে এই রকম কিছু আশা করছিল, তা কিন্তু কুয়াশা ব্যাখ্যা করে বলল না।

ফ্রন্টসাইডে এসে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের সামনে দাঁড়াল ইন্সপেক্টর। হাত উঁচু করে গাছের গায়ের ছোট্ট গর্তটা দেখিয়ে বলল, 'ওই দেখুন, স্যার।'

মি. সিম্পসন ফুটোটা দেখলেন অনেকক্ষণ ধরে। তারপর তাকালেন খোলা জানালাটার দিকে। বললেন, 'জানালা দিয়ে গুলিটা বেরুলে এই গাছে এসে লাগতে পারে—একটা সম্ভাবনা। বের করো গুলিটা, শাকুর। মি. আহমেদ, আমি কি ভাবছি জানেন? দেখুন, মাত্র পনেরো ফুট দূরে জানালা থেকে গাছটা, তাই না? গতকাল এই গাছটার গা ঘেঁষেই জানালার দিকে দৌড়ে যাই আমি। গাছটার গা ঘেঁষে যাবার সময়ই দ্বিতীয় গুলির শব্দটা শুনি। গুলিটা যে গাছে বিঁধল, টের পেলাম না কেন?'

একটা কাঠের বাক্স নিয়ে এল রমজান মিয়া। তাতে দাঁড়িয়ে ইন্সপেক্টর পেন-নাইফের সাহায্যে ফুটোটাকে বড় করে বুলেটটাকে সহজেই বের করে ফেলল। কুয়াশা হাত বাড়িয়ে চেয়ে নিল বুলেটটা। ওজন পরীক্ষা করে তাকাল শহীদের দিকে। বলল, 'কি আশ্চর্য!'

শহীদ এবং মি. সিম্পসন জানতে চাইলেন সবিস্ময়ে, একযোগে, 'কি হলো?'

কুয়াশা বলল, 'মি. সিম্পসন, থানা হেডকোয়ার্টারে ফোন করে এখুনি একজন ফটোগ্রাফারকে ডেকে পাঠান।'

মি. সিম্পসন কৌতূহলে অস্থির হয়ে উঠেছেন, 'কেন বলুন তো?'

কুয়াশা বলল, 'গাছের গায়ে ফুটোটা ভাল করে দেখেছেন? নিশ্চয়ই দেখেননি। দেখলে, অদ্ভুত ব্যাপারটা চোখে পড়ত। ভাল করে দেখুন, বুলেটটা গাছের গায়ে ঢুকেছে সোজাসুজি ভাবে, তির্যকভাবে নয়। জানালা এবং গাছ একই সরল রেখায় হলেও, গুলিটা করা হয়েছে রুমের এক কোনা থেকে, জানালার সামনে থেকে নয়। জানালা দিয়ে গুলিটা বেরিয়েছে, অন্তত বেরুবার কথা, একটু কোনাকুনি ভাবে। একটু তির্যকভাবে ঢোকার কথা বুলেট, তাই না? ফটোগ্রাফারকে আসতে বলুন, ছবি এবং মাপ দরকার ওই ফুটোটার।'

ইন্সপেক্টরকে গর্বিত দেখাল। সে বলল, 'ফটোগ্রাফার আসছে, স্যার। কনস্টেবল হুদাকে আমি আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি হেডকোয়ার্টারে। জুতার দাগ দেখবেন এবার, স্যার।'

ইন্সপেক্টর গাছটাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল দু'পা, দাঁড়াল, এই দেখুন! ওদিকেও আরও আছে—ওই যে!'

গাছটার পিছনে এবং খানিকটা ডানদিকে সত্যিই দেখা গেল জুতোর দাগ। জুতোর আকার দেখেই বোঝা যায়, মেয়েদের পায়ের জুতো। সরু, ছুঁচাল আগার দিকে এবং হাইহিলওলা। গাছের ডানদিকেই বেশি দাগ পড়েছে, পাশাপাশি জোড়া দাগও ওখানে দেখা গেল। পাশাপাশি জোড়া দাগ দেখে বুঝতে অসুবিধে হলো না, ওখানে কেউ দাঁড়িয়ে ছিল বেশ কিছুক্ষণ।

সকলকে চমকে দিয়ে কুয়াশা হঠাৎ মাথা তুলে হোঃ হোঃ করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

মি. সিম্পসন একবার কুয়াশার দিকে, একবার শহীদের দিকে তাকাতে শুরু করলেন। ইন্সপেক্টর শাকুর থমকে গেছে, বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে আছে সে কুয়াশার দিকে।

ভয় পেয়েছে রমজান মিয়া। এমন বজ্রকণ্ঠের অট্টহাসি কোন মানুষের গলা দিয়ে বেরুতে পারে, কল্পনায় ছিল না তার। দু'পা পিছিয়ে গেল সে।

অকস্মাৎ অট্টহাসি থামল কুয়াশার।

কেউ কিছু বলার আগে নিজেই সে বলল, 'মি. সিম্পসন, ব্যাপারটা ধরতে পারেননি, না? নিজেই যদি ধরতে পারতেন, আমার মতই হাসতে হত আপনাকে।'

শহীদ বলল, 'কি ব্যাপার বলো তো?'

কুয়াশা একটু যেন অখুশি হলো। বলল, 'শহীদ, তোমার চোখে তো ব্যাপারটা ধরা না পড়ার কথা নয়। ঠিক আছে, বলছি আমি। এই যে মেয়েদের জুতোর ছাপ, এটা রোপণ করা, নকল।'

'হোয়াট!' মি. সিম্পসন সাপ দেখে আঁতকে উঠলেন যেন।

ইন্সপেক্টর বলল, 'আপনি কি বলছেন, মি. আহমেদ?'

কুয়াশা বলল, 'ঠিকই বলছি। গতকাল বৃষ্টি হয়েছে, আজও বৃষ্টি হয়েছে, তাই নয়? দাগগুলোর দিকে তাকান। বৃষ্টিতে যতটা ক্ষতবিক্ষত হবার কথা ততটা কি হয়েছে? তা ছাড়া, গভীরতা দেখুন। বৃষ্টিভেজা ঘাসের ওপর একটা মেয়ে জুতো পায়ে দিয়ে দাঁড়ালেও, মাটির কতটা গভীরে হাইহিল ঢুকবে? মেয়েটির ওজনের ওপর নির্ভর করে, তাই না? তাকিয়ে দেখুন, মেপে দেখুন--প্রমাণ হয়ে যাবে, পাঁচ মন ওজনের কোন মেয়ের জুতোর দাগ এগুলো কিন্তু পাঁচ মন ওজনের মেয়ে বাংলাদেশে নেই বলেই আমি জানি।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'মি. আহমেদ, ধন্যবাদ। আপনার সাথে আমি একমত। কেউ, সম্ভবত কোন পুরুষই আমাদেরকে ধোঁকা দেবার জন্যে হাতে করে মেয়েদের হাইহিলওয়ালা জুতো নিয়ে এসে গাছটার আশপাশে সেই জুতোর দাগ তৈরি করেছে জোর করে চেপে চেপে। কি জানেন, এই গাছটার গা ঘেঁষে জানালার দিকে দৌড়াই আমি। গাছের সামনে পিছনে বা আড়ালে যদি কেউ থাকত, তাকে দেখতে না পাবার কোন কারণ নেই। গাছটাকে মোটা বলাও চলে না। তাহলে, পশ্চিমদিকের জানালার সামনে দশ নম্বর জুতোর দাগগুলোও মেকী বলে ধরে নিতে হয়। কেউ আমাদেরকে এই পায়ের দাগ দেখাতে চায়—কিন্তু কেন? আর একটা ব্যাপার—বুলেটটাও কি তাহলে…?'

কুয়াশা বলল, 'বুলেটটাও, কোন অনুর্বর মস্তিষ্কের অনুর্বর কাণ্ডজ্ঞানহীনতার ফলশ্রুতি অর্থাৎ জানালা দিয়ে বুলেটটা আসেনি। যেখানে ব্রাউনিংটা পাওয়া গেছে সেখান থেকে কেউ যদি গুলি করে থাকে, জানালা গলে সে-বুলেট বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না। তা আসতে হলে বুলেটটাকে শূন্যে বাঁক নিতে হবে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রেও আমাদেরকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। আসলে, গুলিটা কেউ

করেছে হত্যাকাণ্ডের পরে, সম্ভবত আজ কোন একসময় সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল দিয়ে, লাইব্রেরী রুমের বাইরে থেকে। মি. সিম্পসন, চলুন, লাইব্রেরী রুমটা দেখি একবার।'

ছয়

লাইব্রেরী রুমটা দিনের বেলাতেও অন্ধকার থাকে। দিনটা আজ আবার মেঘলা। মি. সিম্পসন বোতাম টিপে আলো জ্বেলে দিলেন। ডেস্কের টেবিল-ল্যাম্পটা অবশ্য জ্বালালেন না। কুয়াশা রুমের ভিতর ঢুকেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। প্রথমে পশ্চিম দিকের জানালা দুটো পরীক্ষা করল সে। তারপর দক্ষিণ দিকের বন্ধ জানালাটা। বলল, 'কোন সন্দেহ নেই, দু'এক মিনিটে জানালা তিনটে খোলা অসম্ভব। খুনী জানালা দিয়ে ঢোকেওনি, বেরিয়েও যায়নি। মি. সিম্পসন, আপনার পকেট থেকে ব্যারিস্টার সরফরাজ খানের ব্রাউনিং পিস্তলটা আমাকে দিন। তারপর নিভিয়ে দিন সিলিংয়ের আলোটা। সুইচ অন্ করুন টেবিল ল্যাম্পের। কিন্তু···তার আগে···।'

কথা শেষ না করে কুয়াশা ডেস্কের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল, সাথে সাথে গেল শহীদ, মি. সিম্পসন এবং ইন্সপেক্টর শাকুর।

ডেস্কে তিনটে দেরাজ। তিনটেই তালাহীন। একে একে সবগুলো খুলল কুয়াশা। উপরের দুটোয় বিশেষ কিছু নেই, খালিই বলা চলে। নিচেরটায় পাওয়া গেল একটা ব্যাঙ্কের চেক-বই, মেমোর‍্যানডাম প্যাড।

প্যাডে সুন্দর, স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা রয়েছে:

হেলেনা মোমতাজ
প্রযত্নে/ মকবুল হোসেন সিদ্দিকী
২১, ফুলবাগিচা, সাহেব পাড়া, ঢাকা।

কুয়াশা বলল, 'নতুন প্রাইভেট সেক্রেটারির নাম ঠিকানা, আর কিছু নেই। মি. সিম্পসন, দিন এবার পিস্তলটা।'

পিস্তলটা কুয়াশাকে দিয়ে সিলিংয়ের বালবটা অফ করে দিলেন মি. সিম্পসন, তারপর অন্ করলেন টেবিল-ল্যাম্প। ডেস্কটা ছাড়া গোটা রুম আধো অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল। রুমের দূর প্রান্তের কোনাগুলোয় অন্ধকার স্বভাবতই বেশি গাঢ়।

কুয়াশা উত্তর-পশ্চিম কোনায়, ফ্লাওয়ার ভাসের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সেখান থেকে শহীদের উদ্দেশে বলল, 'এখান থেকে আমি গুলি করব, শহীদ। লোদী সাহেব যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই জায়গা অনুমান করে। গুলি করার পরই পিস্তলটা ফ্লাওয়ার ভাসে ফেলে দেব। রফিক যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, তুমি ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়াও। গুলির শব্দ শোনামাত্র ঘুরে তাকাবে তুমি,—এবং বলবে আমাকে দেখতে পাও কিনা।'

রুমের মাঝামাঝি জায়গা দেখিয়ে দিলেন মি. সিম্পসন। বললেন, 'এইখানে দাঁড়িয়ে ছিল রফিক।'

বিনা বাক্যব্যয়ে পজিশন নিল শহীদ। তাকিয়ে আছে ডেস্কের দিকে। প্রতিমুহূর্তে গুলির শব্দ আশা করছিল ও। কিন্তু কুয়াশা নিষ্ক্রিয়, গুলি করছে না। সময় নিচ্ছে সে, শহীদকে অসতর্ক অবস্থায় পাবার জন্যে।

আওয়াজটা এমন জোরে হলো যে রুমটা যেন থরথর করে কেঁপে উঠল সাথে সাথে। বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়িয়েছে শহীদ।

টেবিল-ল্যাম্পের দিকে দৃষ্টি ছিল এতক্ষণ, হঠাৎ অন্ধকার কোনায় তাকাতে বিশেষ কিছুই দেখতে পেল না শহীদ। ঠুক করে একটা শব্দ হলো বলে মনে হলো ওর।

'দেখতে পাচ্ছ?'

শহীদ বলল, 'কিছুই পরিষ্কার নয়। একটু আগে তো কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না, এখনও যা দেখছি, চেনা মুশকিল, কি ওটা। ফ্লাওয়ার ভাসটাকে মনে হচ্ছে গাঢ়, স্থির অন্ধকার, তার পাশে তোমাকে মনে হচ্ছে কাঁপা কাঁপা অন্ধকার, আরও গাঢ়।'

কুয়াশা এগিয়ে এসে বোতাম টিপে সিলিংয়ের বালবটা অন করে দিল, বলল, 'মি. সিম্পসন, দেখলেন তো বুলেটটা জানালা গলে বাইরে যায়নি।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। জানালার কাছ থেকে এক ফুট দূরের দেয়ালে ওই যে গর্ত—দেয়ালে এখন দুটো গর্ত। কিন্তু, মি. আহমেদ, এসব আমার কাছে ভাল ঠেকছে না। মাথা ঘুরছে আমার, ব্রেন অকেজো হয়ে যাবে বলে সন্দেহ হচ্ছে। জানালা গলে বুলেট বেরিয়ে যায়নি বলছেন, কিন্তু দ্বিতীয় গুলির বুলেটটা কোথায় তাহলে? নেই কেন?'

মি. সিম্পসন রয়ে গেলেন ইন্সপেক্টর শাকুরের সাথে। বললেন, 'অফিস থেকে ঘুরে সাড়ে পাঁচটার দিকে আমি তোমার বাড়িতে যাব, শহীদ। এর মধ্যে দেখব লোদী সাহেবের বাড়ির লোকদের সাথে আর একবার কথাবার্তা বলে।'

কুয়াশা বলল, 'শহীদ, তোমার এক জায়গায় যাওয়া উচিত। আমিই যেতাম, কিন্তু লাঞ্চ আওয়ার পেরিয়ে যাচ্ছে, বাড়ি না ফিরলে মহুয়াদি যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে ছাড়বে।'

মি. সিম্পসনও বললেন, 'শহীদকে আবার কোথায় পাঠাবেন?'

শহীদ বলল, 'আমি জানি!'

কুয়াশা বলল, 'যাও তাহলে।'

মি. সিম্পসন হেসে ফেললেন, 'কোডওয়ার্ডে কথাবার্তা হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে?'

শহীদও হাসল। বলল, 'এনাম এলাহী রোডে যেতে বলছে, মি. সিম্পসন। মিস ইলোরাকে সেখানে কেউ দেখেছে কিনা জানা দরকার।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'মনে হয় না। সে তো নিজেই বলছে, তার অ্যালিবাই প্রমাণ করা সম্ভব নয়।'

কুয়াশা বলল, 'তবু।'

গাড়িতে এসে উঠল কুয়াশা। শহীদ ট্যাক্সিতে যাবে, ঠিক হলো।

বাড়ি ফিরে কুয়াশা কামালকে পেল। কুয়াশা ড্রয়িংরুমে পা দিতেই সে বলল, 'কোন কথা নয়, হাত মুখ ধুয়ে সোজা ডাইনিংরুমে চলে যাও। মহুয়াদি তোমার খাবার নিয়ে বসে আছে। দেরি করলে কি যে ঘটবে আজ বলা মুশকিল।'

ম্লান হয়ে গেল কুয়াশার মুখ। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'যাব? মেজাজ কি খুবই খারাপ ওর?'

'হবে না খারাপ? এই অসুস্থ শরীর নিয়ে বেলা তিনটে পর্যন্ত বাইরে বাইরে থাকবে—দাদা তোমাকে আমি রুমের ভিতর আজ থেকেই তালা দিয়ে রাখব।' মহুয়া দোরগোড়া থেকে বলল।

মাথা নিচু করে হাসি চাপল কুয়াশা। কামাল জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল নিঃশব্দে। সে যেন কালা এবং বোবা হয়ে গেছে হঠাৎ।

কুয়াশা আবেদনের সুরে বলল, 'আর এমন করব না, এবারটি মাফ করে দে।'

মহুয়াও হাসি চাপল। গম্ভীর গলায় বলল সে, 'যাও, হাত মুখ ধুয়ে এসো! তোমাদের না হয় না খেলে চলে, চা সিগারেট খেয়ে খিদে নষ্ট করে রাখো, কিন্তু আমার বুঝি খিদে পায় না? তা, তিনি কোথায়?'

কুয়াশাকে অপরাধী অপরাধী দেখাল। বলল, 'একটা কাজে গেছে। আধঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবে।'

মহুয়া বলল, 'তবু ভাল যে তোমাকেও সাথে রাখেনি! কই, দাঁড়িয়ে রইলে কেন—যাও!'

সুড়সুড় করে অন্দর মহলের দিকে পা বাড়াল কুয়াশা।

খাওয়া দাওয়া সেরে নিজের রুমে শুয়ে পড়তে হলো কুয়াশাকে। মহুয়া তার হাত ধরে নিয়ে এসে বিছানায় তুলে দিয়ে গেছে, বলে গেছে, বিছানা থেকে নামলে বিপদ আছে। কাকুতি মিনতি করায় শেষ পর্যন্ত অবশ্য রাজি হয়েছে শহীদ, কামাল এবং মি. সিম্পসনকে বেডরুমে আধঘণ্টার জন্যে ঢুকতে দিতে।

শহীদ ফিরল চারটের সময়। খাওয়াদাওয়া সেরে ড্রয়িংরুমে বসল সে কামালের সাথে। লোদী সাহেবের বাড়িতে যা যা ঘটেছে সব বলল ও কামালকে। এমন সময় এলেন মি. সিম্পসন।

'মি. আহমেদকে দেখছি না যে?'

মহুয়ার আইন সম্পর্কে মি. সিম্পসনকে জ্ঞানদান করার পর কামাল বলল, 'এখন কি করবেন ভেবে দেখুন। আধঘণ্টার জন্য তার সাথে কথা বলতে পারেন। আর একবার কথা বললে, চব্বিশ ঘণ্টার পর সুযোগ পাবেন আবার।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'প্রথম সুযোগটা এখুনি নিই। তারপর দেখা যাবে। দরকার হলে কিডন্যাপ করব মি. আহমেদকে।'

কামাল বলল, 'পুলিস অফিসার আপনি, কিডন্যাপ করবেন কেন? তা কেউ করে? তারচেয়ে ভাল উপায় হাতে থাকতে?'

'কি উপায়?'

কামাল বলল, 'মহুয়াদিকে বললেই হবে, মি. আহমেদকে আমি গ্রেফতার করছি, কুয়াশা সন্দেহে!'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন মি. সিম্পসন সিলিংয়ের দিকে মুখ তুলে। এই ফাঁকে শহীদ এবং কামাল পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে তাকাল একবার।

মুচকি একটু হাসল শহীদ।

মি. সিম্পসন হাসি থামিয়ে বললেন, 'সুতরাং মিসেস মহুয়ার আইনকে ভয় পাবার কিছু নেই, কি বলো? দরকার হলে কুয়াশা সন্দেহে মি. আহমেদকে সত্যি আমি গ্রেফতার করে বাড়ি থেকে বের করার ব্যবস্থা করব। ওঠো, ভদ্রলোকের সাথে কথা বলে আসি। লোদী সাহেবের বাড়িতে আজ তিনি যা যা করেছেন, দেখে তো ভক্ত হয়ে গেছি আমি তাঁর। উনি দেখিয়ে এবং বুঝিয়ে না দিলে অনেক রহস্যই অগোচরে থেকে যেত আমাদের।'

উঠল ওরা। পা বাড়াল কুয়াশার বেডরুমের দিকে।

ওদেরকে দেখে হাসিমুখে বিছানার উপর উঠে বসল কুয়াশা। বলল, 'আসুন, মি. সিম্পসন। কি খবর বলুন। নতুন আর কি আবিষ্কার করলেন?'

চেয়ার টেনে খাটকে সামনে রেখে বসল ওরা তিনজন। কুয়াশা চুরুট ধরাল। মি. সিম্পসন বললেন, 'কামাল, তোমার রিপোর্ট কি?'

কামাল বলল, 'যাকে আমরা সন্দেহ করিনি এতটুকু, তিনি এখন পুরোপুরি সন্দেহের মধ্যে পড়ে যাচ্ছেন। আমি ব্যারিস্টার সরফরাজ খানের কথা বলছি। তিনি বলেছিলেন, বিকেল থেকে ছ'টা পর্যন্ত তিনি তাঁর চেম্বারে ছিলেন। কথাটা সত্যি। চেম্বার থেকে বেরুবার পথ একটাই, সেটা আউটার রুমের ভিতর দিয়ে. কেরানী যেখানে বসে—একথাও বলেছিলেন তিনি। কিন্তু এটা তাঁর মিথ্যে কথা। চেম্বারে ঢুকে আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। সংলগ্ন বাথরুম আছে। সেই বাথরুমের জানালায় শার্সি লাগানো, গরাদ নেই। জানালার বাইরে, দেয়ালের গায়ে মোটা পানির পাইপ। সেই পাইপ বেয়ে অনায়াসে যে-কেউ নামতে পারে নিচে। নিচে ঝোপ-ঝাড়, বাড়ির পিছনের অংশ। আশপাশে তেমন কোন বাড়ি নেই, ফলে নামবার সময় কারও চোখে ধরা পড়বারও ভয় নেই।'

'গুড গড! ব্যারিস্টার এই রকম কাঁচা মিথ্যে কথা বললেন কেন?' মি. সিম্পসন বললেন।

শহীদ বলল, 'এদিকে আমি যে তথ্য পেয়েছি, তাতে ইলোরাকে আর সন্দেহ করবার কোন মানে হয় না। এলাহী রোডে গিয়ে আমি সরাসরি কথা বলি স্টেশনারি দোকানের মালিক এক অ্যাংলো বুড়ির সাথে। মিসেস কান্তা গোমেজকে ইলোরার চেহারার বর্ণনা দিতেই তিনি বললেন, হ্যাঁ, গতকাল ওই চেহারার এক যুবতী রোডের এ-মাথা থেকে সে-মাথা পর্যন্ত বেশ কয়েকবার হাঁটাহাঁটি করেছে। শেষবার তাকে দেখেছেন তিনি সাড়ে পাঁচটার সময়। অর্থাৎ লোদী সাহেব যখন খুন হন ইলোরা তখনও এলাহী রোডে ছিল।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'আমিও কিছু তথ্য উদ্ধার করেছি। শাহানারার অ্যালিবাই যতটা মজবুত বলে মনে হয়েছিল আসলে ততটা মজবুত সেটা নয়। রফিক আমাদেরকে জানিয়েছে, কেরামতের সাথে শাহানারা কথা বলেছে সাড়ে পাঁচটার দিকে, দু'এক মিনিট আগে বড় জোর। কিন্তু কেরামতকে খুঁটিয়ে প্রশ্ন

করতে সে আমাকে জানিয়েছে, শাহানারার সাথে ড্রয়িংরুমে কথা বলেছে সে পাঁচটা বেজে বিশ মিনিটে। দশ মিনিটের গোলমাল হচ্ছে। এই দশ মিনিটের মধ্যে শাহানারার পক্ষে রেস্টহাউজে যাওয়া সম্ভব।'

শহীদ বলল, 'তুমি কিছু বলো, এনাম!'

মি. সিম্পসন উৎসাহী হয়ে উঠলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি কিছু বলুন এবার। অনুমান করেও কি কিছু একটা বলতে পারেন না? আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির যে পরিচয় পেয়েছি...'

কুয়াশা সহাস্যে বলল, 'লজ্জা দেবেন না মি. সিম্পসন। প্রকৃত সত্য জানতে চান? বলতে পারি। কিন্তু বলব না। আরও প্রমাণ দরকার আমার। তবে এটুকু জেনে রাখুন, প্রকৃত খুনী কে তা আমি জানি। কিভাবে সে খুন করেছে তাও আমি জানি। কিন্তু তার পরিচয় প্রকাশ করলে আপনি তাকে গ্রেফতার করার জন্যে ছুটবেন, ফলে তাকে অভিযুক্ত করার জন্যে যে প্রমাণ দরকার তা সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। আসুন, বাস্তব ঘটনা নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা করি আরও।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'কিন্তু সত্যিই কি আপনি...'

কুয়াশা বলল, 'হ্যাঁ, কে খুন করেছে আমি জানি। তবে তার সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যে আমি এখন তৈরি নই। আপনারা কে আর কি আবিষ্কার করেছেন বলুন।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'কেরামত বলেছিল, খুনের সময় সে, বাবুর্চী এবং চাকরানী হ্যাঁদার মা রান্নাঘরে ছিল। কথাটা ঠিক। কিন্তু কেরামত একবার মিনিট সাতেকের জন্যে, আরেকবার মিনিট দশেকের জন্যে রান্নাঘর থেকে বেরিয়েছিল। একথা বলেছে হ্যাঁদার মা। ফলে, সে-ও সন্দেহের মধ্যে চলে আসছে।'

'সিরু কাকার অ্যালিবাই?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'প্রমাণ করা সম্ভব নয়। বই আনতে লাইব্রেরীতে গিয়েছিল কিন্তু বই নাকি পায়নি। লাইব্রেরীতে আরও পাঠক ছিল কিন্তু তারা কে কোথায় থাকে জানবার কোন উপায় নেই, তাছাড়া তারা কি আর বুড়োকে চিনে রেখেছে? মোট কথা বুড়ো সত্য বলছে কি মিথ্যে বলছে প্রমাণ করা সম্ভব নয়।'

'জুতোর ব্যাপারে...'

'বলছি। গোটা বাড়িটা সার্চ করেছি আমি। গাছের কাছে জুতোর যে দাগ পাওয়া গেছে তা চার নম্বর জুতোর দাগ। ওরা দু'বোনই চার নম্বর পরে। কিন্তু ওদের ছয় জোড়া জুতোর কোনটাতেই কাদার চিহ্ন পাইনি।'

'দশ নম্বর জুতো কে পরে?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'মাত্র একজন। সিরু কাকা। ওর মাত্র দু'জোড়া জুতো, তার মধ্যে এক জোড়া ভিজে। কিন্তু কাদা নেই এতটুকু। জুতোয় একবার কাদা লাগলে তা ধুয়ে সম্পূর্ণ তুলে ফেলা খুব কঠিন কাজ।'

মহুয়া ভেজানো দরজা ঠেলে ভিতরে তাকাল। শহীদের উদ্দেশে বলল, 'ফোন।'

শহীদ উঠে দাঁড়াল। দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'কে?'

মহুয়া বলল, 'কোন লাশ বা ভূত হবে! গলাটা যেন কেমন লাগল কানে। নাম জিজ্ঞেস করিনি।'

শহীদ টেলিফোনের দিকে দ্রুত পা বাড়াল। মহুয়া চলে গেল অন্দরমহলের দিকে।

কুয়াশা বলল, 'কামাল, বাড়ি ফিরে তুমি ব্যারিস্টার এবং শাহানারাকে কি অজুহাত দেখালে বলো তো? শহীদ যে ওদেরকে বন্দী করে রেখে গিয়েছিল, নিশ্চয়ই ওরা তা বুঝতে পেরেছিল?'

'পেরেছিল। কিন্তু খুব একটা অসন্তুষ্ট দেখলাম না দু'জনের কাউকেই। দরজা খুলে দেখলাম, গম্ভীরভাবে আলোচনা করছে। ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। ব্যারিস্টারের বয়স হয়েছে, কিন্তু শাহানারার কতই বা বয়স...'

কুয়াশা মৃদু হেসে বলল, 'প্রেমের কোন বয়স নেই, কামাল।'

শহীদ ফিরল মিনিট তিনেক পর। রুমে ঢুকেই ঘোষণা করল ও চরম একটা দুঃসংবাদ। 'হেলেনা মোমতাজ কে, মনে আছে? লোদী সাহেবের জন্যে যে প্রাইভেট সেক্রেটারি নির্বাচন করা হয়েছে গতকাল বিকেলে, সে। ঘণ্টাখানেক আগে সেই হেলেনা মোমতাজ লোদী সাহেবের বাড়িতে ফোন করে। ফোন ধরেন ব্যারিস্টার সরফরাজ খান, তিনি চারটে থেকে ওখানেই আছেন। হেলেনা মোমতাজ ফোনে ইলোরাকে চায়। কিন্তু ইলোরা বাড়িতে নেই। হেলেনা বলে, অত্যন্ত জরুরী একটা ব্যাপারে সে কথা বলতে চায় ইলোরার সাথে। না, বাড়ির আর কারও সাথে কথা বলতে রাজি হয় না সে। ব্যারিস্টার তাকে জানায়, তিনি পরিবারের আইন উপদেষ্টা, তাকে যে কোন কথা বলা যেতে পারে। অনেক করে বোঝাতে, হেলেনা রাজি হয়। তবে ফোনে নয়, সে বাড়িতে এসে তার বক্তব্য বলতে চায়।'

'তারপর?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চান মি. সিম্পসন।

শহীদ বলে, 'বাড়ির ভিতর দশ মিনিট পর ঢোকে সে, কিন্তু চওড়া রাস্তাটা পেরিয়ে বিল্ডিংয়ে ঢোকার ভাগ্য তার হয়নি। রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখান থেকে পাঁচ গজ সামনে পড়ে আছে সে। পিঠে বিঁধে আছে ছোরা—বেঁচে নেই!'

কুয়াশা বিছানা থেকে নেমে পড়ল, 'ওহ্, শহীদ, মারাত্মক একটা ভুল করে ফেলেছি আমি! আমার বোঝা উচিত ছিল মেয়েটা খুন হতে যাচ্ছে। যাক, তোমার কথা শুনে একটা জিনিসের ব্যাখ্যা পেয়ে গেছি আমি, যা ভেবে পাচ্ছিলাম না। আবার কেউ ও বাড়ির টেলিফোন এক্সটেনশনের মাধ্যমে গোপন ফোনের কথাবার্তা শুনছিল।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'মি. আহমেদ, আপনার কি ধারণা, হেলেনা মোমতাজের মুখ বন্ধ করার জন্যে কেউ তাকে খুন করেছে? কিন্তু...হেলেনা মোমতাজ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জানেই বা কি, শুনেছেই বা কি? গতকাল হত্যাকাণ্ড ঘটার অন্তত দেড়ঘণ্টা আগে বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় সে। তখন লোদী সাহেব বহাল তবিয়তে বেঁচে ছিলেন।'

কুয়াশা মাথার চুলে ব্রাশ চালাতে চালাতে বলল, 'আমি সে-ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছি না, মি. সিম্পসন। আমার সন্দেহ করা উচিত ছিল খুনী হেলেনা মোমতাজকে খুন করতে পারে। কিন্তু খুন যে এই রকম বোকার মত করবে ভাবা যায় না! নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরেছে খুনী। প্রকাশ করে ফেলেছে নিজের পরিচয়। মি. সিম্পসন, আমার হাতে এখন যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আর মাত্র একটা কাজ বাকি, সেটা করা হলেই খুনীকে আমি আপনার হাতে তুলে দেব, আপনি তাকে দু'দুটো হত্যাকাণ্ডের দায়ে গ্রেফতার করতে পারেন।'

'এসব আপনি কি বলছেন! আপনার কথা···বিশ্বাস করতে পারছি না যে, মি. আহমেদ।'

কুয়াশা যেন শুনতেই পায়নি মি. সিম্পসনের কথা। সে বলে চলেছে, 'ঠিক এই পদ্ধতিতে কেন খুন করল ও? কেন? নিশ্চয়ই ভয়ে দিশেহারা হয়ে, তা না হলে···শহীদ, কামাল—তোমরা রওনা হয়ে যাও! কুইক! ওখানে গিয়ে রুটিন অনুযায়ী যা করার, করো তোমরা। আমি খানিক পরই পৌঁছে যাব। আমার সাথে আরও দু'জন থাকবে। তাদের মধ্যে একজন···যাক, দেখবেই তো তাকে খানিক পর। অপরজন রফিক। মি. সিম্পসন, আপনি রফিককে গাড়িতে তুলুন, তারপর অপেক্ষা করুন আমার জন্যে থানার গেটের সামনে। দশ মিনিটের মধ্যে গেটে দেখবেন আমাকে।'

'রফিক? তাহলে রফিকই?'

কুয়াশা হেসে উঠল, 'না, মি. সিম্পসন, রফিক খুনী নয়। লোদী সাহেবকে সে খুন করেনি। হেলেনা মোমতাজকে তো খুন করতেই পারে না, কারণ সে তো হাজতে বন্দী রয়েছে। রফিককে দরকার অন্য কারণে, তাকে ছাড়া মীটিং জমবে না!'

'মীটিং?'

কুয়াশা বলল, 'হ্যাঁ, রেস্টহাউজের লাইব্রেরীতে সবাইকে নিয়ে আলোচনা সভায় বসব আমরা।'

সাত

গেটটা খোলা। ফোক্সওয়াগেন ভিতরে ঢুকল। হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল রমজান মিয়া সামনের বাঁকের কাছ থেকে ছুটে আসছে।

গাড়ি থামিয়ে নামল শহীদ, তার সাথে কামাল, বিপরীত দিকের দরজা খুলে। ঠোঁট থেকে সিগারেট নামিয়ে পাকা, প্রশস্ত রাস্তার উপর ফেলল কামাল। জুতো দিয়ে মাড়িয়ে চ্যাপ্টা করে দিল সেটাকে।

হাঁপাতে হাঁপাতে কাছে এসে দাঁড়াল রমজান মিয়া, 'আসুন, হুজুর! ওই বাঁকের ওদিকে!'

পকেট থেকে টর্চ বের করল কামাল। শহীদের পিছু পিছু নিঃশব্দে এগোল সে।

বাঁক ঘুরতেই দেখা গেল লাশটা। পাশে একটা হ্যারিকেন দাঁড় করানো

রয়েছে। রমজান মিয়ার হ্যারিকেন ওটা।

লাশের কাছ থেকে পাঁচ সাত হাত দূরে দূরে কয়েকটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে একজন ব্যারিস্টার সরফরাজ খান, বুক টান টান করে সোজা দাঁড়িয়ে আছেন, জ্বল জ্বল করছে আবছা অন্ধকারে তাঁর হাতের চুরুটের লাল আগুন। রাস্তার পাশে একটা শিমুল গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আরও একটি ছায়ামূর্তি। টর্চের আলোয় ওরা দেখল, ছায়ামূর্তিটি শাহানারা। চিন্তিত, ম্লান মুখাবয়ব।

লাশের কাছে গিয়ে দাঁড়াল শহীদ। পাশে দাঁড়িয়ে কামাল টর্চের আলো ফেলল লাশের গায়ে। শহীদ বসে পড়ল হাঁটু মুড়ে। ছোরার ব্লেডটা কি পরিমাণ ঢুকেছে পিঠের ভিতরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ও। বাঁ দিকের শোল্ডার ব্লেডের পাশ দিয়ে ঢুকে গেছে ছোরা, ইঞ্চি আড়াই ভিতর পর্যন্ত।

ছোরাটা বাঁকানো, ডিনার টেবিলে সাধারণত দেখা যায় এই ধরনের ছোরা, হাতলটা হাড় দিয়ে তৈরি, কারুকাজ করা।

হেলেনা মোমতাজের বয়স হবে বাইশ কি তেইশ, অনুমান করল শহীদ। শরীরে তেমন মাংস নেই। পালের দু'দিকের হাড় একটু উঁচিয়ে আছে। বেশ লম্বা সে। মাথাটা ক্ষতবিক্ষত, মনে হয় রড বা ওই জাতীয় কিছু দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করা হয়েছে পিছন থেকে। সম্ভবত আঘাত খেয়ে পড়ে যায় মুখ থুবড়ে, খুনী তারপর তার পিঠে ছোরা মারে।

শহীদ রাস্তার ডানে-বাঁয়ে তাকাল। বলল, 'কামাল, রড বা ওই ধরনের কিছু থাকার কথা। খুনী নিশ্চয়ই আশপাশে কোথাও সেটা ফেলে গেছে। খুঁজে দেখ।'

বাঁ দিকের ঘাসের উপর নামল কামাল রাস্তা থেকে। রাস্তার দু'পাশেই ছাড়াছাড়া ভাবে গাছ দাঁড়িয়ে আছে। গজ তিনেক এগিয়ে কামাল হাঁক ছাড়ল, 'রাইট! পাওয়া গেছে, শহীদ!'

কামালের টর্চের আলোয় শহীদ দেখল একটা বড়সড় হাতুড়ি পড়ে রয়েছে রাস্তা থেকে আট দশ হাত দূরে। হাতুড়ির মাথায় রক্তের দাগ।

শহীদ প্রশ্ন করল, 'কে আবিষ্কার করে প্রথম লাশটা?'

রমজান মিয়া বাঁ দিক থেকে বলল, 'হুজুর, আমি। আধঘণ্টা আগে, হুজুর। ব্যারিস্টার সাহেব ফোন করে আমাকে বললেন, হেলেনা নামে এক বেগমসাহেবা আসবেন, আমি যেন গেট খুলে ভিতরে ঢুকতে দিই। খানিক পর তিনি এলেন, আমি গেট খুলে দিলাম। তিনি তাড়াতাড়ি করে রাস্তা ধরে চলে এলেন এদিকে। বাঁক নিলেন তিনি, তারপর আমি আর দেখতে পাইনি। গেটটা বন্ধ করার সময় হুজুর, কি রকম যেন একটা শব্দ শুনি। প্রথমে মনে করি, ভুল শুনেছি। কিন্তু আবার একটা শব্দ হয়, যেন কেউ ব্যথায় অ্যাঁ অ্যাঁ শব্দ করতেছে বলে মনে হলো। হ্যারিকেনটা ঘর থেকে বের করে ছুটলাম আমি। বাঁক ঘুরেই দেখি, অন্ধকার মাঠের উপর দিয়ে একটা কালো কি যেন দৌড়াচ্ছে—মানুষের মত দেখতে! তখনও লাশটা দেখিনি আমি। হঠাৎ যখন দেখলাম, মাথাটা ঘুরে গেল। কাছে এসে দেখি, মাথাটা গুঁড়িয়ে

দিয়েছে কেউ, ছোরাটাও…'

কথা শেষ না করে কাঁপতে কাঁপতে রাস্তার উপর বসে পড়ল রমজান মিয়া। অসুস্থ বোধ করছে সে। তার পিছন থেকে কথা বলে উঠল আর একজন। 'হুজুর, ছোরাটা আমি চিনি। ওটা আমাদের ডাইনিংরুমের ছোরা। আর ওই হাতুড়িটাও রান্নাঘরের একটা সেলফে বহুদিন থেকে পড়ে ছিল দেখে আসছি। হাতলটার আগা একটু পোড়া, হুজুর।'

লোকটা কেরামত।

শহীদ বলল, 'মি. সরফরাজ…'

ব্যারিস্টার উত্তর দিল সাথে সাথে, 'অ্যাট ইওর সার্ভিস, মি. প্রাইভেট ডিটেকটিভ!'

'আপনি কখন এ বাড়িতে আসেন আজ?'

'মি. সিম্পসন এখান থেকে চলে যাবার পরপরই আমি এবং শাহানারা ফিরি, হোটেলে লাঞ্চ খেয়ে। আমরা দু'জন একসাথেই ছিলাম সেই থেকে। খুনের খবর রমজান দেয় আমাদেরকে, আমরা তখন দাবা খেলছিলাম।'

'কে ওখানে!' ঝট করে বাঁ দিকে তাকিয়ে প্রায় গর্জে উঠল শহীদ।

'সেই বখে যাওয়া মেয়েটা—অর্থাৎ আমি ইলোরা, মি. শহীদ। কই, সিরু কাকাকে যে দেখছি না?'

ইলোরা ওদের কাছে এসে দাঁড়াল।

শাহানারা বলল, 'আপা, সিরু কাকা রেস্টহাউজে, বাবার কাগজপত্র গোছগাছ করার জন্যে ঘণ্টা খানেক হলো গেছেন।'

শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'এখনও তিনি ওখানে? তিনি জানেন না নাকি?'

শাহানারা বলল, 'না। সিরু কাকাকে খবরটা দেবার কথা মনে ছিল না আমার…।'

'সাবধান!' ইলোরা প্রায় চিৎকার করে উঠে লাফ দিয়ে সরে গেল এক পা। উজ্জ্বল, চোখ ধাঁধানো হেডলাইটের আলোয় দিনের মত আলোকিত হয়ে উঠল চারদিক।

দুটো গাড়ি এসে দাঁড়াল ওদের কাছে। সামনেরটা একটা মার্সিডিজ, পিছনেরটা জীপ।

মার্সিডিজের দরজা খুলে গেল। ভিতর থেকে নামল কুয়াশা।

'গুড ঈভনিং, লেডিস অ্যাণ্ড জেন্টলমেন!' বিবিসির ঘোষকের মত ভরাট-কণ্ঠে বলল কুয়াশা। মার্সিডিজ থেকে নামল এরপর দু'জন পুলিস কনস্টেবল, তাদের সাথে রফিক চৌধুরী।

কারও মুখে হঠাৎ কথা যোগাল না।

নিস্তব্ধতা ভাঙল কুয়াশাই, 'আপনারা প্রায় সবাই দেখছি এখানে উপস্থিত—গুড। আমি বাধিত হব, আপনারা সবাই যদি দয়া করে রেস্টহাউজের লাইব্রেরী রুমে আমার সাথে যান। আমার সাথে আরও একজন অতিথি আছেন, তিনি একটু পর মি. সিম্পসনের সাথে লাইব্রেরীতে উপস্থিত হবেন। চলুন।'

লাশের দিকে একটিবারও না তাকিয়ে পা বাড়াল কুয়াশা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সবাই তাকে অনুসরণ করল। সকলের পিছনে রইল কামাল। শহীদ কুয়াশার সাথে পাশাপাশি হাঁটছে।

সকলকে ঢুকতে দেখে বৃদ্ধ সিরু কাকা নাকের ডগায় ঝুলে পড়া চশমাটা সামলাতে সামলাতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দু'চোখ ভরা বিস্ময়, একটু যেন ভয় ভয় ভাব ফুটে উঠল।

কুয়াশা বলল, 'আপনিও থাকুন, সিরাজ সাহেব।'

সিরু কাকা এগিয়ে গিয়ে সুইচ বোর্ডের একটা সুইচ অন্ করতে সিলিংয়ের একশো পাওয়ারের বালবটা জ্বলে উঠল। উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল লাইব্রেরী রুম।

নিহত লোদী সাহেবের ডেস্কের পিছনে গিয়ে সকলের দিকে মুখ করে দাঁড়াল কুয়াশা। পরনের ওভারকোট থেকে একটা একটা করে বের করল সে আইভর-জনসন রিভলভার, ব্রাউনিং অটোমেটিক এবং এর্কম্যান এয়ার পিস্তল। তিনটেই রাখল সে ডেস্কের উপর, পাশাপাশি।

শহীদ দাঁড়িয়ে আছে ডেস্কের ডান দিকে। কে কোথায় দাঁড়িয়েছে, তাদের কার মুখের চেহারা কেমন, লক্ষ করছে ও।

শাহানারা রুমের একেবারে দূর প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশে, একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন ব্যারিস্টার সরফরাজ খান। চাপা স্বরে, ফিসফিস করে কথা হচ্ছে দু'জনের মধ্যে, শোনবার কোন উপায় নেই।

পুব দিকের দেয়ালের গায়ে বাহু ঠেকিয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইলোরা, হাত দুটো বুকের কাছে ভাঁজ করা। চোখে মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব। কেরামত দাঁড়িয়ে আছে একধারে, বোকার মত, থেকে থেকে নাকের সামনে অস্তিত্বহীন মাছি তাড়াচ্ছে সে এবং সকলকে একবার করে দেখে নিচ্ছে আড়চোখে।

বৃদ্ধ সিরু কাকা দাঁড়িয়ে আছে কেরামতের হাত তিনেক দূরে, দেয়াল ঘেঁষে। চিন্তিত, বিরক্ত দেখাচ্ছে তাকে।

কামাল দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে. দরজায় পাহারা দেবার দায়িত্ব নিয়ে। রুমের বাইরে, হলঘরে, চারজন সশস্ত্র পুলিস আছে, যদিও তাদেরকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না।

কুয়াশার নির্দেশে দু'জন কনস্টেবলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে রফিক চৌধুরী, ডেস্কের বাঁ দিকে।

কুয়াশা সকলের দিকে একবার করে তাকাল। তারপর একটু হেসে নিয়ে বলল, 'লেডিস অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, এই মুহূর্তে মি. সিম্পসন এক বৃদ্ধা মহিলাকে হেলেনা মোমতাজের লাশ দেখাতে ব্যস্ত আছেন। এই বৃদ্ধা মহিলা···আমরা তার কাছ থেকে আশ্চর্য একটা তথ্য আশা করছি। সময় হলে তাকে নিয়ে মি. সিম্পসন এখানে আসবেন। সে যাক। এই হত্যারহস্যের সমাধান বের করার জন্যে মি. সিম্পসন আমাকে অনুরোধ করেছিলেন তা আপনারা সম্ভবত জানেন। এবং আমি ঘোষণা করতে পেরে সত্যি খুশি যে, রহস্যের সমাধান আমি বের করতে পেরেছি।

আমি বলতে চাইছি, লোদী সাহেবের এবং হেলেনা মোমতাজের খুনীকে আমি চিনতে পেরেছি। এখন দুটো মাত্র প্রশ্ন করে আমি প্রয়োজনীয় প্রমাণ সংগ্রহের কাজ শেষ করব। প্রশ্ন দুটো করব আমি মিস শাহানারাকে।'

নিস্তব্ধতা। পিন-ড্রপ সাইলেন্স। এতটুকু নড়ল না কেউ। তবে নিস্তব্ধতা ভাঙল শাহানারাই।

'মি. আহমেদ, যা খুশি জিজ্ঞেস করতে পারেন আপনি।'

সবারই কানে বাজল, শাহানারার কণ্ঠস্বর বেশ কাঁপা কাঁপা। সকলেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল তার দিকে।

শাহানারার ঠোঁট জোড়াও কাঁপছে।

কুয়াশা বলল, 'গুড। মিস শাহানারা, রমজান আমাদেরকে জেরার উত্তরে বলেছিল, বাড়ির পিছনের গেটের চাবি একটা তার কাছে আছে, আর একটা আপনার কাছে ছিল। আপনি কি জানেন, সেই চাবিটা কোথায় এখন?'

'ড্রয়িংরুমের টেবিলের দেরাজে রেখেছিলাম বলে মনে পড়ে, সেখানেই আছে নিশ্চয়।'

কুয়াশা বলল, 'ওখান থেকে চাবিটা কেউ চুরি করতে পারে, তাই না? কিংবা, একদিনের জন্যে চুরি করে নিয়ে গিয়ে ওটার সাহায্যে আর একটা হুবহু ওইরকম চাবি তৈরি করাতে পারে, ঠিক?'

শাহানারা বলল, 'জানি না। তবে পারা সম্ভব।'

কুয়াশা হাসল নিঃশব্দে। বলল, 'এবার আমার শেষ প্রশ্ন। দারোয়ান রমজান আজ আমাদেরকে বলেছে যে এই রুমের পশ্চিম দিকের জানালা দুটো বদলাবার কথা উঠেছিল মাত্র ক'দিন আগে। কারণ, জানালাগুলো এমনই যে খোলা যায় না গায়ের জোরেও। বদলাবার প্রস্তাব কি আপনি দিয়েছিলেন?'

শাহানারা একটু ইতস্তত করে বলল, 'রমজানকে কথাটা আমিই বলেছিলাম বটে, বাবাকেও বলেছিলাম, কিন্তু বাবা আমার কথায় কান দেননি। তিনি আলো জ্বেলেই কাজ করতে ভালবাসতেন, দিনের বেলাও। অনেক করে বোঝাই বাবাকে, কিন্তু বাবা কোনমতে রাজি হননি। তাই এ ব্যাপারে আর মাথা ঘামাইনি। তবে কথাটা আমি ঠিক নিজে থেকে তুলিনি।'

'আচ্ছা! কে আপনাকে তাহলে...'

ভেজানো দরজা খুলে গেল এমন সময়, মি. সিম্পসন প্রবেশ করলেন লাইব্রেরী রুমে। সোজা তিনি কুয়াশার দিকে তাকালেন। বললেন, 'মি. আহমেদ, অল সেট। ক'মিনিট বেশি সময় লাগল, বুঝলেন। কারণ মুখেও আঘাত করা হয়েছে হেলেনা মোমতাজের, ঠিক চেনা যাচ্ছিল না। পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে দেরি হয়ে গেল। মিসেস কান্তা গোমেজ সনাক্ত করতে পেরেছেন, কোন সন্দেহ নেই তাঁর। আপনি বললে তাঁকে ভিতরে আসতে বলি, নিজের বক্তব্য তিনি নিজেই ব্যক্ত করুন।'

কুয়াশা বলল, 'অবশ্যই।'

মি. সিম্পসন হাঁক ছাড়লেন, 'মিসেস গোমেজ, ভিতরে চলে আসুন।'

গাউন পরা হাতির মত বিশাল এক মহিলা থপ্ থপ্ পায়ের শব্দ তুলে দরজা

দিয়ে ভিতরে ঢুকল, 'গুড ঈভনিং!'

কুয়াশা বলল, 'গুড ঈভনিং, মিসেস গোমেজ। আপনার নাম এবং পেশা, আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করুন।'

'আমার নাম মিসেস কান্তা গোমেজ। এলাহী রোডে আমার একটা স্টেশনারি দোকান আছে। দোকানের পিছনের বাড়িটাও আমার, ওখানেই আমি আজ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে বসবাস করছি।'

কুয়াশা বলল, 'এইমাত্র যে লাশটা দেখে এলেন, এই মহিলাকে এর আগে কখনও দেখেছেন আপনি? দেখে থাকলে, কখন কোথায় দেখেছেন?'

মিসেস কান্তা গোমেজ দু'কোমরে হাত রেখে কুয়াশার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, দেখেছি ওকে। গতকাল বিকেলে ওই মহিলা আমার দোকানে আসে এবং জিজ্ঞেস করে, মিস ইলোরা লোদীর নামে লেখা কোন চিঠি আমার কাছে আছে কিনা।'

স্তব্ধতা।

কুয়াশা হাত বাড়িয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে মি. সিম্পসনের উদ্দেশে বলল, 'মি. সিম্পসন, ওই আপনার আসামী।'

মি. সিম্পসন ইঙ্গিত করলেন দরজার দিকে, তারপর দৃঢ় এবং দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন ইলোরার সামনে, 'মিস ইলোরা, আপনাকে আমি মি. ইব্রাহিম লোদী এবং হেলেনা মোমতাজকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার করছি।'

মি. সিম্পসনের কথা শেষ হতে রুমের বাইরে থেকে দু'জন সশস্ত্র কনস্টেবল ঢুকল ভিতরে, তারা দাঁড়াল ইলোরার দু'পাশে।

অকস্মাৎ খিল খিল করে হেসে উঠল ইলোরা।

আট

আতঙ্কের বা দুশ্চিন্তার বা ভেঙে পড়ার কোন লক্ষণই প্রকাশ পেল না ইলোরার মধ্যে। অনেকে, এমন কি মি. সিম্পসন স্বয়ং, কুয়াশার দিকে সন্দিহান চোখে তাকিয়ে রইল।

হাসি থামিয়ে ইলোরা বলল, 'মি. সিম্পসন, কাকে আপনি রহস্য সমাধানের দায়িত্ব দিয়েছেন? ভদ্রলোক দেখছি আস্ত একটা পাগল। এই যে মি. আহমেদ, প্রলাপ বকছেন যে, প্রমাণ করতে পারবেন কিছু?'

কুয়াশা মৃদু হাসল। বলল, 'পারব বৈকি। প্রমাণ সংগ্রহ করেই তো বলছি, আপনি খুনী। তবে কয়েক মিনিট সময় দিচ্ছি আপনাকে, চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে। চিন্তা-ভাবনা করে দেখুন, স্বীকার না করে উপায় আছে কিনা, এই ফাঁকে আমি অন্য একজনের সাথে কথা বলব।'

কুয়াশার দেখাদেখি সকলে তাকাল রফিক চৌধুরীর দিকে।

রফিক চৌধুরীর চেহারা ভূতে ধাওয়া করা ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষের মত কদাকার, বিকৃত হয়ে গেছে।

কুয়াশা বলল, 'তোমার সাথে, রফিক, কিছু কথা আছে আমার। বেশ জোড়া তোমরা! দু'জনেই শঠ, চরিত্রহীন এবং পরস্পরকে ভালবাস।'

'কিন্তু লোদী সাহেবকে আমি খুন করিনি!'

কুয়াশা হেসে ফেলল, 'বলেছি, তুমি খুন করেছ? আমি জানি, তুমি খুন করোনি। কিন্তু খুন করতে গিয়েছিলে, করতেও, কিন্তু করার আর দরকার পড়েনি—ঠিক?'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কুয়াশার দিকে তাকিয়ে রইল রফিক।

'কি, ঠিক কিনা বলো?'

রফিক বলল, 'আমি…'

তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ইলোরা, 'স্বীকার কোরো না, রফিক!'

কুয়াশা বলল, 'ডুবলেন তো! স্বীকার কোরো না…তার মানে কি? তার মানে স্বীকার করার না করার ব্যাপার আছে তাহলে? রফিক, স্বীকার করো আর নাই করো, লোদী সাহেবকে তোমরা দু'জনে মিলে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলে এটা কোর্টে প্রমাণিত হবেই। আমার কাছে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সুতরাং ইলোরাকে সাহায্য করার জন্যে তোমার অন্তত যাবজ্জীবন হবেই। ইলোরার হবে মৃত্যুদণ্ড।'

'ভয় দেখাচ্ছে! রফিক! খবরদার…'

কিন্তু রফিক কেঁদে ফেলল, 'ইলোরা, এখন কি হবে! লুকিয়ে রেখে আর লাভ কি, সবই তো এঁরা জানেন!'

পরমুহূর্তে কান্না সংবরণ করে নিল রফিক, বলল, 'ইলোরা, তুমিই এই সর্বনাশটা করলে নিজের! মেয়েটাকে খুন করে তুমি সব গণ্ডগোল করে ফেলেছ… এখন আর কিছু করার নেই আমার…নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে আমার এখন! কিছু এসে যায় না, আমি যদি কোর্টে সব বলে দিই, তাতে তোমাকে বিচারক এমনিতেও যে শাস্তি দিতেন সেই শাস্তিই দেবেন, মাঝখান থেকে লাভ হবে আমার, রাজসাক্ষী হয়ে রেহাই পেয়ে যাব আমি।'

কুয়াশা বলল, 'এবার তুমি থামো। উপস্থিত সকলকে আমি ব্যাখ্যা করে ব্যাপারটা জানিয়ে দেবার চেষ্টা করি।'

বিরতি নিয়ে কুয়াশা নতুন করে শুরু করল। 'প্রথম সমস্যা ছিল, এই রুমে দুটো আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে দু'বার গুলি করা হয়েছে। একটি গুলি পাওয়া যাচ্ছে, একটি গুলি পাওয়া যাচ্ছে না। রফিক আমাদেরকে বলে, সে আইভর-জনসন দিয়ে প্রথম গুলিটা করে। তার লক্ষ্য ব্যর্থ হয়। সেটা দেয়ালে বিদ্ধ হয়। দ্বিতীয় গুলিটা, স্বভাবতই ধরে নিতে হয়, ব্রাউনিং-এর। কিন্তু বুলেটটা কোথায়?'

সকলে মগ্ন, মুগ্ধ চিত্তে তাকিয়ে আছে কুয়াশার দিকে।

'দ্বিতীয় বুলেটটা আসলে জানালা গলে বাইরে চলে যায়। কিন্তু এর আগে মি. সিম্পসন এবং শহীদকে আমি বলেছি, এই রুমের ভিতর যেখানে ব্রাউনিং পাওয়া গেছে সেখান থেকে গুলি করলে বুলেট জানালা গলে বাইরে যেতে পারে না, যেতে হলে শূন্যে ছুটন্ত বুলেটকে বাঁক নিতে হবে। বুলেটের পক্ষে বাঁক নেয়া সম্ভব নয়।

তাহলে? ব্রাউনিংয়ের বুলেট জানালা গলে বাইরে গেল কিভাবে?'

থামল কুয়াশা। সকলের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। বলল, 'এই ধাঁধায় আমরা পড়ি, কারণ, রফিক প্রথম থেকেই মিথ্যে কথা বলছিল। সে বলে, আইভর-জনসন দিয়ে গুলি করে সে রুমে ঢুকেই। আমরাও তা বিশ্বাস করে নিই। কিন্তু কথাটা মিথ্যে। প্রকৃত ঘটনা ঘটেছিল এই রকম। রুমে রফিক ঢোকে দুটো আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে। ব্রাউনিং এবং আইভর-জনসন। ·৩৮ আইভর-জনসন দিয়ে নয়, রফিক প্রথম গুলি করে ·৩২ ব্রাউনিং দিয়ে। তার প্রথম গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। গুলি করেই সে ছুটে চলে যায় রুমের ওই পশ্চিম-উত্তর কোনায়, ফ্লাওয়ার ভাসে ফেলে দেয় ব্রাউনিংটা। তারপর দ্বিতীয় গুলিটা করে সে ·৩৮ আইভর-জনসন দিয়ে। দ্বিতীয় বারও সে ব্যর্থ হয়—দু'বারই ইচ্ছাকৃতভাবে। এবং দ্বিতীয় বুলেটটা বিদ্ধ হয় দেয়ালে। প্রথম বুলেটটা জানালা দিয়ে বেরিয়ে যায় বাইরে, বিদ্ধ হয় জানালার সাথে একই সরল রেখায় অবস্থিত কৃষ্ণচূড়া গাছের গায়ে। মি. সিম্পসন, আমি বলেছিলাম ফ্লাওয়ার ভাসের কাছ থেকে গুলি করলে বুলেটটা তির্যকভাবে বেরিয়ে বিদ্ধ হবার কথা গাছে, ফুটোটাও একটু তির্যক হবার কথা। কিন্তু গুলি ফ্লাওয়ার ভাসের কাছ থেকে করা হয়নি, করা হয়েছে এই রুমের মাঝখান থেকে, আপনি জানালা গলে রুমে ঢুকে রফিককে যেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন সেখান থেকে। আপনার পায়ের শব্দ পেয়ে ইতিমধ্যে সে ফ্লাওয়ার ভাসের কাছ থেকে ছুটে রুমের মাঝখানে চলে এসেছিল।'

প্রশ্ন করলেন ব্যারিস্টার, 'কিন্তু আপনার একটি কথা আমি বুঝতে পারছি না, মি. আহমেদ। আপনি বললেন দু'বারই রফিক ইচ্ছাকৃতভাবে লক্ষভ্রষ্ট হয়। কেন?'

কুয়াশা বলল, 'খুব সহজ কারণ। রুমে ঢুকে গুলি করতে যাবে, এমন সময় লোদী সাহেব জানালার দিক থেকে ঘুরে দাঁড়ালেন। রফিক দেখল লোদী সাহেব বুক চেপে ধরেছেন। রক্ত গলগল করে বেরিয়ে আসছে তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে। অর্থাৎ রফিক দেখতে পায়, লোদী সাহেব গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বুকে, সে গুলি করার আগেই।'

'তার মানে! কিভাবে তা সম্ভব?'

কুয়াশা বলল, 'বলছি। রফিক এবং মিস ইলোরা অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ হত্যা-পরিকল্পনা রচনা করেছিল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত অদৃষ্টের পরিহাসে তা ফেঁসে গেছে। গোড়া থেকেই বরং শুরু করি।'

একটু বিরতি নিয়ে কুয়াশা শুরু করল আবার, 'মোটিভ। রফিকের মোটিভ, সে ভালবাসে ইলোরাকে, বিয়ে করতে চায়—কিন্তু তার ভালবাসা এবং বিয়েতে সবচেয়ে বড় বাধা লোদী সাহেব। তাছাড়া অন্যায্য বিচার করে লোদী সাহেব তাকে বেত্রাঘাত এবং জেলের হুকুম দেয়ায় ব্যক্তিগত আক্রোশে অন্ধ হয়ে যায় সে। ইলোরার মোটিভ, তার স্টেপ-ফাদার লোদী সাহেব চাননি সে রফিকের সাথে মেলামেশা করুক। লোদী সাহেব বেঁচে থাকলে বিয়ে করা সম্ভব নয় রফিককে। দু'জনেই অসৎ সংসর্গে ওঠাবসা করে নষ্ট হয়ে গেছে। নিজেদের ইচ্ছা চরিতার্থ করার জন্যে ওরা পরিকল্পনা করে লোদী সাহেবকে খুন করার। রফিক জানত,

লোদী সাহেব খুন হলে সবার আগে পুলিস তাকে সন্দেহ করবে, কারণ সে কোর্টে সর্বসমক্ষে হুমকি দিয়েছিল লোদী সাহেবকে। কথাটা জানত ইলোরাও। তাই ওরা মাথা খাটিয়ে অদ্ভুত একটা পরিকল্পনা তৈরি করে। বাড়ির পিছন দিকের গেটের চাবি সরবরাহ করে ইলোরা রফিককে। ব্যারিস্টার মি. খানের ব্রাউনিং চুরি করেও দেয় সে রফিককে। ঠিক হয়, ব্যারিস্টার যেদিন বাড়িতে লোদী সাহেবের সাথে গল্প করতে আসবেন সেদিন রফিক আগ্নেয়াস্ত্র দুটো নিয়ে পিছনের গেট দিয়ে বাড়িতে ঢুকবে। রফিক খুন করবে লোদী সাহেবকে ব্রাউনিং ·৩২ ক্যালিবারের বুলেট দিয়ে। গুলি করে পশ্চিম দিকের জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে সে ব্রাউনিংটা, তারপর গুলি করবে ·৩৮ আইভর-জনসন দিয়ে, ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হবে সে, বুলেটটা বিদ্ধ হবে দেয়ালে। ওরা চেয়েছিল বাড়ির চাকরবাকররা যেন দেখতে পায় রফিক রেস্টহাউজের দিকে যাচ্ছে, তাহলে তারা পুলিসে খবর দেবে এবং হত্যাকাণ্ড ঘটে যাবার পর পুলিস এসে দেখবে রফিকের হাতে রয়েছে আইভর-জনসন ·৩৮ রিভলভার, কিন্তু ·৩৮ দিয়ে লোদী সাহেব খুন হননি। পোস্টমর্টেম হবার পর পাওয়া যাবে লাশের শরীরে ·৩২ ক্যালিবারের বুলেট—কিন্তু যে ব্রাউনিং দিয়ে বুলেটটা ছোঁড়া হবে সেটা পাওয়া যাবে না। ফলে রফিককে অভিযুক্ত করা সম্ভব হবে না পুলিসের পক্ষে। এই ছিল ওদের পরিকল্পনা। কিন্তু বাদ সাধল মি. সিম্পসন এবং কামাল।'

কুয়াশা বিরতি নিয়ে আবার বলল, 'এরপরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। রফিক ঘুর ঘুর করছিল রেস্টহাউজের আশপাশে প্রায় ঘণ্টা খানেক বা তারও বেশি সময় ধরে। পশ্চিম দিকের জানালা সহজে খোলা যায় কিনা পরীক্ষা করে সে। তার পায়ের শব্দ পেয়েছিলেন লোদী সাহেব এবং সিরু কাকা ওরফে সিরাজ সাহেব। কিন্তু পরীক্ষাটা ভাল করে করতে পারেনি সে। তাই ভাল করে পরীক্ষা করার জন্যে সে দক্ষিণ দিকের বন্ধ জানালায় ধাক্কা মারে। যাতে লোদী সাহেব রুমের বাইরে এসে শব্দের উৎস খোঁজেন। এই ফাঁকে পশ্চিম দিকের জানালা সহজে খোলা সম্ভব কিনা পরীক্ষা করার ইচ্ছা ছিল তার। ইলোরা সম্ভবত তাকে কথা দিয়েছিল, পশ্চিম দিকের জানালা খোলা থাকবে। কিন্তু লোদী সাহেব রুম থেকে বের হননি। তিনি চেয়ার ছেড়ে দক্ষিণ দিকের একটা জানালা খুলে উঁকি মেরে বাইরে তাকান একবার মাত্র, তারপর ফিরে গিয়ে বসেন আবার চেয়ারে। পশ্চিম দিকের জানালা খোলা সম্ভব কিনা পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ না পেয়ে, রফিক নার্ভাস হয়ে পড়ে, আরও নার্ভাস হয়ে পড়ে সে মি. সিম্পসন এবং কামালকে দেখে। বাড়ির চাকরবাকরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ইচ্ছা থাকলেও পুলিসের উপস্থিতি সে দুঃস্বপ্নেও আশা করেনি। সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ওদিকে, বাড়ি থেকে অনেক আগে বেরিয়ে গেলেও পিছনের গেট দিয়ে সকলের অগোচরে বাড়িতে ফিরে আসে ইলোরা। দারোয়ানের সাথে মি. সিম্পসন কথা বলছেন দেখে দিশেহারা হয়ে পড়ে সে। তার এমনিতেই সন্দেহ ছিল রফিক শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী সব ঠিকঠাক করতে পারবে কিনা। পুলিস দেখে তার বিশ্বাস হয়, রফিক ভয়ে সব গণ্ডগোল করে ফেলবে। কিছু একটা করা দরকার, তাই রেস্টহাউজের দিকে ছোটে ইলোরা।'

কুয়াশা বিরতি নিয়ে চুরুটে টান দিল।

'তারপর রেস্টহাউজের কাছাকাছি গিয়ে একটা গাছের আড়ালে আত্মগোপন করে ইলোরা। রফিক ঠিক কোথায়, জানত না সে। এদিকে পিছনে মি. সিম্পসন এবং কামাল। কামাল ছিল অনেক আগে, মি. সিম্পসন তার অনেক পিছনে। কামাল ইলোরাকে দেখতে পায়নি, পাশ কাটিয়ে রেস্টহাউজের দরজার দিকে চলে গেল সে। এই সময় রফিককে দেখতে পায় ইলোরা। রফিক তখন হলঘরে ঢুকে পড়েছে। ঠিক এই সময় লোদী সাহেব জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকান উঁকি দিয়ে। ইলোরা এই সুবর্ণ সুযোগটা কাজে লাগায়। এয়ার পিস্তল তুলে সে গুলি করে। লোদী সাহেব ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছেন, এমন সময় গুলি লাগে তাঁর বুকে। মি. সিম্পসন গুলির শব্দ পাননি, পাবার কথাও না, কারণ এয়ার পিস্তলটার শব্দ বিশেষ হয় না। ইলোরাকে তিনি দেখতেও পাননি, তার কারণ, গুলি করেই ইলোরা গাছগুলোর আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে সরে যায়। আজ কৃষ্ণচূড়া গাছের আশপাশে আমরা যে জুতোর ছাপ দেখি তা ইলোরারই, পাঁচ মন ওজনের কোন মহিলার নয়। পরে রুমের ভিতর কি ঘটছে না ঘটছে দেখার জন্যে ইলোরা ফিরে আসে, একই জায়গায় অনেকক্ষণ সময় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে মাটিতে অত গভীরভাবে ঢুকে যায় জুতো।'

ব্যারিস্টার জানতে চাইলেন, 'কিন্তু এয়ার পিস্তল এল কোত্থেকে ইলোরার কাছে?'

কুয়াশা বলল, 'বাবার কাছে টাকা চাইতে নয়, এয়ার পিস্তলটা চুরি করতে গিয়েছিল ইলোরা। আমরা শুনেছি, লোদী সাহেব নিজের কাজ নিজে করতে ভালবাসতেন। রেস্টহাউজে যখন যেতেন, নিজের হাতেই তৈরি করে নিতেন চা। ইলোরা সম্ভবত লোদী সাহেবকে বলেন, চা-এর সাজ সরঞ্জাম সব আছে কিনা কে জানে! এই ধরনের কোন কথা শুনে লোদী সাহেব এই রুম থেকে হলঘর সংলগ্ন অপর রুমে যান, অর্থাৎ ইলোরা তাঁকে কৌশলে পাঠান, এবং সেই ফাঁকে এয়ার পিস্তলটা চুরি করেন।'

'কিন্তু রফিক কেন খামকা দুটো গুলি করল?'

কুয়াশা বলল, 'রফিক গুলি করতে গিয়ে দেখল, লোদী সাহেব গুলিবিদ্ধ হয়েছেন সে গুলি করার আগেই। অন্তত, এক সেকেণ্ডের জন্যে হলেও দিশেহারা হয়ে পড়ে সে। ওদিকে কামাল দরজায় ধাক্কা মারছে, মি. সিম্পসন জানালার দিকে ছুটে আসছেন। চরম এই মুহূর্তে, সে সিদ্ধান্ত নেয়, পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী যা করা সম্ভব, করে যাবে সে। ব্রাউনিং দিয়ে জানালার বাইরে গুলি করে পশ্চিম দিকের জানালার দিকে ছুটে যায় সে। কিন্তু জানালা খুলতে না পেরে ফ্লাওয়ার ভাসে ফেলে দেয় ব্রাউনিংটাকে।'

ইলোরা চিৎকার করে উঠল, 'সব মিথ্যে কথা! রফিকের সাথে এমন ভয়ঙ্কর কোন পরিকল্পনা আমি যদি করি, তাহলে জানালা খোলার ব্যবস্থা আগে করলাম না কেন?'

দারোয়ান রমজান কথা বলে উঠল, 'বড় বেগমসাহেবা, আপনাকে আমি মিথ্যে

কথা বলেছিলাম।'

হাঁটু দুটো কাঁপছে ঠক ঠক করে রমজানের। ইলোরার দিকে নয়, কথা বলল সে কুয়াশার দিকে তাকিয়ে।

'তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই, রমজান। যা সত্য বলো।'

রমজান বলল, 'বড় বেগমসাহেবাকে আমি মিথ্যে কথা বলেছিলাম। উনি আমাকে দশটা টাকা বকশিশ দিয়ে হুকুম করেন, পশ্চিম দিকের একটা জানালা খোলার ব্যবস্থা করে রাখতে। কিন্তু কাজটা করতে গিয়ে আমি ধরা পড়ে যাই। সাহেব আমাকে মারতে আসেন ছড়ি উঁচিয়ে। কিন্তু দশটা টাকার দরকার ছিল বলে আমি বড় বেগমসাহেবাকে গিয়ে বলি, জানালা খোলার ব্যবস্থা করে এসেছি। উনি আমাকে কোরান শরীফ ছুঁইয়ে বলিয়ে নেন, আমি কাউকে একথা বলব না। কিন্তু এখন না বলে পারলাম না, আমি, হুজুর। কারণ সাহেব আমাকে ভালবাসতেন, হুজুর।' ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল রমজান।

কুয়াশা বলল, 'পশ্চিম দিকের জানালার বাইরে ভিজে মাটিতে দশ নম্বর জুতোর দাগ, এটাও রফিকের কাণ্ড। দশ নম্বরের জুতো সে পায়ে দিয়ে লাফ দিয়ে জানালার সামনে যায়, ফেরার সময় স্বাভাবিকভাবে হেঁটে আসে। যাতে পুলিস জুতোর দাগ দেখামাত্র ধরে নেয় জানালা গলে খুনী পালিয়ে গেছে। কিন্তু রফিক তখনও জানত না, জানালাটা খোলাই সম্ভব নয়, খোলার কোন ব্যবস্থা হয়নি।'

'দশ নম্বর জুতো পায়ে দেবার কারণ?'

'কারণ মি. সরফরাজ খানের ওপর পুলিসের সন্দেহ ডাইভার্ট করা। মি. খান, আপনি কত নম্বর জুতো পরেন?'

'দশ নম্বর।'

কুয়াশা বলল, 'শুধু তাই নয়, ইলোরা আপনার ব্রাউনিংও চুরি করে রফিককে দেয় ওই একই কারণে।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'মিস ইলোরার সাথে হেলেনা মোমতাজের শত্রুতার কারণ কি? হেলেনা মোমতাজ কেন খুন হলো?'

কুয়াশা বলল, 'সুন্দর অভিনয় ছিল ওটা মিস ইলোরার, ব্ল্যাকমেলার আমিন খসরুকে জড়িয়ে চিঠি সংক্রান্ত আজগুবি কাহিনীর কথা বলছি আমি। পরিকল্পনা অনুযায়ী ইলোরাকে ফোন করে রফিকই। ইলোরা ভান করেন যেন আমাদেরকে তিনি জানতে দিতে চান না কোথায় ছিলেন হত্যাকাণ্ডের সময়। কেননা ব্যক্তিগত ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। কিন্তু কৌশলে শেষ পর্যন্ত সবই তিনি জানান আমাদেরকে। তিনি জানতেন তার অ্যালিবাই সঠিক কিনা তা আমরা খোঁজ নিয়ে দেখব, এবং তাই তিনি চাইছিলেন। একটা জিনিস, মি. সিম্পসন, নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, হেলেনা মোমতাজ এবং মিস ইলোরা দেখতে অনেকটা একই রকম। অমিলের চেয়ে দু'জনের চেহারার মধ্যে মিলই বেশি। লম্বায় দু'জন সমান, গায়ের রঙ দুজনেরই ফর্সা, দু'জনই মেদহীন। চেহারার এই সাদৃশ্য দেখেই ইলোরা নির্ধারিত করে হেলেনাকে। এবং উপযুক্ততা পরীক্ষা করার ছলে তাকে বলে—"আপনি কতটা বুদ্ধিমতী বা কাজের মেয়ে তা প্রমাণ করার জন্যে এই

কাজটা করতে হবে। আপনি পাঁচটার দিকে এলাহী রোডে যাবেন, বত্রিশ নম্বরটা খুঁজে বের করবেন, যাকে পাবেন জিজ্ঞেস করবেন ইলোরা লোদীর নামে কোন চিঠি আছে কিনা।" চাকুরি পাবার জন্যে কাজটা করতে রাজি হয় হেলেনা। এইভাবে ইলোরা নিজের অ্যালিবাই তৈরির চেষ্টা করে।'

'এই। পড়ল…!'

শব্দ করে কেঁদে উঠল শাহানারা। ফোঁপাতে শুরু করল সে।

ইলোরা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেছে হঠাৎ। ব্যারিস্টার সরফরাজ খান ধরতে গিয়েও ধরেননি।

কুয়াশা বলল, 'মি. খান, আপনি বোকার মত একটা মিথ্যে কথা বলেছিলেন।'

'জানি। বলেছিলাম, আমার চেম্বার থেকে বেরুবার আর কোন পথ নেই, আউটার রুমের ভিতর দিয়ে ছাড়া। এখন বলতে পারি, কেন বলেছিলাম মিথ্যে কথাটা।'

ব্যারিস্টার হাসলেন। তারপর আবার শুরু করলেন, 'প্রথমে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, আপনারা কাকে সন্দেহ করছেন। শাহানারাকে সন্দেহ করছেন বলে মনে হয়েছিল, তাই আপনাদের সন্দেহের দৃষ্টি সাময়িকভাবে আমার ওপর ফেলতে চেয়েছিলাম আমি। আসলে, আমি নিজেও শাহানারাকে সন্দেহের বাইরে ফেলতে পারছিলাম না।'

'হত্যাকাণ্ডের সময়, কি করছিলেন আপনি?'

ব্যারিস্টার হাসতে হাসতে বললেন, 'আই. জি. সাহেবের সাথে ফোনে আলাপ করছিলাম।'

কুয়াশাও হাসল, 'বুঝেছি। আপনার অ্যালিবাইটা অরিজিন্যালি এয়ারটাইট ছিল, মিথ্যে কথাটা ধরা পড়লেও ভয়ের কিছু ছিল না আপনার। দরকারের সময় প্রকৃত সত্য প্রমাণ করতে পারতেন আপনি।'

'ঠিক তাই।'

কুয়াশা তাকাল শহীদের দিকে, 'কোন প্রশ্ন?'

শহীদ উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে বলল, 'নো, মি. ডিটেকটিভ।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'মি. আহমেদ, আসলে আপনি কে বলুন তো? নিজেকে লে-ম্যান বলেন—কে আপনি?'

কুয়াশা বলল, 'আপনিই বলুন না আমি কে?'

কামাল দরজার কাছ থেকে বলে উঠল, 'কে আবার, কুয়াশা!'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন মি. সিম্পসন। তারপর হাসি থামতে, কুয়াশার ডান হাতটা দু'হাত দিয়ে ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললেন, 'এমন কি, আপনি কুয়াশা হলেও আপনার বুদ্ধি এবং প্রতিভার প্রশংসা করব আমি। আপনি কুয়াশা না হলেও তার চেয়ে কম কিসে!'

কুয়াশা বলল, 'শহীদ, আমাকে এবার যেতে হয়। মহুয়া বোধহয় দড়ি নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, আমাকে দেখলেই বেঁধে ফেলবে।'

কথাটা বলে অপ্রত্যাশিতভাবে লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেল সে রুম থেকে।

মি. সিম্পসন হঠাৎ পাথরের মত স্থির হয়ে গেছেন, ভুরু কুঁচকে কি যেন চিন্তা করছেন। তারপর, খানিক পর, চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'শহীদ, কে ও?'

শহীদ বলল, 'মানে? কি বলছেন? কার কথা জিজ্ঞেস করছেন?'

'মি. এনাম আহমেদ—কে ও? মিসেস মহুয়াকে মহুয়াদি না বলে মহুয়া বলল কেন?'

শহীদ হাসি চাপবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না।

'হাসছ তুমি? শহীদ…ও…কে?'

শহীদ বলল, 'অনেক দেরিতে বুঝেছেন আপনি, মি. সিম্পসন। ও আপনাকে শেষ বেলায় নিজের পরিচয় দেবার জন্যে ইচ্ছে করেই মহুয়াকে মহুয়া নামে সম্বোধন করেছে। আপনি লক্ষ করেছেন, আপনার সামনে এর আগে ও মহুয়াকে মহুয়াদি বলে সম্বোধন করেছে।'

মি. সিম্পসন লাফিয়ে উঠলেন, 'মাই গড! কিন্তু এও কি সম্ভব! কুয়াশা…! অ্যাই, সেপাই…কে কোথায় আছিস…!'

ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে কুয়াশা।

— o —

কুয়াশা ৬৯

প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ১৯৭৭

এক

অস্ট্রেলিয়াকে বাদ দিলে, ইউরোপ হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট মহাদেশ। শরীরের মাপ, পৌনে চার মিলিয়ন স্কয়ার মাইল। এশিয়ার তুলনায় ইউরোপ খুবই রোগা পাতলা, কুয়াশার তুলনায় যেমন ডি. কস্টা। নিজের গায়ে অমন সাড়ে চারটে ইউরোপকে ঠাঁই দিতে পারে এশিয়া।

ইউরোপের মধ্যমণি হলো সুইটজারল্যাণ্ড। সুইটজারল্যাণ্ড একটি বাফার-স্টেট, যার কোন সশস্ত্র সেনাবাহিনী নেই, যে কিনা সারা দুনিয়ার সাথে অলিখিত চুক্তি করে পরম সদিচ্ছার পরিচয় দিয়েছে, কারও সাথে ঝগড়া-বিবাদ-যুদ্ধ-ফ্যাসাদে নিজেকে জড়াবে না। স্বাধীন একটি নিরীহ দেহ, শান্তিকামী মানুষদের বসবাস। অধিবাসীদের ভাষা, কালচার এবং জাতিগত বৈশিষ্ট্য একরকম নয়, প্রধানত তিন রকম। ল্যাটিন থেকে উৎপন্ন মিশ্র ভাষায় কথা বলে কেউ, জার্মান যাদের মাতৃভাষা এমন লোকের সংখ্যাও কম নয় আবার ফ্রেঞ্চ ভাষাভাষী লোকও প্রচুর সেখানে। শিক্ষিতরা অবশ্য তিন ভাষাতেই কথা বলতে পারেন। এবং অশিক্ষিত লোক সেখানে এতই কম যে এক-আধজনের খোঁজ পেতে হলে সার্চ-পার্টি গঠন করে অভিযান পরিচালনা করা ছাড়া উপায় নেই।

ইউরোপ ভ্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে দেশ থেকে বেরিয়ে এই সুইটজারল্যাণ্ডেই প্রথম পা ফেলল কুয়াশা।

দীর্ঘ কয়েক বছর একনাগাড়ে গবেষণার কাজ করে সত্যি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল কুয়াশা। তবু মহুয়ার মত একটি বোন ছিল বলে রক্ষে, তা না হলে কাজ করতে করতেই সে নিঃশেষ হয়ে যেত এতদিনে। মহুয়া দু'চার মাস অন্তর অন্তরই কোমরে শাড়ি পেঁচিয়ে চড়াও হয় তার আস্তানায়, গ্রেফতারী পরোয়ানাসহ। কুয়াশাকে টেনেহিঁচড়ে, চোখ রাঙিয়ে, কখনও বা হাতে-পায়ে ধরে ল্যাবরেটরির চার দেয়ালের বন্দীখানা থেকে মুক্ত করে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যায়। যে-ক'দিন মহুয়াদের বাড়িতে থাকে কুয়াশা, বিশ্রাম না নিয়ে উপায় নেই তার। সীমানা চিহ্নিত করে দেয় মহুয়া। বেডরুম থেকে বেরিয়ে ড্রয়িংরুমে যেতে হলেও আবেদন জানাতে হবে। শহীদ বা কামালের সাথে গল্প করতে হলেও অনুমতি নিতে হবে। ছোট্ট, অসহায়, শিশুর মত হয়ে থাকতে হয় সেই ক'দিন কুয়াশাকে। ঘড়ি দেখে খেতে হয়। খেতে হয় বিপুল পরিমাণে। ধূমপান প্রায় বন্ধ রাখতে হয়। রেশনিং অর্ডার জারি করে

মহুয়া। সারা দিন মাত্র একটি হ্যাভানা চুরুট, এইরকম হাজারো আইন-কানুনের মধ্যে থেকে অল্প ক'দিনেই কুয়াশা আবার শারীরিক এবং মানসিক দিক থেকে তাজা হয়ে ওঠে। তবু কি মুক্তি আছে বোনটির স্নেহ-মায়া-মমতার বন্ধন থেকে? নেই। কুয়াশাকে অবতীর্ণ হতে হয় ভিক্ষুকের ভূমিকায়। নিজের মুক্তি ভিক্ষা করে সে। এন্তার প্রশংসা করে মহুয়ার গুণের, লোভ দেখায় আনতারায় নিয়ে যাব বলে, জড়োয়া সেট কিনে দেয়, প্রতিজ্ঞা করে নিজের আস্তানায় ফিরে গিয়েও সে মহুয়ার জারিকৃত নিয়ম-কানুন প্রতিপালন করতে অবহেলা করবে না। এত করেও সে মহুয়ার মন গলাতে পারে না। শেষে সে সাহায্য প্রার্থনা করে কামাল এবং শহীদের। তিনজনে চলে গোপন শলাপরামর্শ।

মোট কথা, অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে অবশেষে মুক্তি পায় কুয়াশা। ফিরে যায় নিজের আস্তানায়। ডুবে যায় আবার গবেষণার কাজে।

কিন্তু এবার হয়েছে অন্যরকম। বছর তিনেক ধরে মানবদেহের সেল নিয়ে গবেষণা করার পর কুয়াশা আবিষ্কার করে গোড়ায় ছোট্ট একটা গলদ ছিল বলে এতদিন সে ভুল একটা থিওরির উপর খেটেছে। ফলে মানসিক দিক থেকে বেশ একটু সুস্থ হয়ে পড়ে সে। কাজকর্মে মন বসে না তারপর থেকে। গবেষণাটা ছিল মানবজাতিকে অনন্তযৌবন অর্থাৎ অমরত্ব দান করার জন্যে একটি যুগান্তকারী মেডিসিন আবিষ্কার করা। তিন বছরের সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় ভেঙে পড়ে কুয়াশা। কারও সাথে দেখাসাক্ষাৎ না করে আস্তানার মধ্যে নিজেকে বন্দী করে রাখে বেশ অনেকদিন।

কুয়াশার মানসিক অবস্থার কথা প্রথমে টের পায় রাজকুমারী ওমেনা। গবেষণায় সে কুয়াশাকে সাহায্য করেছে অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে। ডি. কস্টা খবরটা পায় তার কাছ থেকেই।

ডি. কস্টা এবং ওমেনা দীর্ঘ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়, কুয়াশাকে বিদেশে নিয়ে যেতে হবে, হাওয়া বদলানো দরকার। কোথায় যাওয়া যায়? ওরাই ঠিক করে, সুইটজারল্যাণ্ড হলো আদর্শ জায়গা।

সব ঠিকঠাক করে ওমেনা এবং ডি. কস্টা কুয়াশা সমীপে তাদের সিদ্ধান্তের কথা জানায়। কুয়াশা সব শুনে মৃদু হাসে। বলে, 'ঠিক। হাওয়া বদল দরকার। চলো তাহলে, ইউরোপটা ঘুরে আসি।'

রওনা হবার আগে ওমেনা কয়েকটি শর্ত দেয় কুয়াশাকে। শর্তগুলো নিম্নরূপ।

১। এই ভ্রমণকে নির্ভেজাল ভ্রমণ বলে মনে করতে হবে।

২। কুয়াশা পুরানো কোন বন্ধু-বান্ধবের সাথে দেখা করতে চেষ্টা করবে না।

৩। ইউরোপে একাধিক শত্রু আছে কুয়াশার, তাদের সাথে নতুন করে বিবাদ বাধাবার চেষ্টা করতে পারবে না সে।

৪। চোখের সামনে যাই ঘটুক, যত বড় অন্যায়ই সংঘটিত হোক, কুয়াশা নিজেকে সে-ঘটনার সাথে জড়াতে পারবে না।

৫। নিজের পরিচয় সে কোথাও প্রকাশ করতে পারবে না।

চার নম্বর শর্তটি ছাড়া বাকি সব শর্ত মেনে নিয়েছে কুয়াশা। চার নম্বর শর্ত সম্পর্কে তার বক্তব্য, অন্যায় ঘটতে দেখলে নীরব দর্শক হয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সে-রকম কোন কিছু ঘটলে, সেই ঘটনার সাথে নিজেকে জড়াবার আগে ওমেনা এবং ডি. কস্টার অনুমতি চাইবে সে।

ভার্সেই থেকে জেনেভা, জেনেভা থেকে জুরিখ। তিন মাস কাটল নিরুপদ্রবেই। কোথাও কোন বিশেষ ঘটনা ঘটল না। মাউন্ট ব্লাঙ্কের উপর হোটেলে রইল ওরা পুরো দেড় মাস। জেনেভায় পনেরো দিন। জুরিখে একমাস। সুইটজারল্যাণ্ড ত্যাগ করল ওরা এরপর। ঢুকল অস্ট্রিয়ায়।

আকারে অস্ট্রিয়া সুইটজারল্যাণ্ডের দ্বিগুণ। আলপ্‌স্ পর্বত এই দুই দেশেই আছে। তবে অস্ট্রিয়ায় আলপ্‌স্ তেমন উঁচু নয়। অস্ট্রিয়ান আলপ্‌সে বিখ্যাত কয়েকটি গ্লেসিয়ার আছে। গ্রোস গ্লোকনার গ্লেসিয়ারটি তো খুবই নামকরা।

আল্‌প্‌সের নিম্নদেশ গভীর বনভূমিতে ঢাকা।

ইন্‌স্‌ব্রুক অস্ট্রিয়ার বেশ বড় শহর। জার্মান সীমান্তের বেশ কাছে। সারা বিশ্বের ভ্রমণ-বিলাসীদের কাছে ইন্‌স্‌ব্রুকের খ্যাতি আছে। এই ইন্‌স্‌ব্রুকেই পদধূলি ফেলল কুয়াশা। সাথে রাজকুমারী ওমেনা। এবং রসিক সহকারী স্যানন ডি. কস্টা।

ইন্‌স্‌ব্রুক বনভূমির মাঝখানে একটা শহর। শহরের ভিতর গাছপালার এমন সমারোহ যে দেখে মনে হয় এটা শহর নয়, গ্রাম। শহরে চওড়া কংক্রিটের রাস্তা আছে, দশ-বিশ তলা উঁচু বিল্ডিং আছে, ট্রাম আছে, গাড়ি-ঘোড়া সব আছে—সেই সাথে আছে পাঁচ-সাত হাত পর পর হাজার হাজার আকাশে মাথা তুলে দাঁড়ানো বৃক্ষ।

টেরল। শহর থেকে খুব বেশি একটা দূরে নয় জায়গাটা। রাত তখন শেষ হতে অনেক দেরি। মাত্র আড়াই কি তিনটে বেজেছে। শীতকাল। পাশ্চাত্যের শীত যে কি জিনিস হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিল ডি. কস্টা। গেঞ্জি, দুটো উলেন সোয়েটার, কোট এবং কোটের উপর ওভারকোট পরেছে সে। তা সত্ত্বেও ঠক ঠক করে কাঁপছে হাড়গুলো।

'কেমন জব্দ! ঘড়ির কাঁটা আর ঘোরাবেন কখনও?' কথায় বলে মেয়েদের শীত কম লাগে, তার উপর ওমেনা অন্য গ্রহের মেয়ে, শীত সহ্য করবার অদ্ভুত ক্ষমতা তার।

ওমেনার কথা শুনে রাগ হলেও ডি. কস্টা ঠোঁট দুটো ফাঁক করার অর্থাৎ কথা বলবার কোন চেষ্টাই করল না। ঠোঁট ফাঁক করলেই মুখের ভিতরটা হিম হয়ে যাবার ভয় আছে।

ওমেনার পাশে কুয়াশা। মৃদু হেসে তাকাল সে ডি. কস্টার দিকে। ওভারকোটের পকেট থেকে একটা পেট মোটা বোতল বের করে নিঃশব্দে ডি. কস্টার দিকে বাড়িয়ে দিল।

গর্বিত এবং বিজয়ীর ভঙ্গিতে তাকাল ডি. কস্টা ওমেনার দিকে। ওভারকোটের পকেট থেকে হাত বের করে বোতলটা নিয়ে ছিপি খুলল। ঢক ঢক করে দু'চার

ঢোক ব্র্যাণ্ডি গিলে বোতলটা কুয়াশাকে ফিরিয়ে না দিয়ে নিজের ওভারকোটের পকেটে চালান করে দিল সে সযত্নে।

'দেখবেন, বিদেশ-বিভূঁইয়ে আবার মাতলামো শুরু করবেন না। বোতলটা বরং ফিরিয়ে দিন। এ দেশের পুলিস মাতাল দেখলে পিটিয়ে লাশ বানিয়ে ছাড়ে!'

ডি. কস্টা ব্র্যাণ্ডি পান করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বেশ একটু। বলল, 'বিডেশ? এটা ইউরোপ, ম্যাডাম। হাপনাডের জন্য বিডেশ হইটে পারে, হামার জন্য নহে। ইউরোপিয়ানরা হামার জাট ভাই! পুলিস বলুন আর মিলিটারিই বলুন, পরিচয় ডিলে ডেখা যাইবে মামাটো ফুফাটো ভাই-টাই হবে সে হামার।'

হাসি চাপতে পারল না ওমেনা।

প্রশস্ত রাস্তা। লোকজনের বা যানবাহনের কোন চিহ্ন নেই কোথাও। আঁকাবাঁকা রাস্তা, তাই খুব বেশি দূর দেখা যায় না। তার উপর বেশ গাঢ় কুয়াশা। লাইট-পোস্টের মাথায় টিউব লাইট জ্বলছে। রাস্তার দু'পাশে গাছপালা। গভীর জঙ্গল বলেই ভ্রম হয়। অস্ট্রিয়া হলো গাছপালারই দেশ।

কুর্কাঞ্জা হোটেলে বিকেল তিনটেয় উঠেছিল ওরা। ক্লান্তি বশত সাড়ে তিনটের সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল সবাই। ঘুম ভাঙে সাড়ে ন'টায়। খেয়েদেয়ে আবার ঘুম। রাত দুটোয় ঘুম ভাঙে ডি. কস্টার। দীর্ঘ সময় ঘুমোবার পর আর ঘুম আসার কথা নয়। অথচ এদিকে রাত মাত্র দুটো। মর্নিং ওয়াকের সময় হয়নি এখনও। ডি. কস্টার ভারি ইচ্ছা হচ্ছিল বাইরে বেরিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করার। কিন্তু কুয়াশা এবং ওমেনাকে এই গভীর রাতে বাইরে যাবার প্রস্তাব দিলে সে প্রস্তাব নাকচ হয়ে যাবে, জানত সে। তাই, তিনটে ঘড়িরই কাঁটা ঘুরিয়ে দেয় সে। তারপর ঘুম থেকে ওঠায় ওমেনাকে। ডি. কস্টা তাকে বলে, 'সাড়ে চারটে বাজে, মর্নিং ওয়াকের সময় হয়েছে।'

সন্দেহ জাগবার কথা নয় ওমেনার। তার হাতের হাতঘড়িও সময় নির্দেশ করছে, 'সাড়ে চারটে। কুয়াশাকে ডেকে তোলে সে।'

কাপড়-চোপড় পরে বেরিয়ে পড়ে ওরা সবাই। হাঁটতে হাঁটতে হোটেল ছেড়ে বেশ দূরে চলে আসে ওরা। ঘণ্টাখানেক কাটে। অদূরের গির্জা থেকে হঠাৎ ঘণ্টাধ্বনি হয়। ঢং ঢং-ঢং। রাত তিনটে।

কিন্তু ওদের প্রত্যেকের ঘড়িতে তখন সাড়ে পাঁচটা।

ডি. কস্টার ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে যায়। খেপে ওঠে ওমেনা। কিন্তু কুয়াশা শুধু হাসে।

আসলে কুয়াশার রিস্টওয়াচের কাঁটা যখন ঘোরাতে শুরু করে ডি. কস্টা, কুয়াশা তখন জেগেই ছিল। নরম বিছানায় শুয়ে থাকার ইচ্ছা তারও ছিল না। ডি. কস্টার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে সে তাই আর কোন উচ্চবাচ্য করেনি।

হাঁটছে ওরা।

'দু'একদিনের মধ্যে বরফ পড়া শুরু হবে,' বলল কুয়াশা। কথাটা শেষ করেই দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পিছন দিকে।

কুয়াশার দেখাদেখি ওরা দু'জনও তাকাল পিছন দিকে। গাঢ় কুয়াশা। বিশ পঁচিশ হাত দূরের জিনিস দেখা যায় না।

পিছন দিকে কোন কিছু দেখতে না পেয়ে ডি. কস্টা এবং ওমেনা তাকাল কুয়াশার মুখের দিকে।

কুয়াশা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পিছন দিকেই।

'কি দেখছ তুমি?' ওমেনার প্রশ্ন।

কুয়াশা চোখের পাতা না ফেলে একই ভঙ্গিতে তাকিয়ে থেকে উত্তর দিল, 'পায়ের শব্দ পাচ্ছি। কেউ এদিকে আসছে।'

রাস্তার একপাশে সরে গেল কুয়াশা। ওমেনা এবং ডি. কস্টাও। আরও পাঁচ-সাত সেকেণ্ড কেটে গেল। তারপর অস্পষ্ট একটা ছায়ামূর্তিকে দেখতে পেল ওরা। প্রশস্ত রাস্তার বিপরীত দিকের ফুটপাথ ধরে হন হন করে এগিয়ে আসছে লোকটা। যে-কোন কারণেই হোক, ব্যস্ত দেখাচ্ছে তাকে। হয় ব্যস্ত, না হয় ভয়তাড়িত। মাঝে মাঝেই সে পিছন ফিরে তাকাচ্ছে। হাঁটার ভঙ্গিটা এমনই যে দেখে মনে হয় যে-কোন মুহূর্তে লোকটা দৌড়ুতে শুরু করতে পারে।

রোগা পাতলা, একহারা চেহারা লোকটার। ডান হাতে ধরা একটা অ্যাটাচিকেসের হাতল। কেউ লক্ষ না করলেও কুয়াশার দৃষ্টি এড়াল না, অ্যাটাচিকেসের হাতলের সাথে বাঁধা লোহার শিকলের সাথে লোকটার ডান হাতের কব্জি বাঁধা। কেউ যাতে অ্যাটাচিকেসটা ছিনিয়ে নিতে না পারে তাই এই শিকলের ব্যবহার।

কুয়াশার মনে প্রশ্ন জাগল, কি আছে ওই অ্যাটাচিকেসে?

পা বাড়াবে কি বাড়াবে না মনস্থির করতে পারছিল না কুয়াশা। ওমেনা চাপাস্বরে বলে উঠল, 'না। শর্তের কথা মনে নেই বুঝি? অকারণ কোন ঝামেলায় তোমার জড়ানো চলবে না।'

মৃদু হেসে কুয়াশা বলল, 'তথাস্তু।'

লোকটা এর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। গাঢ় কুয়াশা গ্রাস করেছে তাকে।

ডি. কস্টা ছোট্ট একটা লাফ দিল। ওমেনার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে, মুখোমুখি, 'বাট, হামার উপর কোন নিষেঢাজ্ঞা নাই। হামি লোকটাকে গিয়া জিজ্ঞেস করিটে পারি, বাডার, কি আছে টোমার অ্যাটাচিকেসে? কেনই বা টুমি অমন ভয় পাইটেছ?'

ওমেনা গম্ভীরভাবে বলল, 'না।'

'না কেন? হামার স্বাটীনটা হামি বিক্রি করিয়া ডিই নাই!'

কুয়াশা সকৌতুকে মন্তব্য করল, 'মিস্টার ডি. কস্টার কথায় যুক্তি আছে।'

ওমেনা বলল, 'লোকটা ইতিমধ্যে অনেকদূর চলে গেছে। তাকে আর ধরা সম্ভব নয়।'

'হু নোজ! হয়টো লোকটা কোন বিপডে পড়িয়া অমন পাগলের মটো ছুটিটেছে। টাকে হয়ট হামরা সাহায্য করিটে পারিটাম। অসহায়, হেল্‌পলেস

মানুষকে সাহায্য করা হামাডের ব্রট, টাই না,বস্?'

'তাই।' কুয়াশা সায় দিল।

ডি. কস্টা মুষ্টিবদ্ধ হাত মাথার উপর তুলে বক্তৃতা দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'নারী জাটিই সকল সর্বনাশের মূল।'

কথা বলতে বলতে হাঁটছিল। আঁকাবাঁকা রাস্তা। মিনিট খানেকও হয়নি, বাঁক নিয়ে অদূরেই একটা পাকা ব্রিজ দেখতে পেল ওরা।

ব্রিজের উপর চোখ পড়তেই পাথরের মূর্তিতে পরিণত হলো ওরা তিনজন।

ব্রিজটা মাত্র হাত পনেরো কি বিশ দূরে। ব্রিজের উপর চারজন লোক ধস্তাধস্তি করছে। রোগা পাতলা একহারা চেহারার সেই লোকটা আক্রান্ত হয়েছে। হাত-পা ছুঁড়ে নিজেকে রক্ষা করবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে। বাকি তিনজন আক্রমণকারী মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে লোকটাকে কাবু করতে।

কুয়াশা তাকাল ডি. কস্টার দিকে। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওমেনার দিকে।

গম্ভীর ভাবে কিছু বলতে গিয়েও বলল না ওমেনা।

কুয়াশা পা বাড়াল। সেই সাথে ডি. কস্টা এবং ওমেনাও। মারামারিতে অংশগ্রহণ করবার কোন লক্ষণ অবশ্য ডি. কস্টার মধ্যে দেখা গেল না। কুয়াশাকেও তেমন চঞ্চল বলে মনে হলো না।

একজন নিরীহ ও দুর্বল গোছের লোককে তিনজন কুস্তিগীর টাইপের লোক কাবু করবার চেষ্টা করছে।

'এটা অন্যায়,' কুয়াশা মন্তব্য করল। মাত্র আট দশ হাত দূরে ঘটনাটা ঘটছে। চারজনের কেউই ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। কোন দিকে তাকাবার ফুরসতই নেই তাদের।

ডি. কস্টা প্রশংসা করল, 'বাহাদুর লোক। একা কেমন টিনজনকে সামলাচ্ছে!'

ওমেনা বলল, 'যান, ওকে গিয়ে সাহায্য করুন।'

কুয়াশা বলল, 'আমি যাব।'

ওমেনা আবারও কিছু বলতে গিয়ে বলল না। এই রকম পরিস্থিতিতে কুয়াশাকে বাধা দেয়াটা উচিত হবে না, বুঝতে পারছে ও। একজন লোক মার খাচ্ছে বেদম, কুয়াশা তা দেখবে নির্বিকার চিত্তে, এরকমটি কক্ষনও আশা করা যায় না। ওমেনা জানে, এখন বাধা দিলে কাজ হবে না। কুয়াশা মানবে না তার বাধা।

'কি বলো, তুমি?'

ওমেনা অনুমতি দিল, 'যাও। কিন্তু মনে রেখো, জড়িয়ে পড়তে পারবে না। ওদেরকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে যদি থামাতে পারো—দেখো!'

কুয়াশা এগোল। দুর্বল লোকটাকে ধরাশায়ী করে ফেলেছে আক্রমণকারীরা ইতিমধ্যে। একজন লোকটার বুকের উপর উঠে বসে আছে। আর একজন লোকটার পা দুটো দু'হাত দিয়ে ধরে রেখেছে। শেষ জন লোকটার নাকে-মুখে ঘুসি

মারতে ব্যস্ত।

নিজেকে রক্ষার জন্যে দুর্বল লোকটা এখনও ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছে।

লোকটা সাহায্যের জন্যে চিৎকার করছে না লক্ষ করে খুবই আশ্চর্য বোধ করল কুয়াশা। কাছাকাছি গিয়ে থামল সে। বজ্র কণ্ঠে হুকুম করল। 'থামো!'

জার্মান ভাষায় ধমক খেয়ে আক্রমণকারীরা একযোগে মুখ তুলে তাকাল। ওভারকোটে ঢাকা, হ্যাট পরিহিত কুয়াশার দীর্ঘকায় মূর্তির দিকে লোক তিনজন চেয়ে রইল ঝাড়া পাঁচ সাত সেকেণ্ড। তারপর, যে লোকটা ঘুসি মারার কাজে ব্যস্ত ছিল, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। দুই হাত একত্রিত করে শূন্যে তুলল সে। কুয়াশার মুখের উপর আঘাত করার ইচ্ছা।

লোকটা যেমন কুৎসিত দেখতে তেমনি ষাঁড়ের মত দেহ তার। তাকে সাহায্য করবার জন্যে আরও একজন এগিয়ে এল। দুর্বল লোকটার পা দুটো ছেড়ে দিয়ে এই দ্বিতীয় আক্রমণকারী কুয়াশার দিকে লাফ দিল বিপুল বিক্রমে।

কুয়াশা তার মুখোমুখি দাঁড়ানো এক নম্বর শত্রুর উদ্যত হাতের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বাঁ হাত দিয়ে প্রচণ্ড এক ঘুষি মারল লোকটার চোয়ালে। যন্ত্রণাক্ত শব্দ করে লোকটা ছিটকে গিয়ে পড়ল ব্রিজের রেলিংয়ের গায়ে।

দ্বিতীয় শত্রু লাফ দিলেও কুয়াশার কাছে পৌঁছুতেই পারল না সে। লাফ সে ঠিকই দিয়েছিল। কিন্তু ডি. কস্টার বাড়িয়ে দেয়া ডান পায়ের ধাক্কা খেয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল সে কংক্রীটের উপর, কুয়াশার পায়ের কাছে।

কুয়াশা হাত তুলে নিষেধ করল ডি. কস্টাকে, সে যেন মারামারিতে অংশগ্রহণ না করে। মৃদু হেসে ওমেনার দিকে তাকাল কুয়াশা। ওমেনার দিকে তাকিয়ে থাকার সময় আছাড় খেয়ে পড়া লোকটার বুকের উপর একটা ভারি পা তুলে দিয়ে চাপ দিল সে।

নিষেধাজ্ঞা জারি করল ওমেনা বাঁ পাশ থেকে, 'চাপ বাড়িয়ো না আর। পাঁজরগুলো ভেঙে গেলে বিচার হবে তোমার!'

দুই

নিরীহ গোছের লোকটা সম্ভবত জ্ঞান হারিয়েছে। তার বুকের উপর যে লোকটা বসে ছিল সে এতক্ষণ ধরে লোকটার গলা চেপে ধরে রেখেছিল। তার সঙ্গীদ্বয়কে কুয়াশার হাতে পরাজিত হতে দেখে সে তড়িৎ বেগে উঠে দাঁড়াল।

ওদিকে ব্রিজের রেলিংয়ের পাশ থেকে টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েছে এক নম্বর শত্রু।

কুয়াশা পিছিয়ে এল দু'পা।

তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল আছাড় খেয়ে পড়া দ্বিতীয় শত্রু। তিন শত্রু তিন দিকে। সুযোগ খুঁজছে তারা কুয়াশাকে আক্রমণ করে পরাস্ত করার।

দুর্বল, জ্ঞানহারা লোকটা নিঃসাড় শুয়ে আছে।

ওমেনার দিকে আড়চোখে তাকাল কুয়াশা। সকৌতুকে জিজ্ঞেস করল, 'এখন? কি করা উচিত আমার?'

ওমেনা শুরু করল, 'তখনই বলেছিলাম···।'

ওমেনার কথা শেষ হলো না, তিন শত্রু তিন দিক থেকে একযোগে ছুটে এল কুয়াশার দিকে।

এক পলকের মধ্যে ঘটে গেল ঘটনাটা। দেখা গেল কুয়াশা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে সে নেই। তিন শত্রু তিন দিক থেকে এসে ধাক্কা খেল পরস্পরের সাথে, ঠুকে গেল তিনজনের তিনটে মাথা সশব্দে।

তিন শত্রু যার যার মাথা ব্যথায় অস্থির। এমন সময় দেখা গেল তাদের মধ্যে থেকে একজন উঠে গেল শূন্যে। আসলে কুয়াশা তাদের একজনকে পিছন থেকে ধরে শূন্যে তুলে ফেলল তারপর সজোরে ছুঁড়ে দিল ব্রিজের রেলিংয়ের দিকে।

রেলিং টপকে গেল লোকটা, অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে শব্দ উঠল রেনউইগ নদীতে—ঝপাৎ!

মাথার ব্যথায় চোখে সর্ষে ফুল দেখছিল বাকি দু'জন শত্রুও। তাদের একজন সঙ্গী যে হিম-শীতল নদীতে হাবুডুবু খাচ্ছে, এ সম্পর্কে কোন ধারণাই তখনও করতে পারেনি তারা। কুয়াশা শান্ত ভঙ্গিতে আরও একজন শত্রুকে ধরে শূন্যে তুলল।

দ্বিতীয় এই লোকটাও বরফ-শীতল নদীতে পড়ল, শব্দ হলো—ঝপাৎ! তারপর সর্বশেষ লোকটির পালা। এ লোকটা বিপদ টের পেয়ে ছুটে পালাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ডি. কস্টা তার পথরোধ করে দাঁড়াল। সুর করে বলল, 'যেটে নাহি ডিব! যেটে হামি ডিবো না টোমায়!'

লোকটা এদিক ওদিক তাকাল, পালাবার পথের সন্ধানে। কিন্তু সময় পেল না সে, কুয়াশা নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল তার পিছনে। ঘাড়ে নিঃশ্বাসের স্পর্শ পেয়ে ঘাড় ফেরাল লোকটা ঝট্ করে। কুয়াশা মুচকি হেসে বলল, 'চলো, রেলিং পর্যন্ত বেড়িয়ে আসি।'

কথাটা বলে কুয়াশা লোকটার একটা হাত ধরল, যেন পরম বন্ধুকে খাতির করে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে।

লোকটা সত্যিই ঘাবড়ে গেছে। তার সঙ্গী দু'জনের পরিণতি দেখার পর কুয়াশা সম্পর্কে তার কোন ভুল ধারণা না থাকারই কথা। বিনাবাক্যব্যয়ে সে পাশাপাশি এগিয়ে চলল কুয়াশার সাথে। রেলিংয়ের দিকে।

রেলিংয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। ব্রিজের উপর নিওন সাইন জ্বলছে। কুয়াশা ভেদ করে স্বল্প আলো পড়েছে নিচের নদীতে। কুল কুল করে বয়ে যাচ্ছে স্রোত।

কুয়াশা হাসি মুখে বলল, 'রেলিংয়ের ওপর উঠে লাফ দাও বাছা। তোমাকে আর নিজের হাতে শাস্তি দিতে চাই না!'

'মারা পড়ব যে! এই শীতে নদীতে পড়লে বরফ যদি নাও হই, নির্ঘাৎ

নিউমোনিয়ায়…।'

লোকটার কথা শেষ হলো না, পিছন থেকে ডি. কস্টা বাংলায় কথা বলে উঠল, 'বস্, হামি কিছুটা বাহাদুরী ডেকাইটে ইচ্ছা করি।'

কুয়াশা সকৌতুকে বলল, 'তা দেখান না!'

কুয়াশার কথা শেষ হতে যা দেরি, ডি. কস্টার শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ঝুপ করে বসে পড়ল সে। দু'হাত বাড়িয়ে ধরল লোকটার হাঁটু দুটো। তারপর উপর দিকে ঠেলে দিল সজোরে…।

নিচু রেলিং টপকে লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল নিচে। পাঁচ সেকেণ্ড পর সেই পরিচিত শব্দটা উঠে এল উপরে—ঝপাৎ!

গম্ভীর, থমথমে হয়ে উঠেছে ওমেনার মুখের চেহারা।

কুয়াশা তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মৃদু হাসি লেগে আছে ঠোঁটে। বলল, 'লোকগুলো নোংরা। ঠাণ্ডা নদীর পানিতে গোসল করার দরকার ছিল ওদের। শীতের দেশের লোক, একেবারে সইতে পারবে না তা মনে কোরো না।'

ওমেনা বলল, 'আর ওই হতভাগা! ওর কি হবে? '

'জ্ঞান কি ফিরেছে?' কথাটা বলে কুয়াশা নিঃসাড় পড়ে থাকা রোগা পাতলা লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। চোখ মেলে পিট পিট করে তাকাচ্ছে লোকটা। চোখ মুখ থেকে আতঙ্কের ছাপ এখনও দূর হয়নি। কুয়াশা বসল হাঁটু মুড়ে তার সামনে। বলল, 'কি হে বাপু, কে তুমি? কোথায় যাচ্ছিলে এত রাত করে?'

লোকটার চোখেমুখে আতঙ্কই শুধু নয়, সেই সাথে ঘৃণা এবং হিংস্রতারও ছাপ ফুটে আছে। খুবই আশ্চর্য বোধ করল কুয়াশা। লোকটা কি অকৃতজ্ঞ? যে তাকে রক্ষা করেছে তার প্রতি এমন ঘৃণা এবং বিদ্বেষের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার কি মানে?

'কিছু বলো! কে তুমি? কোথায় যাচ্ছিলে?'

লোকটা মুখ বিকৃত করে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে উঠল খ্যাপা কুকুরের মত, 'Ich will gar nichts sagen'.

ভুরু কুঁচকে উঠল কুয়াশার।

এমন সময় নিরীহ গোছের রোগা-পাতলা লোকটা তার বাঁ হাতটাকে বিদ্যুৎবেগে তুলে সাপের মত ছোবল মারল কুয়াশার চোখ লক্ষ্য করে। তৈরি ছিল না কুয়াশা। তবে এক পলক আগে মাথাটা পিছন দিকে সরিয়ে নিল বলে এ যাত্রা তার একটা চোখ বেঁচে গেল।

ব্যর্থ হয়ে যেন আরও মরিয়া হয়ে উঠল লোকটা। তার ডান হাতের কব্জির সাথে অ্যাটাচিকেসের শিকল বাঁধা। কিন্তু বাঁ হাতটা মুক্ত। সেই মুক্ত হাতের আঙুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে শিকারী বিড়ালের মত আবার সে কুয়াশার মুখ লক্ষ্য করে ছোবল মারল।

বিস্ময় নয় শুধু, কুয়াশার মুখে কৌতুকও ফুটে উঠল।

'ধীরে, বন্ধু, ধীরে!' বলে ডান, হাত দিয়ে লোকটার বাঁ হাত ধরে ফেলল কুয়াশা। তারপর তাকাল ওমেনার দিকে।

সাথে সাথে ওমেনা বলল, 'ভারি অবাক কাণ্ড, স্বীকার করছি। তবে ঝামেলা না বাড়িয়ে একেও নদীতে ফেলে দিয়ে চলো হোটেলে ফিরে যাই।'

'আরে না! তা কি হয়? গন্ধ পাচ্ছ না?'

ওমেনা বলল, 'কিসের গন্ধ?'

কুয়াশা হাসতে হাসতে বলল, 'রহস্যের?'

ওমেনা বলল, 'রহস্যের গন্ধ? কোথায়?'

কুয়াশা বলল, 'পরে ব্যাখ্যা করে বলব। এখন মিস্টার বিদেশীকে অচল করা দরকার।'

কথাটা বলে কুয়াশা মিস্টার বিদেশীর বগলের নিচে বাঁ হাতের আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে নার্ভ সেন্টার খুঁজতে শুরু করল। তিন সেকেণ্ড পর নার্ভ সেন্টারে চাপ দিতেই লোকটা বিনা প্রতিবাদে জ্ঞান হারাল।

কুয়াশা উঠে দাঁড়াল।

এমন সময় শোনা গেল হুইসেলের শব্দ।

'পুলিস আইটাছে বস্!' ডি. কস্টা কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে বলল।

'যা ভয় করেছিলাম, তাই হতে যাচ্ছে। সেই পুলিসী হাঙ্গামায় শেষ পর্যন্ত জড়ালে তুমি নিজেকে!'

ওমেনার গম্ভীর কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ এবং তিরস্কার দুইই প্রকাশ পেল।

কুয়াশা বলল, 'সত্যিই তো!'

হুইসেলের শব্দ দূর থেকে ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে।

'ব্রিজের নিচে লুকোবার জায়গা আছে। কুইক!'

রেলিংয়ের ধারে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। গাঢ় কুয়াশা বলে সুবিধে এই যে পুলিসের লোকেরা দূর থেকে ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না।

কুয়াশা রেলিং টপকে নামল ব্রিজের কার্নিসে। ডি. কস্টা উঠে বসল রেলিংয়ের উপর। তাকে ধরে নামিয়ে নিল কুয়াশা রেলিং থেকে। ব্রিজের তলায় প্রশস্ত একটা ল্যাণ্ডিং, নদী থেকে কংক্রীটের পিলার উঠে এসে যেখানে শেষ হয়েছে। সেই ল্যাণ্ডিংয়ে ডি. কস্টাকে বসিয়ে দিয়ে কার্নিসে ফিরে এসে কুয়াশা দেখল ওমেনাও উঠে বসেছে রেলিংয়ের উপর। ওমেনাকেও কুয়াশা একই পদ্ধতিতে ল্যাণ্ডিংয়ে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এল আবার কার্নিসে।

রেলিং টপকে ব্রিজের উপর নামল কুয়াশা। মিস্টার বিদেশীর অচেতন দেহটা পিঠে নিয়ে ফিরে এল সে।

হুইসেলের শব্দ কাছাকাছি চলে এসেছে।

রেলিং টপকে কার্নিসে, কার্নিস থেকে ল্যাণ্ডিংয়ে পৌঁছুল কুয়াশা। এমন সময় বুটজুতোর ছুটন্ত শব্দ পৌঁছল ওদের কানে।

ব্রিজের উপর দিয়ে দুইজোড়া বুট জুতো ছুটে গেল একদিক থেকে আরেক দিকে। কুয়াশা কার্নিসে ফিরে গিয়ে মাথা উঁচু করে কি যেন দেখল, গম্ভীর আকার ধারণ করল তার মুখের চেহারা।

একসময় দূরে মিলিয়ে গেল বুটজুতোর ছুটন্ত শব্দ।

চাপা কণ্ঠে ওমেনা বলল, 'ধরা পড়লে এই বিদেশে কি যে হবে!'

ডি. কস্টা পকেট থেকে ব্র্যাণ্ডির বোতলটা বের করে ঢক ঢক করে দু'ঢোক ব্র্যাণ্ডি পান করল। শার্টের আস্তিন দিয়ে ঠোঁট মুছতে মুছতে বলল সে, 'ঢরা কেন পড়িব? সাহস এবং বুদ্ধি ঠাকিলে ঢরা পড়িবার কোন কারণ নাই। বুদ্ধি হামাডের এনাফ পরিমাণে আছে। সাহস ডরকার। সাহস সঞ্চয়ের জন্য মড্য পান করিটেছি। ব্যস, সব প্রবলেম সল্‌ভ্‌ হইয়া গেল।'

ওমেনা মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, 'যেই না তালপাতার সেপাই, আপনার আবার সাহস!'

কুয়াশার দিকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকাল ওমেনা, 'এখানে থাকলে ধরা পড়বই পড়ব। চলো, পালাবার চেষ্টা করি।'

কুয়াশা বলল, 'অত ব্যস্ততার কি আছে? পুলিস দু'জন ফিরে আসবে এখুনি, ব্রিজে উঠলেই ধরা পড়ে যাব।'

'ফিরে আসবে?'

'ওই আসছে!'

আরও খানিক পর ডি. কস্টা এবং ওমেনা সত্যি সত্যি বুটজুতোর শব্দ পেল। ছুটে নয়, এবার হেঁটে ফিরে আসছে পুলিস দু'জন।

ব্রিজের উপর দিয়ে চলে গেল তারা।

নিঃশব্দে বসে রইল ওরা আরও মিনিট তিনেক। নিস্তব্ধতা ভাঙল ওমেনা, 'আমরা না হয় হোটেলে ফিরব। কিন্তু সাথের এই ঝামেলাটাকে নিয়ে কি করবে?'

'সাথে এ আমাদের ঝামেলা নয়, কৌতূহল, মূর্তিমান কৌতূহল একটা। একে আমরা আমাদের মেহমান হিসেবে গ্রহণ করছি।'

'তার মানে?'

'তার মানে একে আমরা আমাদের হোটেলে নিয়ে গিয়ে জামাই-আদর করব।'

'সে কি! কেন! এমন কাণ্ড কেউ করে নাকি?'

কুয়াশা সহাস্যে বলল, 'না, কেউ করে না—আমরা করি। কি জানো, ওমেনা, গত ক'মাস হাত-পা গুটিয়ে নিরামিষ জীবন যাপন করে বড্ড হাঁপিয়ে উঠেছি। ঘটনাচক্রে রহস্যের গন্ধ যখন একটু পেয়েছি, এর শেষ না দেখে ছাড়ছি না। হাতে কাজকর্ম নেই, সময়টা অন্তত কাটবে তো। চলো, এখান থেকে উঠি এবার।'

ব্রিজের উপর উঠে চারদিক দেখে নিয়ে ক্লিয়ারেন্স সিগন্যাল দিল কুয়াশা। ডি. কস্টা এবং ওমেনা উঠে এল উপরে। কুয়াশা বলল, 'এক সাথে তিনজন না থাকাই ভাল। মি. ডি. কস্টা, আপনি দূর থেকে আমাদেরকে ফলো করে আসবেন।'

ডি. কস্টা পকেট থেকে ব্র্যাণ্ডির বোতল বের করে মিস্টার বিদেশীর চোখেমুখে কয়েক ফোঁটা ব্র্যাণ্ডি ছিটিয়ে দিল। বলল, 'মাটাল বন্ধুকে হাপনি সাহায্য করছেন, ঢরা পড়িলে এই অজুহাটটা কাজে লাগাটে পারিবেন।'

রাত তখন তিনটে। ইন্সব্রুকের দেশে যানবাহন বা লোকজন কিছুই নেই। দেয়ালের ছায়ার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে এগোল কুয়াশা, কাঁধে অচেতন মিস্টার বিদেশী। ওমেনা কুয়াশার পিছু পিছু, ছায়ার মত লেগে আছে।

সাততলা উঁচু কুর্কাজা হোটেলটা দূর থেকে দেখা গেল, আকাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সাইড ওয়ালের নিচে দাঁড়িয়ে পড়ল কুয়াশা। কাঁধের বোঝাটাকে দু'হাত দিয়ে ধরে পাঁচিলের উপর রাখল সে। তারপর ওমেনার দু'কোমর ধরে শূন্যে তুলে নিল তাকে। নামিয়ে দিল পাঁচিলের সমতল মাথায়।

ওমেনা নিজেকে সামলে ভাল করে বসবার আগেই টের পেল পাশে কুয়াশার উপস্থিতি। বাদুড়ের মত লাফ দিয়ে নিচে নামল কুয়াশা। অন্ধকারে আর কিছু দেখা না গেলেও কুয়াশার সাদা ধবধবে মুক্তোর মত দু'পাটি দাঁত রেডিয়ামের মত জ্বল জ্বল করছে দেখতে পেল ওমেনা। দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কুয়াশা। ওমেনা সমর্পণ করল নিজেকে বলিষ্ঠ সেই দু'হাতের মধ্যে।

নিচে নামিয়ে দিল কুয়াশা ওমেনাকে। ওমেনার মনে হলো কেউ যেন তাকে নরম ফুলের বিছানায় আলতো ভাবে নামিয়ে দিল।

পাঁচিলের উপর থেকে মিস্টার বিদেশীকে কাঁধে তুলে নিয়ে কুয়াশা বলল, 'এগোও।'

সিটিংরুমের জানালা দিয়ে এর আগেই বাগানটা দেখা আছে ওমেনার। অন্ধকারে সেই দেখাটাকে কাজে লাগিয়ে ফুল গাছের ফাঁক দিয়ে সরু রাস্তার উপর দিয়ে এগোল সে।

কুয়াশা কুর্কাজা হোটেলের গ্রাউণ্ড ফ্লোরের একটা স্যুইট ভাড়া নিয়েছে। মাত্র তেরো ঘণ্টা আগে এই হোটেলে উঠেছে ওরা।

দূর থেকেই দেখা গেল ওমেনার বেডরুমের জানালাটা খোলা রয়েছে। সেদিকে এগুচ্ছিল ওমেনা। হঠাৎ অনুভব করল, পাশ দিয়ে দমকা বাতাসের মত কে যেন ছুটে গেল।

জানালা টপকে বেডরুমে ঢুকে ওমেনা একটা দরজা খোলা বা বন্ধ হবার শব্দ পেল। সুইচ অন করে আলো জ্বেলে দেখল কুয়াশা রুমের ভিতর নেই।

এক সেকেণ্ড পরই কুয়াশা পাশের রুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এল। পাশের রুমটা কুয়াশার বেডরুম। ওমেনার রুমটা পড়েছে মাঝখানে। সিটিংরুমটা সামনের দিকে, সেটা ডি. কস্টার শয়নকক্ষ হিসেবে নির্ধারিত।

'মিস্টার বিদেশীকে…?'

কুয়াশা বলল, 'বেচারা ঘুমাচ্ছে এখনও। ওকে বিছানার সাথে বেঁধে রেখেছি হ্যাণ্ডকাফ দিয়ে।'

ওমেনাকে উদ্বিগ্ন দেখাল, 'মুখে তুলো গুঁজে দিলে ভাল হয়। জ্ঞান ফিরে পেয়ে যদি চেঁচাতে শুরু করে?'

হাভানা চুরুটের প্যাকেট থেকে বেছে একটা চুরুট বের করে সোফায় বসল কুয়াশা। গ্যাস লাইটার জ্বেলে চুরুটে অগ্নিসংযোগ করে নীলচে একরাশ ধোঁয়া

ছাড়ল। বলল, 'মিস্টার বিদেশী চিৎকার চিৎকার করবে না। এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি। কাঁদতে পারে, গোঙাতে পারে, কাশতে পারে—কিন্তু সাহায্যের জন্যে চিৎকার সে করতে পারে না।'

মৃদু টোকা পড়ল সিটিংরুমের দরজায়।

ওমেনার বিস্মিত চোখের সামনে কুয়াশা ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল। ওমেনার বিস্ময়ের কারণ, কুয়াশা হঠাৎ কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

সিটিংরুমের দিকে পা বাড়াল কুয়াশা। হিপ পকেট থেকে লোডেড রিভলভারটা বের করে নিল সে দ্রুত।

ওমেনা পিছু নিল কুয়াশার।

সিটিংরুমে ঢুকে পা টিপে টিপে বারান্দার দিকের দরজার দিকে এগোল কুয়াশা। ওমেনা তার ঘাড়ের কাছ থেকে চাপা স্বরে বলল, 'আমার মনে হয় মি. ডি. কস্টা।'

কুয়াশা চাপা স্বরে উত্তর দিল, 'জানি। হয়তো তাই। কিন্তু মি. ডি. কস্ট ছাড়াও আর কেউ আসতে পারে, অন্তত কারও না কারও আসা উচিত, আশা করছি আমি।'

কী-হোলে চোখ রেখে বাইরেটা দেখে নিল কুয়াশা। দরজা খুলে দিল সে। সরে দাঁড়াল এক পাশে।

সিটিংরুমে প্রবেশ করল ডি. কস্টা। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল সে। চাপা স্বরে জানতে চাইল, 'মিস্টার বিডেশী কোঠায়?'

কুয়াশা বলল, 'আমার বেডরুমে। ওর জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।'

'অপেক্ষা না হয় করলাম। কিন্তু লোকটার কাছ থেকে কি আশা করছ তুমি?'

কুয়াশা ওমেনার প্রশ্নের উত্তরে মৃদু হেসে বলল, 'রহস্য।'

ডি. কস্টা তার ইদানীং গজানো গোঁফে তা দিতে দিতে বলল, 'চলুন টাহলে, ডেখা যাক বিডেশীর সেনস্ ফিরিয়াছে কিনা।'

ওমেনার বেডরুমে ঢুকল ওরা। সকলের আগে কুয়াশা। নিজের বেডরুমের দরজা খুলল সে।

ওমেনা বলল, 'আমার ঘুম পাচ্ছে!' বলে সশব্দে বসে পড়ল সে সোফায়। ডি. কস্টা হেলে দুলে অনুসরণ করল তার বসকে।

নিজের বেডরুমের দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করল কুয়াশা। অন্ধকার। মাত্র দু'কদম এগিয়ে থমকে দাঁড়াল সে। ঠাণ্ডা, শীতল বাতাস লাগল তার চোখেমুখে। এবং যেখানে পর্দা ঢাকা জানালা থাকার কথা সেখানে সে দেখল নক্ষত্রের আলো, দূরাকাশের কয়েকটা নক্ষত্রও দেখা গেল। নিঃশব্দে পিছিয়ে এল কুয়াশা। ডি. কস্টা সুইচবোর্ডের সুইচে আঙুল রাখতে যাচ্ছিল, তার হাতটা খপ্ করে ধরে নামিয়ে দিল কুয়াশা। 'একটু পর, মি. ডি. কস্টা!'

অন্ধকারে আবার পা বাড়াল কুয়াশা। খোলা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল

সে। কাঁচের শার্সিটা নামিয়ে দিল সে দ্রুত। তারপর পর্দা টেনে ঢেকে দিল জানালাটা। কাজগুলো করার সময় কুয়াশা মনে মনে ভাবছিল, সর্বনাশ! নিজের হাতে শার্সি নামিয়েছি খানিক আগে, পর্দা টেনে দিয়েছি! কে খুলল?

জানালার কাছে হাতে উদ্যত রিভলভার নিয়ে কুয়াশা কথা বলে উঠল, 'মি. ডি. কস্টা, এবার আপনি আলো জ্বালতে পারেন।'

খুট করে শব্দ হতেই আলো জ্বলল।

অত্যন্ত সুসজ্জিত বেডরুম কুয়াশার। সবুজ রঙের দামী কার্পেট মেঝেতে। দেয়ালে জার্মান শিল্পীদের তৈলচিত্র টাঙানো। শো-কেস, টিভি, ফোন, ওয়াল সেফ—সবই সুরুচির পরিচায়ক।

চকচকে বাটের ছোরাটার দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলতে লাগল ডি. কস্টা। মি. বিদেশীর বাঁ দিকের বুকে আমূল বিঁধে আছে ছোরাটা। লোকটার ডান হাতটা ঝুলছে খাটের পাশে। ডান হাতটার সাথে শিকল দিয়ে বাঁধা অ্যাটাচিকেসটা। কার্পেটের উপর পড়ে রয়েছে। অ্যাটাচিকেসটার উপরকার চামড়া ছোরা দিয়ে ফালা ফালা করে কাটা হয়েছে। ভিতর থেকে উঁকি মারছে চকচকে ইস্পাতের গা।

তিন

গম্ভীর হয়ে গেছে কুয়াশা। ঝাড়া এক মিনিট নিঃশব্দে লাশটার দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল।

খাটের সাথে লোকটার বাঁ হাত বেঁধে রেখে গিয়েছিল কুয়াশা। চাবি দিয়ে হ্যাণ্ডকাফের তালা খুলে বাঁ হাতটা মুক্ত করল সে।

দোর-গোড়া থেকে চাপা কণ্ঠস্বর ভেসে এল ওমেনার, 'গুড গড! একি! কিভাবে ঘটল!'

লাশের দিক থেকে চোখ না সরিয়েই কুয়াশা উত্তর দিল, 'খুব সহজেই ঘটেছে ঘটনাটা। আমাদেরকে কেউ অনুসরণ করেছিল। আমরা যখন পাশের রুমে কথা বলছি, সে বাইরে থেকে জানালার শার্সি খুলে ভিতরে ঢুকে কাজ সেরে গেছে। এ লোকটা খুন হলো কেন—তা আবিষ্কার করতে হলে অনেক চিন্তা ভাবনা করতে হবে।'

'বিদেশ-বিভূঁইয়ে একি বিপদে পড়লাম…।'

কুয়াশার খেয়াল নেই কারও কথায়। পায়চারি শুরু করেছে সে। তবে অস্থির বা উত্তেজিত দেখাচ্ছে না তাকে। চিন্তা-ভাবনা করছে বলে মনে হলো। পায়চারি থামিয়ে খাটের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল একবার। পরীক্ষা করল অ্যাটাচিকেসটা।

'এত ভারি হয় না কোন অ্যাটাচীকেস। এত ভারির কারণ, এটা কোন অ্যাটাচিকেসই নয়। উপরে চামড়ার খোলস, নিচে ইস্পাতের তৈরি ছোট একটা পোর্টেবল সেফ।'

সত্যিই তাই। চামড়ার খোলসটা সরিয়ে ফেলতেই দেখা গেল নীলচে রঙের ইস্পাতের সেফটাকে। সেফটার গায়ের তালা এবং শিকল পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়াল কুয়াশা, 'কমবিনেশন লক। নাম্বার জানা না থাকলে কারও পক্ষে খোলা সম্ভব নয়। মি. ডি. কস্টা, সুটকেস থেকে ক্যানভাসের ব্যাগটা বের করুন।'

ডি. কস্টা ব্যাগটা বের করে আনল। সেটা খুলে কুয়াশা একটা বোতল বের করল। একটা রবারের পাইপে বোতল থেকে তরল পদার্থ ঢালল সে অতি সাবধানে। বলল, 'হাইড্রোফ্লুয়োরিক অ্যাসিড। সবচেয়ে ক্ষুধার্ত রাসায়নিক পদার্থ। প্রায় সবকিছু খেয়ে ফেলে।'

রবারের গায়ে চাপ দিতে ফোঁটা ফোঁটা অ্যাসিড পড়ল লোহার শিকলের গায়ে। বাষ্প উঠল, ছবাক ছবাক করে শব্দ হলো। গলে গেল লোহা।

'সেফটা খোলা সম্ভব নয় ওই অ্যাসিড দিয়ে?'

কুয়াশা বলল, 'না। এই ধরনের সেফ যারা তৈরি করে তারা জানে, অ্যাসিড দিয়ে খোলার চেষ্টা হতে পারে, তাই এমন ইস্পাত দিয়ে এগুলো তৈরি করা হয় যে বিশ বছর এটাকে অ্যাসিডে ডুবিয়ে রাখলেও এতটুকু ক্ষয় হবে না।'

আবার পায়চারি শুরু করল কুয়াশা। পায়চারি না থামিয়েই বলতে শুরু করল, 'কয়েকটা ব্যাপার পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। রহস্যের কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে এই পোর্টেবল সেফটা। সেফটার ভিতর বিস্ময়কর কিছু আছে। ব্রিজের উপর বিদেশীকে যারা কাবু করার চেষ্টা করছিল তারা এই সেফটা দখল করার জন্যেই...'

'হামারও টাই বিশ্বাস।'

কুয়াশা বলে চলেছে, 'লোকটা খুন হলো কেন? সম্ভাব্য তিনটে কারণ দেখতে পাচ্ছি আমি। ক) কারণ, সেফটা তার কাছে ছিল, তাই। খ) কারণ, সে চিৎকার করে লোক জড়ো করতে পারত, তাই। গ) কারণ, সে কাউকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করতে পারে; তাই। যে লোক একে খুন করেছে সে সেফটা চুরি করার চেষ্টা করেছে, এর প্রমাণ আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। লোহার শিকলটা কাটার মত কোন যন্ত্র বা রাসায়নিক দ্রব্য তার কাছে ছিল না, তাই সে ব্যর্থ হয়। সে অবশ্য হাতটা কেটে ফেলতে পারত কনুই থেকে, কিন্তু ছোরাটা দিয়ে তা সম্ভব নয় বলে সে চেষ্টা সে করেনি। ছোরাটা ধারাল বটে, কিন্তু খুবই সরু।'

ডি. কস্টা বলল, 'বস্, হামি শুনিয়াছি, ব্যাঙ্কের কর্মচারীগণ হাটের সাঠে শিকল ডিয়া বাঁধা অ্যাটাচিকেস লইয়া টুর করে।'

'হয়তো করে। কিন্তু রাত আড়াইটা-তিনটের সময় করে না।'

ওমেনা বলল, 'তার মানে তুমি বলতে চাইছ লোকটা চোর?'

'চোর কিনা জানি না। তবে অপরাধের সাথে যুক্ত ছিল এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।'

কথাগুলো বলে কার্পেটের উপর থেকে ইস্পাতের পোর্টেবল সেফটা তুলে নিল কুয়াশা। সেটার ওজন অনুমান করতে করতে চেস্ট অব ড্রয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। চেস্ট-অব-ড্রয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে বলল, 'লোকটা অপরাধী ছিল।

কিন্তু কে তাকে খুন করল?'

ওমেনা বলল, 'কে আবার? বিরোধী দলের কেউ। তুমি যাদেরকে নদীতে ফেলে দিয়েছিলে তাদেরই কেউ একজন।'

এদিক ওদিক মাথা দোলাল কুয়াশা, 'তাদের কেউ বলে, কই, পানির দাগ কই? নদী থেকে উঠে গা মুছে শুকনো কাপড় পরে এসেছিল বলবে? না, এত অল্প সময়ে তা সম্ভব নয়। বিরোধী দলের কেউ, এটা ঠিক। কিন্তু এই বিরোধী দলটাকে দেখার সৌভাগ্য এখনও হয়নি আমাদের। এরা আমাদের অপরিচিত। ঘটনা যেখানে ঘটছিল, ওই বিরোধী দলের একজন প্রতিনিধি সবসময় উপস্থিত ছিল সেখানে সকলের অজ্ঞাতে। জলহস্তী তিনজন···।'

'জলহস্তী মানে? এর মধ্যে জলহস্তী কোথায় পেলে তুমি?'

কুয়াশা মৃদু একটু হাসল, 'যাদেরকে নদীতে ফেলে দিয়েছিলাম, তাদের কথা বলছি। ওদের নাম-ধাম জানা নেই, তাই জলহস্তী বলছি। জলহস্তীরা কারা? কি তাদের পরিচয়?'

'জানো তুমি?'

কুয়াশা মুচকি হাসল, 'জানি। কিন্তু বলতে সাহস পাচ্ছি না। আঁৎকে উঠবে তোমরা।'

'কি! আঁৎকে উঠব? আঁৎকে উঠব কেন? কারা তারা?'

ডি. কস্টাকে চিন্তিত দেখাল। কুয়াশার মুখের দিকে নিষ্পলক চোখে চেয়ে আছে সে। চোখেমুখে একটা ভয় ভয় ভাব ফুটে উঠেছে তার। বস যে ফালতু কথা বলে না তা তার অজানা নয়। এমন কিছু বলবেন তিনি, যাতে আঁৎকে উঠতে হবে···!

কুয়াশা মুখ খুলতে যাচ্ছে দেখে ডি. কস্টা সবেগে দু'হাত তুলে দু'কানের কাছে নিয়ে গেল। দু'কানের ছিদ্রে দু'হাতের তর্জনী ঢুকিয়ে দিল সে। ওরে শুনবে না সে কুয়াশার কথা, ভাবটা এইরকম।

'বলো, কারা তারা?'

ওমেনা যেন হঠাৎ অনুমান করতে পেরেছে, কুয়াশা কি বলবে। গলাটা তাই বুঝি একটু কেঁপে গেল তার।

কুয়াশা বলল, 'জলহস্তীরা অপরাধী নয়। তারা এ দেশের পুলিশ।'

ডি. কস্টা কানে আঙুল দিলেও নিজেকে ফাঁকি দিয়ে কুয়াশার কথা ঠিকই কানে ঢোকাল সে। কুয়াশার কথা শেষ হতে মুখ বিকৃত করে বলে উঠল চাপা কণ্ঠে, 'বাঘে ছুঁইলে আঠারো ঘা, পুলিস ছুঁইলে ছত্রিশ ঘা। আই হেট। বিদেশেও মি. সিম্পসনের চেলাডের সাঠে বিরোট ডেখা ডিল!'

ওমেনা বলল, 'কি! কিন্তু···।'

কুয়াশা মৃদু মৃদু হাসছে।

'তুমি কি শিওর?'

'পুলিস ছাড়া আর কি হতে পারে তারা? মিশরীয় বিদেশী পাহারাদার জন্যে

একবারও চিৎকার করেনি। কেন? কারণ, সে জানত, সাহায্য চাইলেও সাহায্য পাবার কোন আশা নেই তার। পুলিশের বিরুদ্ধে গিয়ে কে তাকে সাহায্য করবে? তারপর, মিস্টার বিদেশী জার্মান ভাষায় যে কথাটা বলল—কথাটা শুনেই সব পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল আমার কাছে। কি বলেছিল সে, মনে আছে? Ich will gar nichts sagen— কথাটার অর্থ হলো, "কোন কথাই আদায় করতে পারবে না আমার কাছ থেকে।"—অপরাধী মাত্রেই এই কথাটা বলে থাকে ধরা পড়লে। মজার বিষয় হলো, লোকটা আমাকে পুলিসের সদস্য বলে মনে করেছিল।'

ডি. কস্টা প্রায় ককিয়ে উঠল, 'টাহার মানে হামি ল্যাং মারিয়াছি পুলিসকে। গড, সেভ মি. এটোক্ষণে গ্রেফটারী পরোয়ানা জারি হইয়া গিয়াছে হামার নামে।'

কুয়াশা খানিকক্ষণ চিন্তা করল। তারপর বলল, 'আমরা অদৃশ্য একদল শত্রুর সাথে বিবাদ বাধিয়ে বসেছি। তারা লোকটাকে খুন করেছে, কিন্তু আরও অনেক কিছু করার কথা ভাবছে তারা। যে খুন করেছে সে ফিরে গেছে তার দলের কর্মকর্তাকে রিপোর্ট করতে। তারা এখন পরিকল্পনা রচনায় ব্যস্ত। পরিকল্পনা করতে কতক্ষণ সময় লাগবে জানি না। কিন্তু এটুকু জানি যে, তারা ফিরে আসবে। সম্ভবত দলবল নিয়েই আসবে। পোর্টেবল সেফটা দখল করার জন্যে। ওমেনা, সত্যি কথা বলতে কি, আমি বিদেশ ভ্রমণে এসে এ ধরনের একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে চাইনি। কিন্তু…।'

চুপ করে গেল হঠাৎ কুয়াশা। চেস্ট-অব-ড্রয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে কথা বলছিল সে। সিধে হয়ে দাঁড়াল। পোর্টেবল সেফটা ওভারকোটের বাঁ দিকের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল।

সিটিংরুমের বারান্দার দিকে যে দরজা সেই দরজায় টোকা পড়ছে বলে মনে হলো।

কুয়াশা নিচু স্বরে বলল, 'কেউ ছড়ি ঠুকে ঠুকে আসছে। ওমেনা মি. ডি. কস্টা, সম্ভবত শত্রুপক্ষের আগমন ঘটছে।'

ওমেনার বেডরুমে ঢুকল কুয়াশা। পকেট থেকে হাতে বেরিয়ে এসেছে ওয়েবলি অটোমেটিকটা, বৈদ্যুতিক আলোয় চকচক করছে সেটা। পরীক্ষা করে দেখে নিল কুয়াশা এগোতে এগোতে, সাইলেন্সার ফিট করল, সেফটি ক্যাচ অন করল, তারপর সেটা ঢুকিয়ে রাখল ওভারকোটের সাইড পকেটে। ডান হাতটা পকেটটা থেকে বের হলো না আর।

ওমেনার বেডরুম থেকে কুয়াশা সিটিংরুমে পৌঁছুল। বারান্দার দিকের দরজার দু'পাশে দাঁড়াল ওরা। এক দিকে কুয়াশা, অপরদিকে ওমেনা এবং ডি. কস্টা।

ছড়ির শব্দ এখন আর শোনা যাচ্ছে না। তালা খুলে আধ ইঞ্চিটাক ফাঁক করল কুয়াশা। কাউকে দেখা গেল না ফাঁক দিয়ে।

কে তাহলে ছড়ির শব্দ করছিল।

উত্তরটা এল অপ্রত্যাশিতভাবে, পিছন দিক থেকে।

ভরাট একটা কণ্ঠস্বর ওদের তিনজনের পিঠের উপর যেন উত্তপ্ত চাবুক মারল,

'দয়া করে তাড়াহুড়ো করবেন না। বিপদ ঘটতে পারে।'

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল কুয়াশা।

ওমেনার বেডরুম এবং সিটিংরুমের মধ্যবর্তী দরজায় দাঁড়িয়ে আছে সুবেশী, দীর্ঘদেহী, সুদর্শন এক ব্যক্তি। তার হাতে চকচক করছে কালো রঙের একটা রিভলভার। লোকটার চোখেমুখে কৌতুকের হাসি। বাঁ হাতে ধরা চকচকে একটা ওয়াকিং স্টিক।

ওমেনা এবং ডি. কস্টাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে কুয়াশা অকস্মাৎ সিলিংয়ের দিকে মুখ তুলে হোঃ হোঃ করে ভরাট গলায় অদম্য হাসিতে ফেটে পড়ল।

উচ্চকণ্ঠে হাসি থামল কুয়াশার এক সময়। কৌতুক এবং ব্যঙ্গ মিশ্রিত কণ্ঠে সে বলল, 'দ্য ক্রাউন প্রিন্স রুডলফ—ফর গডস সেক, তোমাকে আমি মোটেই আশা করিনি!'

চার

ছড়ি ধরা হাতের আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত চুরুট প্রিন্স রুডলফের। নীলচে ধোঁয়া উঠছে এঁকেবেঁকে সেটা থেকে। প্রিন্স রুডলফ মুচকি হাসছে। বলল, 'বন্ধু, সত্যি কথা বলতে কি, আমিও তোমাকে আশা করিনি! তোমার সাথে আবার আমার দেখা হবে, কল্পনাও করিনি।'

কয়েক মুহূর্তের জন্যে অতীতে ফিরে গেল কুয়াশা। ইউরোপে দীর্ঘদিন থাকার সময় প্রিন্স রুডলফের সাথে টক্কর লেগেছিল তার। রুডলফ প্রিন্স হলেও এমন কোন অপরাধ নেই যা সে করতে পারে না। গোটা ইউরোপে একসময় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল এই রুডলফ। তার প্রকৃত পরিচয় ইউরোপের পুলিস কখনও আবিষ্কার করতে পারেনি। প্রিন্স হিসেবে সে সর্বমহলের শ্রদ্ধা এবং ভক্তি পেত এবং সেই সুযোগে গোপনে সুসংগঠিত দল পরিচালনা করে লুটপাট, খুন, ব্যাঙ্ক ডাকাতি, স্মাগলিং ইত্যাদি হাজার রকম অপরাধ একের পর এক ঘটিয়ে যেত। সেই সময় কুয়াশার সাথে রুডলফের বিরোধ বাধে। সে আজ বছর পাঁচেক আগের কথা। ইতিমধ্যে অনেক দিন কেটে গেছে। বয়স হয়েছে রুডলফের। ইউরোপে নতুন নতুন গ্যাঙ লীডারদের আর্বিভাব ঘটেছে। তাদের সাথে আপোষ করে চলতে হয় আজকাল রুডলফকে। তার দলের বল-শক্তি আগের মত নেই আর।

ইউরোপবাসী বন্ধু বান্ধবের মাধ্যমে এসব তথ্য জানা আছে কুয়াশার।

কুয়াশা লক্ষ করল, প্রিন্স রুডলফ একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার ওভারকোটের উঁচু হয়ে থাকা সাইড পকেটটার দিকে। কুয়াশার সাথে চোখাচোখি হতে মুচকি হাসল রুডলফ। বলল, 'মাই ডিয়ার মিস্টার কুয়াশা, আমি বিশ্বাস করি, বোকামি করবে না তুমি। একরাতে একটা লাশই যথেষ্ট, ঠিক কিনা? নিশ্চয়ই তুমি আমাকেও লাশে পরিণত করার কথা ভাবছ না?'

কুয়াশা বলল, 'ভুল করছ তুমি, রুডলফ। তোমার কি মনে নেই, একসময়

লাশ সংগ্রহ করা ছিল আমার অন্যতম কাজ? সে যাক, যে লোক খুন করেছে সে তোমার দলেরই কেউ। অর্থাৎ, এই খুনের জন্য তুমি দায়ী।'

রুডলফের মুচকি হাসিটা দেখার মত। ঠোঁটে যেন আজন্ম লেগে আছে। বলল, 'স্বীকার করছি, আমার এক বুদ্ধু অনুচরের বোকামি এটা। এটা একটা অপ্রয়োজনীয় হত্যা। এমিলোকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল সে যেন বিজিম্যানকে শুধু অনুসরণ করে এবং বিজিম্যান গন্তব্যস্থানে পৌঁছানো মাত্র সে যেন আমাকে রিপোর্ট দেয়। বিজিম্যান পুলিসের হাতে ধরা পড়ে, তারপর তোমার দ্বারা মুক্ত হয়। এই ঘটনা চাক্ষুষ করে বুদ্ধু এমিলোর মাথা খারাপ হয়ে যায়। দিশে হারিয়ে কি করা উচিত ভেবে না পেয়ে তোমাকে সে অনুসরণ করে এখানে পৌঁছায় এবং বিজিম্যানকে খুন করে। সে যাক, বিজিম্যান গেছে। এমিলোকে অবশ্য চরম শাস্তিই দিয়েছি আমি। তুমি তো জানো, বন্ধু, আমার নির্দেশ যে অক্ষরে অক্ষরে পালন না করে—এ পৃথিবীর আলো-বাতাস থেকে তাকে আমি বঞ্চিত করি। কৌতূহল মিটল এবার?'

কুয়াশা বলল, 'না। বিজিম্যান কে?'

রুডলফ চুরুটে টান দিল। ভুরু কুঁচকে উঠল তার, 'এত সব কথা জানার কি দরকার তোমার, বন্ধু?'

'অনেক দরকার। পোর্টেবল সেফ—কি আছে ওতে?'

'কিসে কি আছে?'

কুয়াশা হাসল। বলল, 'হাসালে দেখছি! যে জিনিস তুমি নিতে এসেছ আমার কাছ থেকে, সেটার কথা বলছি আমি। কি আছে ওটায়, রুডলফ? সেফটার জন্যে একজন মানুষ খুন হয়েছে। ওটার ভিতর কি আছে জানতে হবে আমাকে।'

রুডলফ বাঁকা হেসে বলল, 'নিজের পজিশন সম্পর্কে তুমি দেখছি সচেতন নও, বন্ধু।'

কুয়াশা বলল, 'ভুল করছ। আমাকে তুমি চেনো না তা নয়। যা জানতে চাইব তা আমি জানবই, যত বিপজ্জনক পজিশনেই থাকি না কেন।'

রুডলফের চোখ-মুখ-ঠোঁট থেকে এই প্রথম হাসির ছিটে ফোঁটা পর্যন্ত উবে গেল। লাল মুখটা আরও লাল হয়ে উঠল। ভারি গলায় থেমে থেমে বলল সে, 'আমি আগন্তুক, বন্ধু। এবং আমি এসেছি নিজের জিনিস খোঁজ করতে। কথা যা বলবার আমিই বলব। তুমি উত্তর দেবে শুধু। আর একটা কথা। তোমার মঙ্গল চাই আমি। তোমার মঙ্গল চাই বলেই তোমাকে কোন তথ্য জানাতে চাই না। অজ্ঞ থাকো, সেটা হবে তোমার জন্যে সবচেয়ে ভাল।'

রিস্টওয়াচ দেখল রুডলফ। বলল, 'যথেষ্ট সময় নষ্ট করেছি আমরা। মাই ডিয়ার মি. কুয়াশা, তুমি যখন বিজিম্যানকে মুক্ত করো তার হাতের সাথে বাঁধা একটা অ্যাটাচিকেস ছিল। অ্যাটাচিকেসটা ক্যামোফ্লেজ, ভিতরে ছিল একটা স্টীলের সেফ। জিনিসটা আমার সম্পত্তি। ফেরত পেলে আনন্দিত হব।'

দেয়ালের গায়ে হেলান দিল কুয়াশা। অলসভঙ্গিতে বলল, 'কে না জানে

হাতছাড়া জিনিস ফেরত পেলে লোকে আনন্দিত হয়। কিন্তু রুডলফ, আবার ভুল করছ তুমি। এই একটু আগে না বললাম, যা জানতে চাই তা আমি জানবই। সেফের ভিতর কি আছে বলো আমাকে।'

'বললে? বললে ফিরিয়ে দেবে তুমি সেটা?'

কুয়াশা দেয়ালের কাছ থেকে দু'পা এগিয়ে এসে থামল। হাসল সে, 'কথা দিচ্ছি না। সেফের ভিতর এমন কিছু আছে যেটা তোমার জন্যে লোভনীয়। কে জানে, আমারও লোভ জাগতে পারে। তাই কথা দিতে পারি না। তবে লোভ না হলে, ফিরিয়ে দেব।'

রুডলফ কি যেন ভাবল। তারপর ছড়িটা শূন্যে তুলে ঘোরাল একবার।

ছড়িটা ঘোরাতে কুয়াশার মনে কোন সন্দেহ জাগল না। সন্দেহ না জাগাটাই কাল হলো তার জন্যে।

রুডলফের হাতে রিভলভার থাকলেও সে জানত কুয়াশার ওভারকোটের পকেটেও রিভলভার আছে এবং সেটা ধরে আছে কুয়াশা ডান হাত দিয়ে। রুডলফ জানে, গুলি করতে গেলে গুলি খাবার আশঙ্কাও ষোলো আনা। কুয়াশা বিদ্যুতের গতির সাথে পাল্লা দিতে পারে।

গুলি করার ঝুঁকি তাই নেবার কথা ভাবছিল না রুডলফ।

এদিকে কুয়াশা ভুলেই গেছে একটা কথা। দরজার বাইরে বারান্দায় যে ছড়ির শব্দ হয়েছিল এই ব্যাপারটাকে রুডলফের উপস্থিতির ফলে গুরুত্ব দেয়নি সে।

রুডলফ শূন্যে ছড়ি ঘোরাতেই দরজার কবাট নিঃশব্দে খুলে গেল।

পায়ের শব্দ পেল কুয়াশা কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। শীতল ধাতব পদার্থের স্পর্শ অনুভব করল সে মাথার পিছনে ঘাড়ের উপর।

স্থির পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল কুয়াশা।

'বাহ্! চমৎকার! মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, মি. কুয়াশা, এত সহজে তোমাকে কাবু করা সম্ভব, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না। যে মি. কুয়াশাকে আমি চিনতাম, সে ছিল যেমন দুর্ধর্ষ তেমনি দুঃসাহসী। ডজনখানেক রিভলভারের সামনেও সে বাঘের মত গর্জন করত, স্প্রিঙের মত লাফাত। নাহ্, তুমি বুড়ো হয়ে গেছ, বন্ধু! তোমার সাথে প্রতিযোগিতা জমবে না আর।'

কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছিল রুডলফ। কুয়াশার মুখোমুখি এসে থামল সে। ঠাণ্ডা, নির্বিকার দৃষ্টিতে দেখছে তাকে কুয়াশা।

কুয়াশার ওভারকোটের বাঁ দিকের সাইড পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে পোর্টেবল সেফটা বের করে নিল রুডলফ। এক পা এক পা করে পিছিয়ে গেল সে। উজ্জ্বল, বিজয়ীর হাসিতে তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

'মাই ডিয়ার ওল্ড ফ্রেণ্ড, গুডবাই! বিলীভ ইট অর নট, তোমার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে। শত্রু হলেও তুমি ছিলে আমার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। তোমার সাথে প্রতিযোগিতায় অ্যাডভেঞ্চার ছিল, থ্রিল ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বয়স তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে সাহস, গতি, তেজ এবং বুদ্ধি। তোমাকে জানিয়ে যাচ্ছি,

তোমার সাথে এখন থেকে আমার কোন বিরোধ নেই। আমার সাথে প্রতিযোগিতা করার উপযুক্ততা তুমি হারিয়েছ।'

'বড্ড বেশি কথা বলছ তুমি। আগে এত কথা কিন্তু বলতে না।' শান্তভাবে কথাগুলো বলল কুয়াশা।

হোঃ হোঃ শব্দে হেসে উঠল প্রিন্স রুডলফ।

রুডলফের হাসির উত্তর দিল কুয়াশার ওভারকোটের পকেটের ভেতর থেকে ওয়েবলি অটোমেটিকটা। দুপ্ করে মৃদু শব্দ হলো মাত্র।

গুলি করার সাথেই লাফ দিয়ে সরে গেল কুয়াশা। বুলেটটা গুঁড়ো করে দিয়েছে সিটিংরুমের একমাত্র বালবটাকে। গাঢ় অন্ধকারে আবার শব্দ উঠল সাইলেন্সার লাগানো রিভলভারের—দুপ্! কুয়াশা নয়, এবার গুলি করেছে রুডলফের অনুচর।

গুলি করেছে লোকটা অনুমানের উপর, সামনের দিকে। গুলিটা কুয়াশাকে লেগেছে কিনা বোঝার জন্যে কান পেতে রইল সে, কোন যন্ত্রণাক্ত ধ্বনি শোনায় আশায়। এমন সময়, কে যেন তার হাঁটু দুটো ধরে শূন্যে তুলে ফেলল তাকে। কিছু করার আগেই শূন্যে নিক্ষিপ্ত হলো সে। সিলিংয়ের গায়ে গিয়ে সজোরে ধাক্কা খেল মাথাটা। অসহনীয় যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল লোকটা। সশব্দে পড়ল সে কার্পেটের উপর। বেকায়দায় পড়ে ডান পাটা মচকে গেল তার। জ্ঞান হারাল সে।

খুট করে শব্দ হলো।

উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল সিটিংরুম। আলো জ্বেলে ডি. কস্টা দেখল, প্রিন্স রুডলফ নেই।

নেই কুয়াশাও।

চারদিকে কোথাও কোন শব্দ নেই।

পাঁচ

সিটিংরুমের জানালা গলে অন্ধকার বাগানে নামল কুয়াশা। চোখ এবং কান সজাগ রেখে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল সে অন্ধকারে। গাঢ় কুয়াশায় ভাল দেখা যায় না কিছু, তবু রুডলফের মূর্তিটাকে দেখতে পেল সে।

বাগানের কালো পাঁচিলের কাছে চক চক করে উঠল সাদাটে কিছু একটা রুডলফের হ্যাট ওটা, অনুমান করল কুয়াশা।

অগ্রসর হলো কুয়াশা। নিঃশব্দে হাঁটার ব্যাপারে কুয়াশার জুড়ি নেই। বিড়ালের নিপুণতাও হার মানে তার কাছে। কয়েক পা এগোবার পর কুয়াশা শুনতে পেল রুডলফের পদশব্দ। পাঁচিল ঘেঁষে গেটের দিকে পালাচ্ছে সে।

মুচকি হেসে এগোতে লাগল কুয়াশা। রুডলফ গেটের কাছাকাছি চলে গেছে। কিন্তু কুয়াশা তাকে অনুসরণ করল না। সোজা পাঁচিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। পাঁচিলের গায়ে পা দিয়ে উঠে পড়ল মাথায়।

গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে হাত বিশেক বাঁয়ে। পাঁচিলের সমতল মাথায় পা ফেলে ফেলে এগোল কুয়াশা।

গাড়িটার কাছে পৌঁছে বসে পড়ল সে। বাঁ দিক থেকে ছুটে আসছে একটা মূর্তি। রুডলফ।

কুয়াশার ঠিক নিচেই বড় আকারের মার্সিডিজ বেঞ্জটা দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির শোফার বসে আছে ভিতরে।

রুডলফ কোন দিকে না তাকিয়ে গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল, কুয়াশার ঠিক নিচে। রুডলফের মাথার চুল মুঠো করে ধরে ফেলতে পারে কুয়াশা এখন।

কিন্তু তেমন কিছু করল না সে। রুডলফ ত্রস্ত ভঙ্গিতে দরজা খুলে গাড়ির ভিতর প্রবেশ করল।

স্টার্ট নিল মার্সিডিজ। মুহূর্ত-মাত্র বিলম্ব না করে নিঃশব্দে নেমে পড়ল কুয়াশা গাড়ির ছাদে। হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল সে মসৃণ ছাদের গায়ে।

কাজটা যে প্রায় পাগলামির পর্যায়ে পড়ে সে ব্যাপারে সচেতন কুয়াশা। মার্সিডিজ যে কোথায় গিয়ে থামবে, জানে না সে। ইউরোপের যে কোন দেশে যেতে পারে এটা মাঝপথে কোথাও একবারও না থেমে। কিংবা, হয়তো তিনশো মাইল এক নাগাড়ে ছোটার পর কোথাও থামবে। সেখান থেকে কুর্কাজা হোটেলে ফেরা সহজ হবে না মোটেই। তাছাড়া, গাড়ির ছাদ এমনই মসৃণ যে ঝাঁকুনিতে বা বাঁক নেবার সময় কুয়াশা পড়ে যেতে পারে যে-কোন মুহূর্তে। বিদ্যুৎবেগে গাড়ির ছাদ থেকে পড়ে যাওয়া মানে মারাত্মকভাবে আহত হওয়া কিংবা নিহত হওয়া। তার উপর রুডলফ বা পুলিসের চোখে ধরা পড়ে যাবার ভয় তো আছেই।

ওদিকে, ওমেনা এবং ডি. কস্টার কাঁধে সে দিয়ে এসেছে একটা লাশ এবং একজন বন্দীর বোঝা। ওরা জানেও না, কোথায় যাচ্ছে সে। সে নিজেও কি জানে!

কিন্তু জানতে হবে। রুডলফের আস্তানাটা চিনতে হবে। আস্তানাটা চেনার জন্যেই কুয়াশা এতগুলো ঝুঁকি নিয়েছে।

ওমেনার বুদ্ধির উপর আস্থা আছে তার। ডি. কস্টা এবং ওমেনা দু'জন মিলে চেষ্টা করলে সবরকম বিপদ থেকে সাময়িকভাবে হলেও মুক্ত থাকতে পারবে, এ বিশ্বাস তার আছে।

গাড়ি ছুটছে। ছাদের উপর শুয়ে থাকাটা প্রায় অসম্ভব বলে মনে হলো। পিছলে দেহটা একবার এদিক, আরেকবার ওদিকে সরে যাচ্ছে। জোরে গাড়িটা যদি ঝাঁকুনি খায়, পড়ে যাবে সে।

পিছনের দিকের দু'কোনার খাঁজে দু'পায়ের জুতোর আগা ঠেকিয়ে রাখল কুয়াশা। একইভাবে সামনে দু'কোনার খাঁজে রাখল দু'হাতের আঙুলগুলো। ফলে মৃদু ঝাঁকুনিতে বিপদের আশঙ্কা রইল না।

গাড়ির গতিবেগ ক্রমশ বাড়ছে। বাঁক নেবার সময় বিপদের গুরুত্বটা টের পেল কুয়াশা। চার কোনার খাঁজ থেকে পা এবং হাতের আঙুল সরে গেল। প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে ছাদের উপর রাখতে সফল হলো বটে, কিন্তু ঘেমে একাকার হয়ে

গেল মাত্র তিন কি চার সেকেণ্ডের মধ্যে।

পরবর্তী বাঁকে যে কি পরিণতি হবে ভাবতেও শিউরে উঠল কুয়াশা। মাথা উঁচু করে সামনের দিকে তাকাল কুয়াশা। অদূর ভবিষ্যতে গাড়ি আবার বাঁক নেবে বলে মনে হলো না তার। বাই-ওয়ে ধরে ঝড়ের বেগে ছুটছে মার্সিডিজ। দেহটা বাঁকা করে একপাশে সরিয়ে আনল সে মাথাটা। গাড়ির পাশে মাথা নামিয়ে দিয়ে উঁকি দিল সে।

আলোকিত গাড়ির ব্যাক সীটে বসে আছে রুডলফ। কোলের উপর রেখেছে সে পোর্টেবল সেফটাকে। তৃপ্তি এবং বিজয়ের ফলে মিটি মিটি হাসছে আপন মনে রুডলফ।

মাথা তুলে নিয়ে আবার চারকোনার চার খাঁজে পা এবং হাতের আঙুল রাখল কুয়াশা। চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করল সে। রুডলফের কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে, এমিলো অনুসরণ করছিল বিজিম্যানকে। সে বিজিম্যানকে মুক্ত করল। এমিলো বিজিম্যানকে কুয়াশার হাত থেকে মুক্ত করার চেষ্টা না করে খুনই করে ফেলল ওকে। এবং এমিলোর কাছ থেকে খবর পেয়েই রুডলফ নিজে হোটেলে পৌঁছুল। পোর্টেবল সেফটাই এত সব দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী। সেটা এখন রুডলফের দখলে।

শহর ছাড়িয়ে পাহাড়ী এলাকায় প্রবেশ করল মার্সিডিজ। এরমধ্যে বার চারেক বাঁক নিয়েছে গাড়িটা। নিজের কৃতিত্ব যতটুকু, তার চেয়ে বেশি ভাগ্যগুণে প্রতিবার নিচে ছিটকে পড়া থেকে বেঁচে গেল কুয়াশা।

অবশেষে একটা প্রাইভেট রোডে প্রবেশ করল মার্সিডিজ। রাস্তার শেষে প্রকাণ্ড একটা লোহার গেট। সেটা খুলে যাচ্ছে, মাথা তুলতে দেখতে পেল কুয়াশা। গেটের ভিতর দুর্গের মত গম্ভীর চেহারার মস্ত একটা বাড়ি।

রুডলফের আস্তানা।

গেটম্যানকে দেখতে পেল কুয়াশা হেডলাইটের আলোয়। রুডলফ অর্থাৎ তার মনিবকে সম্মান জানাবার জন্যে লোকটা মাথা হেঁট করায় সুবিধে হলো কুয়াশার। লোকটার চোখে ধরা পড়ল না সে।

গেট অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করল মার্সিডিজ।

দু'পাশে ফুলের বাগান। মাঝখানে কংক্রিটের রাস্তা। গাড়ি-বারান্দাটা দেখা যাচ্ছে সামনে।

এই-ই সুযোগ। গাড়ির ছাদ থেকে লাফ দিল কুয়াশা। বাগানের ভিতর পড়ল সে। এতটুকু নড়ল না কুয়াশা। শুধু মাথাটা একটু উঁচু করল। গাছেব ফাঁক দিয়ে সে দেখল গাড়ি-বারান্দায় থামছে মার্সিডিজ।

গাড়ি থেকে রুডলফ নামল। হাতের দস্তানা খুলতে খুলতে তিনটে ধাপ টপকে করিডরে উঠল সে। বন্ধ হয়ে গেল করিডরের দরজা।

গেটম্যান গাড়ির কাছে পৌঁছুল। গাড়ি থেকে নামল শোফার। কামানো মাথা লোকটার। বৈদ্যুতিক আলোয় চকচক করছে। ভাটার মত বড় বড় লাল চোখ।

গেটম্যানের কাঁধে হাত রেখে কথা বলতে বলতে হেসে উঠল সে শব্দ করে। কর্কশ, বেসুরো কণ্ঠস্বর।

গেটম্যান ফিরে গেল গেটের দিকে। শোফার দৈত্যটা গাড়িতে উঠল। গাড়ি-বারান্দায় গাড়ি ঘুরিয়ে গেটের দিকে মুখ করে রাখল সেটাকে। তারপর স্টার্ট বন্ধ করে দিয়ে আবার গাড়ি থেকে নামল। শিস দিতে দিতে দুর্গের পিছন দিকে চলে গেল সে।

বাগান থেকে উঁচু দুর্গটার উপর দিকে তাকাল কুয়াশা। জানালা দরজা সব বন্ধ। শুধু চারতলার একটা জানালা দিয়ে মৃদু আলোর রশ্মি বেরিয়ে আসছে, জানালাটার পাশেই একটা ব্যালকনি। ব্যালকনির দরজা বন্ধ।

ওখানে পৌঁছুতে হবে। সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। চারতলার ওই আলোকিত রুমে কিভাবে পৌঁছুনো সম্ভব ভেবে নিয়েছে সে। জানালার কার্নিস, পানির পাইপ, ব্যালকনির রেলিং ইত্যাদি ধরে ঝুলতে ঝুলতে উঠতে হবে তাকে। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

পানির পাইপ বেয়ে দোতলা পর্যন্ত উঠল কুয়াশা। একটা অচেনা পাখি ডেকে উঠল কানের কাছে। পাখা ঝাপটাবার শব্দ হলো। ক্রমশ, মিলিয়ে গেল সে-শব্দ দূরে। একটা জানালার কার্নিসে পা দিয়ে ডান হাত উঁচু করে ধরার চেষ্টা করছে সে ব্যালকনির কার্নিস। জানালাটার মাথায় শেড আছে, সেটা ধরে রেখেছে সে বাঁ হাত দিয়ে।

চারদিকে শীতল রাত্রির নিস্তব্ধতা। কেউ কোথাও জেগে নেই। গেটটা অবশ্য দেখা যাচ্ছে। গুমটি ঘরে গেটম্যান ঢুকেছে খানিক আগে। সম্ভবত শুয়ে পড়েছে সে। গুমটি ঘরের জানালাটা দেখা যাচ্ছে, অন্ধকার সেটা। জানালা দিয়ে গেটম্যান কুয়াশাকে দেখে ফেলতে পারে হঠাৎ। কিংবা, এই মুহূর্তে হয়তো, সে অবাক বিস্ময়ে কুয়াশাকেই দেখছে।

রক্তহিম করা তীক্ষ্ণ একটা আর্ত চিৎকার প্রবেশ করল কুয়াশার কানে। শব্দটা এমনই অপ্রত্যাশিত এবং যন্ত্রণাক্ত যে কুয়াশার মত অকুতোভয় মানুষকেও বেসামাল করে তুলল। বাঁ হাতটা ফস্কে যাচ্ছিল শেড থেকে, শেষ মুহূর্তে সেটা শক্ত করে ধরে ফেলায় বেঁচে গেল সে।

দীর্ঘ আর্ত চিৎকারটা থামল একসময়। কিন্তু কুয়াশা এমনই নাড়া খেয়েছে যে নড়াচড়ার কথা ভুলে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল সে দীর্ঘ দশ সেকেণ্ড।

আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেছে চারদিক। স্বপ্নের মত মনে হলো ব্যাপারটাকে। নিস্তব্ধতা এমনই জমাট বেঁধে গেছে যে বিশ্বাস করাই কঠিন এই মাত্র কোন লোক অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠেছিল।

ডান হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল কুয়াশা। এমন বিদঘুটে চিৎকার এর আগে কখনও শোনেনি সে। সর্ব শরীরের লোম দাঁড়িয়ে আছে এখনও তার। হৃৎপিণ্ডের গতি গেছে বেড়ে।

চিৎকারটা উপরের কোন রুম থেকেই এসেছে। হাত উঁচু করে ব্যালকনির

কার্নিস ধরতে গিয়ে আবারও ব্যর্থ হলো কুয়াশা। ঝুঁকিটা নিতেই হবে, সিদ্ধান্ত নিল সে। লাফ দিল কুয়াশা। শূন্যে উঠে গেল তার দেহ। ব্যালকনির নিচের কার্নিস নয়, উপরের রেলিঙের মাথা ধরে ফেলল সে। কার্নিসে পা তুলে দিয়ে উঠে পড়ল লাফ দিয়ে রেলিংয়ের উপর। রেলিংয়ের উপর দাঁড়িয়ে আবার লাফ দিল সে।

চারতলার আলোকিত জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। জানালায় কাঁচের শার্সি, তার উপর পর্দা ঝুলছে। পর্দার ফাঁক দিয়ে কাঁচের শার্সি ভেদ করে রুমটার ভিতর তাকাতে কুয়াশা দেখল রুডলফ বসে আছে একটা টেবিল সামনে নিয়ে তার লাইব্রেরী রুমে।

জ্বলন্ত চুরুট দাঁত দিয়ে ধরে রেখেছে রুডলফ। টেবিলের উপর ডান হাতের তর্জনী দিয়ে ঠকঠক করে টোকা মারছে সে। ঠোঁটে বিচিত্র একটুকরো হাসি ঝুলছে।

মুখোমুখি বসে আছে একটা কাঠের চেয়ারে একজন লোক। লোকটার পরনে না আছে সোয়েটার, না আছে কোট, না আছে ওভারকোট। ট্রাউজার এবং শার্ট পরে আছে সে এই প্রচণ্ড শীতে। লোকটা স্বাস্থ্যবান, বয়স রুডলফের চেয়ে বেশি হবে। পঁয়তাল্লিশ তো হবেই।

লোকটা হাত দুটো চেয়ারের হাতলের সাথে চকচকে ধাতব পদার্থের হ্যাণ্ডকাফ দিয়ে আটকানো। ইস্পাতের তৈরি একটা গোলাকার যন্ত্র লোকটার মাথাকে ঘিরে রেখেছে। যন্ত্রটা মাথার সাথে এঁটে বসে আছে শক্তভাবে। তার বুক এবং চেয়ারের পিঠকে জড়িয়ে রেখেছে লোহার শেকল।

রুডলফ কথা বলছে জার্মান ভাষায়। 'দেখো, কাকোস, উন্নতি করতে হলে, সফলতা লাভ করতে হলে অনেক নিয়ম-নীতি আছে। আমি সবচেয়ে সহজতম নিয়মটা মেনে চলি। লোককে ততক্ষণ ভালবাসি যতক্ষণ তাকে দিয়ে কাজ আদায় করা যায়। তারপর তাকে সরিয়ে দিই। একটা কাজে তোমাকে দরকার ছিল আমার। কাজটা মোটামুটি শেষ হয়েছে। আমার কাছে তুমি কাজ উদ্ধারের জন্যে একটা যন্ত্র বৈ কিছু ছিলে না। আর মাত্র একটা কাজ করতে হবে তোমাকে। কমবিনেশন মিলিয়ে সেফটা খুলে দাও। ব্যস, তারপর তোমাকে আর দরকার হবে না আমার। তোমার সাহায্য ছাড়াও এটা খোলা সম্ভব। কিন্তু তাতে সময় লাগবে, ঝামেলা বাড়বে। খুলে দিলে তুমিও শারীরিক যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে।'

নিষ্ফল আক্রোশে কাকোস চেঁচিয়ে উঠল, 'শয়তান! বিজিম্যানকে তাহলে এই ভাবেই খুন করেছ!'

কাকোস শরীর মোচড়াতে লাগল চেয়ারে বসে। পা দুটো পায়ার সাথে, হাত দুটো হাতলের সাথে বাঁধা, নিজেকে মুক্ত করার কোন উপায়ই তার নেই।

কুয়াশা দেখল, কাকোস হাত দুটো অবিরাম মোচড়াচ্ছে বলে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে কব্জি দুটোর কাছে, ফোঁটা ফোঁটা তাজা রক্ত পড়ছে কার্পেটের উপর।

রুডলফ বলে চলেছে, 'না হে, না। বিজিম্যানকে খুন করেছে এমিলো। বিজিম্যান ইনসব্রুকে সত্যিই পৌঁছেছিল। পথে তাকে পুলিসে ধরে। মজার ব্যাপার

হলো, পুলিসদের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করে আমারই পুরানো এক বাঙালী পরম বন্ধু। সৌভাগ্যক্রমে, আগের সেই তীক্ষ্ণধার বুদ্ধি এবং বেপরোয়া সাহস নেই বন্ধুটির মধ্যে। তাই তেমন কোন কষ্টই হয়নি আমার তার কাছ থেকে তোমার সম্পত্তিটা কেড়ে নিয়ে আসতে। সবই তো জানালাম। এবার বলো, কাকোস, সেফটা খুলবে?'

'অসম্ভব! আমাকে মেরে ফেললেও…'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল রুডলফ। হাসি থামিয়ে বলল, 'মেরে তো ফেলবই, এ ব্যাপারে তোমার কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, কিভাবে মরতে চাও তুমি? কষ্ট পেয়ে, না কষ্ট না পেয়ে?'

কাকোসের সর্ব শরীর পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে। রক্ত চক্ষু মেলে রুডলফের দিকে তাকিয়ে রইল সে। বলল, 'যেভাবে খুশি মারো আমাকে, রুডলফ। কিন্তু একটা কথা তোমারও জানা থাকুক, সেফের তালা আমি খুলে দিচ্ছি না।'

'স্পষ্ট ভাষায় যারা কথা বলে তাদেরকে আমি পছন্দ করি। খুলবে না তাহলে? আর একবার শুনতে চাই উত্তরটা।'

'না! না! না!'

চিৎকার করে উঠল কাকোস। বলতে লাগল, 'আমাকে মেরে ফেলবে তুমি, আর তোমার কাজ সহজ করার জন্যে তালাটা খুলে দেব। আমি…এত ভীতু আর বোকা মনে করো তুমি আমাকে? সেফটা তোমার পক্ষে খোলা সম্ভব নয়, রুডলফ। এ তুমিও জানো। খুলতে হলে আমার সাহায্য ছাড়া তোমার উপায় নেই। এবং আমার সাহায্য পেতে হলে আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে। এর জন্যে সময় দরকার…।'

রুডলফ গম্ভীর হয়ে উঠল, 'সময় দরকার? আর কত সময় নষ্ট করব আমি? এই সেফে যা আছে তা হস্তগত করার যে পরিকল্পনা তুমি রচনা করেছিলে, তার কথা গত তিন মাস আগেই জেনেছি আমি। প্রথমে খুব দ্বন্দ্বে ভুগেছি। প্রায় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম, একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে তোমাকে মাটির নিচে পাঠিয়ে দিই স্থায়ীভাবে। কিন্তু পরে ভেবেচিন্তে বের করি এই ব্যবস্থাটা। ঠিক করি, তোমার কাজে বাধা না দিয়ে সুযোগের সন্ধানে ওত্ পেতে বসে থাকব আমি। ধুরন্ধর লোক তুমি, অর্গানাইজড্ দল আছে ছোটখাট একটা, জানতাম ঠিকই তুমি বের করে আনবে মহামূল্যবান জিনিসটা। আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম, চোরাপথে চোরাচালান হয়ে ইউরোপে যখন জিনিসটা প্রবেশ করবে, যখন ওটা গ্রহণ করার জন্যে তুমি নির্দিষ্ট জায়গায় অধীর হয়ে অপেক্ষা করবে ঠিক তখনই চিলের মত ছোঁ মারব আমি। তোমার বন্দীদশা এবং আমার হাতে সেফের উপস্থিতি দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমার পরিকল্পনাটা ষোলো আনার উপর সতেরো আনা সফল হয়েছে। সমস্যা এখন একটাই, সিক্রেট কমবিনেশন মিলিয়ে সেফের তালাটা খুলতে হবে। খুলে দাও, কাকোস।'

রুডলফের শেষ কথাটা অস্বাভাবিক গম্ভীর শোনাল।

'অসম্ভব! আমি বরং মরব তবু···।'

'মরবে তো বটেই! কিন্তু তালা না খুললে মৃত্যুও নেই তোমার কপালে। কপালে জুটবে শুধু তীব্র, অসহনীয় যন্ত্রণা। কাকোস, সম্ভবত যন্ত্রণার স্বাদটা তুমি ভুলে গেছ। ফ্রিজকে আর একবার স্মরণ করিয়ে দিতে বলি, কেমন?'

কাকোসের চেয়ারের পিছনে উঁচু একটা টুলের উপর বসে আছে একজন লোক। লোকটা এতটুকু নড়াচড়া করেনি এতক্ষণ। পাথরের মূর্তির মত বসে আছে সে। ডান চোখের মণি নেই তার, মণির জায়গায় গভীর একটা কালো গহ্বর। ফর্সা মুখে তামাটে রঙের অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন। আসলে ওগুলো পক্সের দাগ।

রুডলফ হাত নেড়ে ইঙ্গিতে নির্দেশ দিল ফ্রিজকে। ফ্রিজ দাঁত বের করে হাসল নিঃশব্দে। হাসলে বীভৎস রূপ ধারণ করে ফ্রিজের মুখটা। কদর্য, কুৎসিত লাগে চেহারাটা।

পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে আবার কাকোসের শরীর। দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা সহ্য করার জন্যে সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করছে সে। হু-হু করে ঘামছে সে। চেয়ারের হাতলের সাথে বাঁধা হাত দুটো কাঁপছে তার।

'নাকি মত বদলাবে?' সহাস্যে জিজ্ঞেস করল রুডলফ।

চেয়ারের হাতলের অগ্রভাগ চেপে ধরল কাকোস। আঙুলের মাথাগুলো সাদা, রক্তশূন্য হয়ে গেল। চাপা, প্রায় রুদ্ধ গলায় সে বলল, 'না!'

ফ্রিজকে অনুমতি দিল রুডলফ আস্তে করে মাথাটা এক দিকে কাত্ করে।

ফ্রিজের হাতটা উঠে গেল কাকোসের মাথার পিছনে। কাকোসের মাথার চারদিকে আটকানো যন্ত্রটার হাতলটা পিছন দিকেই। হাতলটা ধরে ঘোরাতে শুরু করল ফ্রিজ ধীরে ধীরে।

শিউরে শিউরে উঠছে কাকোস। চোখ দুটো বুজে ছটফট করতে শুরু করল সে একটু পরেই। গলা থেকে বেরিয়ে আসছে দুর্বোধ্য, যন্ত্রণাক্ত গোঙানি।

ফ্রিজ নির্বিকার। আরও ঘোরাচ্ছে সে হাতলটা। আরও ধীরে ধীরে।

রুডলফ হাসছে মুচকি মুচকি। তর্জনী দিয়ে টোকা মারছে সে টেবিলে, ঠক, ঠক, ঠক···।

দাঁতে দাঁত চেপে ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছিল কুয়াশা। রুডলফের পাষণ্ডতা দেখে তার ইচ্ছা হলো গলা চেপে ধরে শ্বাসরুদ্ধ করে শয়তানটাকে খুন করার। কিন্তু সময় হয়নি এখনও, অনুভব করল সে। সময় না হলে নাটকের মঞ্চে প্রবেশ করা উচিত নয়। কিন্তু ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে!

ওভারকোটের পকেট থেকে ওয়েবলি অটোমেটিকটা বের করল কুয়াশা। রুডলফকে শায়েস্তা করা দরকার। এই মুহূর্তে। বড় বেশি বেড়ে গেছে সে।

এমন সময় রুডলফ হাত-ইশারায় ফ্রিজকে থামতে নির্দেশ দিল। কাকোস তখনও ছটফট করছে তীব্র ব্যথায়।

ছয়

'কাকোস, খুলবে তালা?'

কাকোস চোখ মেলল। চোখের সাদা অংশটা রক্তের মত লাল দেখাচ্ছে তার। চিৎকার করে বলতে চাইলেও গলা দিয়ে তেমন শব্দ বের হলো না কাকোসের। 'না।'

অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল কুয়াশা কাকোসের উত্তরটা।

ধীরে সুস্থে নতুন একটা চুরুট ধরাল রুডলফ। পোর্টেবল সেফটা তুলে নিয়ে কাকোসের কাছাকাছি টেবিলের উপর রাখল সে।

'এখনও চিন্তা করে দেখো। তুমি তৈরি হলেই সেফটাকে সামনে পাবে। একবার শুধু রাজি হও, অমনি ফ্রিজ ঘুরিয়ে ঢিলে করে দেবে স্ক্রুটা। আরাম পাবে। যদি চাও দু'ঢোক ব্র্যাণ্ডিও খাওয়াবে তোমাকে ফ্রিজ। তারপর হাতের হ্যাণ্ডকাফ খুলে দেবে সে তোমার। তুমি সেফের তালাটা খুলে দিলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ঠিক আছে, কথা দিচ্ছি, তোমাকে শেষ পর্যন্ত মেরে ফেলা হবে কি হবে না সে ব্যাপারে দ্বিতীয়বার ভাবনাচিন্তা করে দেখব আমি।'

কথা বলতে বলতে ইশারা করল রুডলফ। ফ্রিজ হাতল ঘোরাতে শুরু করল আবার।

আবার সেই রক্ত হিম করা তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার কানে ঢুকল কুয়াশার।

আর্ত চিৎকারটা কানে ঢুকতে এবারও কুয়াশা আর একটু হলে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল।

নিজেকে সামলে নিয়ে রুমের ভিতর তাকাল সে। দেখল ফ্রিজ টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। কাকোসের পাশে দাঁড়িয়ে চাবি দিয়ে হাতের হ্যাণ্ডকাফ দুটো খুলে দিচ্ছে সে।

কাঁপা, রক্তাক্ত হাত দুটো টেবিলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কাকোসের। জুলফি, কপাল বেয়ে ঘামের ধারা নামছে। চিবুক থেকে টপ টপ করে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম পড়ছে তার বুকে, উরুতে।

কাঁপা হাতে সেফটা ধরল কাকোস।

রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে রুডলফ। বিজয়ীর হাসিতে উদ্ভাসিত গোটা মুখ।

কাকোসের গলা থেকে উঠে আসছে দুর্বোধ্য, মৃদু একটা ধ্বনি। অনেকটা গোঙানির মত শোনাচ্ছে শব্দটা।

ভীত-ত্রস্ত কাকোস কমবিনেশন মিলিয়ে তালাটা খোলার কাজে মগ্ন। মাত্র বিশ কি পঁচিশ সেকেণ্ড পর খট্-খট্ খটাস করে শব্দ বেরিয়ে এল তালাটার ভিতর থেকে। তারপর সশব্দে স্প্রিঙের মত লাফ দিয়ে উন্মুক্ত হয়ে গেল সেফের ঢাকনি। অবসাদে জ্ঞান হারাল কাকোস।

এই সময় জানালার কাঁচে ঘুষি মেরে ভেঙে ফেলল শার্সিটা কুয়াশা, লাফ দিয়ে প্রবেশ করল লাইব্রেরী রুমের মেঝেতে।

মেঝেতে পা দিয়েই কুয়াশা হুমকি দিয়ে বলল, 'এতটুকু নড়েছ কি মরেছ। রুডলফ, সিধে হয়ে বসো তুমি। ফ্রিজ, যেখানে দাঁড়িয়ে আছ সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো, আর বন্ধ করো চোখের পাতা! চোখটা খুলতে দেখলে গুলি করব আমি।'

সিধে হয়ে বসল না শুধু রুডলফ, সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে একেবারে। নিষ্পলক চোখে চেয়ে আছে সে কুয়াশার মুখের দিকে। বিস্মিত দৃষ্টি চোখে, নিজের চোখকেই যেন সে বিশ্বাস করতে পারছে না।

কুয়াশা রুডলফের দিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল কাকোসের মাথার পিছনে। হাতলটা ঘুরিয়ে তার মাথা থেকে খুলে নামিয়ে রাখল টরচার মেশিনটাকে।

'মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, মি. কুয়াশা, আমি পুরোপুরি নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি টরচার-মেশিনটা এমনই একটা মেশিন যে এর সাহায্যে যাকে কষ্ট দেয়া হয় তার মাথার চারদিকে সামান্য পরিমাণ দাগও তুমি দেখতে পাবে না। প্রমাণ করাই সম্ভব নয় যে কেউ তাকে কষ্ট দিয়েছে।'

'নিশ্চয়ই এটার আবিষ্কারক তুমি নিজে?' কুয়াশা গম্ভীরভাবে জানতে চাইল।

রুডলফ হাসল। বলল, 'মিথ্যে কথা বলব না, তুমি ঠিকই ধরেছ।'

কুয়াশা হঠাৎ মুচকি হাসল, 'নিজে কখনও পরীক্ষা করে দেখেছ যন্ত্রটাকে? আই মীন, নিজের ওপর পরীক্ষা করেছ কখনও?'

রুডলফের মুখ ম্লান হয়ে গেল। বলল, 'কি বলতে চাও তুমি?'

কুয়াশা বলল, 'বুঝতে পারোনি?'

রুডলফ চুপ করে রইল। ঢোক গিলল সে।

কুয়াশা বলল, 'বুঝতে ঠিকই পেরেছ। হ্যাঁ, রুডলফ, যন্ত্রটা সত্যি কোনরকম দাগ রাখে কিনা দেখার জন্যে তোমার ওপর পরীক্ষা করব আমি। পরম বন্ধু তুমি আমার, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে কি বেছে নিতে পারি অ মি?'

রুডলফ বলল, 'কাকোসের সাথে কথা বলবার সময় তোমার পরিচয় দিই পরম বন্ধু বলে। কিন্তু আমি জার্মান ভাষায় কথা বলছিলাম। তুমি জার্মান জানো তা তো জানতাম না!'

কুয়াশা সহাস্যে বলল, 'এইরকম শত শত ব্যাপার আছে যা তুমি জানো না, রুডলফ।'

রুডলফ নড করার ভঙ্গিতে মাথা নিচু করল একটু, 'মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, মি. কুয়াশা, তোমার যোগ্যতা এবং ক্ষমতা সম্পর্কে ভুল ধারণা করেছিলাম এবং সেজন্যে তোমার কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত। এই একই ভুল এর আগেও তোমার ব্যাপারে আমি করেছি।'

কুয়াশার চোখ পড়ল টেবিলের উপর, পোর্টেবল সেফের দিকে। সেফের ঢাকনিটা খোলা বটে কিন্তু ভিতরে কি আছে তা বোঝার উপায় নেই। কারণ লাল

মখমল বিছানো রয়েছে। মখমলের নিচে কি যে আছে, কে জানে!

চোখ তুলল কুয়াশা। রুডলফ চেয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। দু'জন দু'জনের দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ।

নিস্তব্ধতা ভাঙল রুডলফই, 'আমাকে কাবু করা সহজ কাজ নয়, বন্ধু। তাছাড়া, আমাকে খুন করে কি পাচ্ছ তুমি? ধরো, এখন যদি হঠাৎ চিৎকার করে উঠি আমি? জানো, দলের লোকেরা আশপাশেই আছে...'

'জানি না, জানার দরকারও নেই।' কথাটা বলেই কুয়াশা বিদ্যুৎ বেগে রিভলভার ধরা ডান হাতটা মাথার উপর তুলেই সবেগে নামিয়ে আনল সেটা ফ্রিজের মাথার মাঝখানে।

টুঁ-শব্দ করার অবকাশও পেল না কদর্য ফ্রিজ। হাঁটু দুটো ভাঁজ হয়ে গেল, হুড়মুড় করে ধরাশায়ী হলো তার জ্ঞানহীন দেহটা।

রুডলফের দিক থেকে চোখ না সরিয়ে শান্ত কণ্ঠে কুয়াশা বলল, চোখটা খুলেছিল, তাই। যা বলছিলাম, রুডলফ। তোমাকে খুন করে কিছু পাব কি পাব না তা জানি না। কিন্তু তোমাকে খুন না করলেও কিছু পাব না এটা জানি। কি জানো, একটুকরো উত্তপ্ত সীসা তোমার অ্যাপেনডিক্সের ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে ছুটে গেলে তোমার কি প্রতিক্রিয়া হয়, দেখতে ইচ্ছে করে।'

রুডলফ হাত বাড়িয়ে চুরুটের বাক্সটা টেনে নিল। বাক্স থেকে একটা চুরুট বেছে নিয়ে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল সে। বলল, 'কি জানো, বন্ধু, তোমার রসিকতা করার এই যে ক্ষমতা, এটাও আমার অজানা ছিল।'

হাত বাড়িয়ে গ্যাস লাইটারটা নিতে গিয়ে রুডলফ বিদ্যুৎবেগে একটা ঘটনা ঘটিয়ে বসল। বাড়ানো হাতটা এগিয়ে গেল লাইটারটাকে ছাড়িয়ে। সবেগে হাতটা ধাক্কা মারল সেফের ঢাকনিতে।

খোলা সেফটা বন্ধ হয়ে গেল এক পলকে।

রুডলফ হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল। হাসি থামাতে বলল, 'প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, আমার অ্যাপেনডিক্স আছে বুদাপেস্টে।'

রুডলফ জানে, তার প্রাণ ঝুলছে সরু একটা চুলের উপর। তবু, ভয়ের কোন ছাপ দেখা গেল না তার চেহারায়।

কুয়াশার চেহারা এমন হয়ে উঠেছিল মুহূর্তের জন্যে যে রুডলফ প্রমাদ গুনছিল, প্রায় ধরেই নিয়েছিল যে কুয়াশা গুলি করে তার ইহলীলা সাঙ্গ করতে যাচ্ছে।

রুডলফ তবু হাসতে পারল।

কুয়াশা বলল, 'খুব দেখিয়েছ বটে, রুডলফ। আর কিছু দেখাবার চেষ্টা কোরো না। যাও, দেয়ালের কাছে গিয়ে আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকো। হাত দুটো মাথার ওপর তুলে রাখতে ভুলো না যেন আবার।'

কুয়াশার গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে বিনাবাক্যব্যয়ে নির্দেশ পালন করল রুডলফ। শো-কেসের পাশে, দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াল সে।

রুডলফের দিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে পা দিয়ে একটা চেয়ার টেনে আনল

কুয়াশা। সেটায় বসে ক্রেডল থেকে তুলল রিসিভারটা। ডায়াল করতে শুরু করল সে।

ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে সাড়া পাওয়া গেল ওমেনার।

কুয়াশা বলল, 'ওমেনা, খবর কি তোমাদের? কোথায় আছি আমি? এই··· বন্ধুত্ব রক্ষা করছি।···দাঁড়াও, দাঁড়াও, একসাথে এত কথা জিজ্ঞেস কোরো না।··· আগে তোমাদের খবর শোনাও···তাই নাকি?···হুঁ, বুঝেছি! বলে যাও!'

ওমেনার কথা শুনতে লাগল কুয়াশা মনোযোগ দিয়ে।

মিনিট দেড়েক পর শেষ হলো ওমেনার কথা।

কুয়াশা বলল, 'আচ্ছা! তা মি. ডি. কস্টাকে দাও তো রিসিভারটা!'

ডি. কস্টা রিসিভার নিয়ে হাঁক ছাড়ল, 'বস্!'

'হ্যালো, মি. ডি. কস্টা! শুনুন, জরুরী ক'টা কথা বলছি। স্পীডি দেখে একটা গাড়ি যোগাড় করুন এক্ষুণি। জেনবারের মেইন রোডে পাবেন আমাকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ওমেনাকে নিয়ে পৌঁছে যান ওখানে। আমার আওতায় যে গাড়িটা রয়েছে সেটা তেমন ভাল নয়, তবু ওটা নিয়েই আমাকে অত দূরে পৌঁছুতে হবে। দেরি করবেন না যেন।'

কথা শেষ না করে গুলি করল কুয়াশা। এক সেকেণ্ড দেরি হয়ে গেছে তার, গুলি লাগল না রুডলফকে। শো-কেসের কবাট বন্ধ হয়ে গেছে, রুডলফ অদৃশ্য হয়ে গেছে সেটার ভিতর।

শো-কেসটা যে গোপন পথের ক্যামোফ্লেজ, জানা ছিল না কুয়াশার। রুডলফকে কবাট খুলে ভিতরে ঢুকতে দেখে গুলি করে সে। কিন্তু কবাট তখন বন্ধ হয়ে গেছে, গুলি কবাটের গায়েই লাগল।

রিসিভারটা তখনও কানের সাথে লাগানো।

উদ্বিগ্ন, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বারবার একই প্রশ্ন করে চলেছে ডি. কস্টা, 'হোয়াটস দ্য ম্যাটার বস্? হোয়াটস দ্য ম্যাটার বস্? বস্ হাপনি আহট হইয়াছেন কি? বস্ হাপনি আহট হইয়াছেন কি?'

কুয়াশা কথা না বলে হা-হা করে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে সে বলল, 'রুডলফ পালিয়ে গেল, মি. ডি. কস্টা। গুলি করেও রুখতে পারলাম না। সে যাক, আপনাকে যা বলেছি তাই করুন। গাড়ির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ুন এই মুহূর্তে।'

রিসিভার রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। পোর্টেবল সেফটা ওভারকোটের পকেটে ভরে নিল দ্রুত। তারপর জানালার উপর উঠল এক লাফে।

নিচে, গ্রাউণ্ড ফ্লোরে দেখা যাচ্ছে মার্সিডিজ বেঞ্জটাকে।

কুয়াশা নামতে শুরু করল নিচের দিকে।

সাত

আলো জ্বেলে রুডলফ এবং কুয়াশা দু'জনের কাউকে দেখতে না পেয়ে ডি. কস্টা

ওমেনার দিকে তাকাল, 'বসকে রুডলফ, না রুডলফকে বস কিডন্যাপ করিল?'

ওমেনা রক্তচক্ষু মেলে ডি. কস্টাকে দেখল। প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল একটা রিভলভারের সামনে।

রিভলভারটা রুডলফের জ্ঞানহীন অনুচরের হাত থেকে ছিটকে পড়ে গিয়েছিল। ওমেনা সেটা তোলবার জন্যে ঝুঁকতেই ডি. কস্টা হারে-রে রে রে করে ডাকাতের মত ছুটে এল।

'প্রিন্সেস! সাবধান! মাইয়া মানুষ আগ্নেয়-অস্ত্র ধরিবেন না! ও-জিনিস বাহাদুর পুরুষ মানুষকেই শুধু মানায়।'

ডি. কস্টা তুলে নিল রিভলভারটা। তাকাল রুডলফের অনুচরের দিকে।

ওমেনা তীব্র কণ্ঠে জানতে চাইল, 'তা বাহাদুর বীর পুরুষ, এই জ্ঞানহীন বন্দীকে নিয়ে কি করবে এখন শুনি? গুলি করে মেরে ফেলতে চাও নাকি?'

'নো-নো! হামরা শান্ট-শিষ্ট নিরীহ ভড্ডরলোক। খুন খারাবির মধ্যে নাই। হামরা মি. অনুচরকে নাইলন কর্ড ডিয়া বাঁটিয়া রাখিব। বসের সুটকেসে কর্ড আছে, লইয়া আসুন।'

ওমেনা সুটকেস খুলে নাইলন কর্ড বের করে আনল।

'হামাকে হেলপ করুন।'

দু'জনে মিলে অনুচরটিকে শক্ত করে বাঁধল ওরা। ডি. কস্টা বলল, 'এর মুখে টুলা গুঁজিয়া ডিলে ভাল হয়, টাই না?'

ওমেনা তুলো নিয়ে এল। বন্দীর মুখের ভিতর গুঁজে দিল ডি. কস্টা সেই তুলো।

ওমেনা বলল, 'এরপর? কুয়াশা কবে যে ফিরবে বলে যায়নি। ধরুন, এক সপ্তাহ পর ফিরবে সে।'

ডি. কস্টা আঁৎকে উঠল, 'সব্বোনাশ! ওয়ান উইক? সাট ডিন? সাট ডিনে বিজিম্যান ফুলিয়া-ফাঁপিয়া, পচিয়া···।' নাকে রুমাল চাপা দিল ডি. কস্টা। বলল, 'ডুর্গন্ধে মারা যাইব হামরা!'

পায়চারি শুরু করল ডি. কস্টা। চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে।

ওমেনা সোফায় বসে লক্ষ করছে ডি. কস্টাকে। একসময় বলল সে, 'মাথা গরম না করে হাতের কাজগুলো শেষ করা দরকার আমাদের। বিজিম্যান সম্পর্কে যথাসম্ভব তথ্য দরকার আমাদের। লাশটা সার্চ করা দরকার।'

ডি. কস্টা গম্ভীরভাবে বলল, 'হামিও টাই ভাবিটেছিলাম। আপনিও চলুন, হামাকে সাহায্য করিবেন।'

আসলে লাশের সাথে একা থাকতে পারবে না ডি. কস্টা, তাই ওমেনাকে সাথে নিতে চাইছে।

সোফা ছাড়ল ওমেনা, 'চলুন।'

দু'জনে কুয়াশার বেডরুমে হাজির হলো।

ডি. কস্টা রুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওমেনার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল,

'বস্ যতোক্ষণ না ফেরেন, হামাডের মধ্যে একটা সমঝোটা ঠাকা ডরকার।'

'সমঝোতা? কিসের সমঝোতা?'

ডি. কস্টা বলল, 'হামরা ঝগড়া করিটে পারিব না। টর্ক করিটে পারিব না। একজন আর একজনকে না জানাইয়া কোঠাও যাইটে পারিব না। কেহ কাহাকেও...'

'শুধু বকবক করা আপনার স্বভাব, না? যান, কাজে হাত দিন।'

ডি. কস্টা মুখ গোমড়া করে পা বাড়াল লাশের দিকে।

বিজিম্যানের কাপড়-চোপড় সার্চ করে পাওয়ার মধ্যে পাওয়া গেল কয়েকটা চিঠি। চিঠিগুলো লেখা হয়েছে প্যারিসের ঠিকানায়, বিজিম্যানের নামে। চিঠিগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। একটা চিঠি লেখা হয়েছে বীমার প্রিমিয়াম পরিশোধ করার জন্যে তাগাদা দিয়ে। দ্বিতীয় চিঠিটা লিখেছে বিজিম্যানের বুড়ী মা, টাকা চেয়ে। তৃতীয় চিঠিটা এক পুরানো বন্ধুর, কন্যার বিয়েতে নিমন্ত্রণ করে চিঠি লিখেছে সে।

খয়েরী রঙের সর্বশেষ এনভেলাপটা তুলে নিল ওমেনা খাটের উপর থেকে, 'এটা কি?'

ডি. কস্টা বলল, 'কিছু না, খালি, হামি পরীক্ষা করিয়া ডেকিয়াছি।'

আসলেও তাই, এনভেলাপটা খালি। কিন্তু ডি. কস্টার চোখে যা ধরা পড়েনি, ওমেনার চোখে তা ধরা পড়ল। এনভেলাপের উল্টোপিঠে সুন্দর হস্তাক্ষরে একটা ঠিকানা লেখা রয়েছে।

ঠিকানাটা নিম্নরূপ:

Zr 12 H Kurkaza

'স্যুইট নম্বর বারো, হোটেল কুর্কাজা। তার মানে? বিজিম্যান তাহলে প্যারিস থেকে এই হোটেলেই আসছিল?'

ডি. কস্টা বলল, 'টাজ্জব কি বাট!'

ওমেনা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বলল, 'বিশ-পঁচিশ মাইলের মধ্যে বড় হোটেল বলতে এই কুর্কাজাই। কোন অপরাধীদলের নেতা এই হোটেলটাকে তার হেডকোয়ার্টার তৈরি করলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মি. ডি. কস্টা আমাদের ঠিক মাথার উপর কোন রুমে হয়তো এই মুহূর্তে বসে আছে অপরাধী দলের নেতা...।'

ক্যাঙ্গারুর মত লাফ দিয়ে উঠল ডি. কস্টা, 'মাই গড! প্রিন্সেস, নাম্বার টুয়েলভ স্যুইট হামাডের এই স্যুইটের ঠিক উপরেই অবষ্ঠিট। হামরা যখন এখানে উঠি, ম্যানেজার হামাডেরকে এগারো নাম্বার রুম ডিটে চাহিয়াছিল। কিন্টু বস্ রাজি হন নাই। টিনি বারো নাম্বার স্যুইটটা চাহিয়াছিলেন। বারো নাম্বারে একটা ফায়ার-এস্কেপ আছে। কিন্টু গট কাল বারো নাম্বারটা ভাড়া হইয়া গিয়াছিল। টাই বস্ গ্রাউণ্ড ফ্লোরের এই স্যুইটটা পছন্দ করেন।'

ওমেনা বলল, 'এখন উপায়?'

'উপায় টো ডেকিনা। প্রিন্সেস, বিপড ঘটিটে পারে। এখুনি অপরাটীরা

সডলবলে এখানে উপস্থিত হইবে এবং আরও মার্ডার করিবে। হামি লুকাই।' বলে খাটের নিচে ঢুকতে চেষ্টা করল ডি. কস্টা।

ওমেনা ধমক দিয়ে বলল, 'কী আশ্চর্য! এমন ভীতু লোক তো আর দেখিনি! শুনুন, আমি দোতলাটা ঘুরে দেখে আসি। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন।'

'ড্যোটালায় যাইবেন? বাট হোয়াই?'

খাটের নিচে না ঢুকে ডি. কস্টা চঞ্চল দৃষ্টিতে দরজা আর জানালার দিকে তাকাতে তাকাতে ওমেনার কাছে সরে এল।

'বারো নম্বরে কেউ আছে কিনা জানা দরকার। আপনি এমন ভয় পেয়েছেন যে অগত্যা আমাকেই যেতে হবে দেখতে।'

'নো! এতটুকু ভয় পাই নাই। মাইয়া মানুষ চিরকাল অবলা। পুরুষমানুষ চিরকাল বাহাদুর। হামি ঠাকিটে হাপনি যাইবেন, টা কি হয়? হামি যাইটেছি। বলিয়া ডিন, এনিমিডের ডেখা পাইলে কি করা উচিট হইবে হামার? হামি কি টাহাদেরকে বণ্ডী করিয়া এইখানে নিয়া আসিব? নাকি, খুন করিয়া সমস্যার সমাঢান করিয়া আসিব?'

বাইরের ফায়ার এস্কেপটা খুঁজে বের করতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না ডি. কস্টাকে। লনে বেরিয়ে বাঁ দিকে খানিকটা এগোতেই লোহার দীর্ঘ একটা মই দেখতে পেল সে। নিস্তব্ধ শীতের রাত। হোটেলের কোন বোর্ডারই জেগে নেই। দোতলায় উঠে দরজা নয়, একটা জানালা দেখতে পেল ডি. কস্টা। শার্সি নেই। পর্দাও নেই। আলোও বেরিয়ে আসছে না ফাঁক-ফোকর দিয়ে।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল ডি. কস্টা। স্যুটের ভিতর কেউ নিশ্চয়ই আছে। জানালা খোলা বা ভাঙার চেষ্টা করলে ঘুম ভেঙে যাবে তার। কি করা উচিত ভেবে ঠিক করতে পারছিল না সে। একবার ভাবল ফিরে যাওয়াই ভাল। তারপর, কি মনে করে, জানালার গায়ে হাত দিল সে।

হাতের স্পর্শে টের পেল ডি. কস্টা, শার্সি বা কবাট নয়, খড়খড়ি ফিট করা হয়েছে জানালায়।

উৎসাহী হয়ে উঠল ডি. কস্টা। খড়খড়ি তুলে ভিতরে তাকাল। শব্দ হলো বেশ একটু কিন্তু গ্রাহ্য করল না সে।

ভিতরের কিছু দেখা গেল না। কারণ, আলো নেই।

খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে সরু হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ছিটকিনি খুলে ফেলল ডি. কস্টা। গরাদহীন জানালা গলে অন্ধকার রুমে ঢুকল সে, সুইচ বোর্ড খুঁজে আলো জ্বালল।

তিনমিনিট পর নিজেদের স্যুটে ফিরে এল ডি. কস্টা, 'আজ রাটে যাহা কিছু ঘটিটেছে টাহার সব কিছুই রহস্যে ঢাকা ডেকিটেছি। বারো নাম্বারের চিড়িয়া ভাগিয়াছে।'

ওমেনা বলল, 'কিছু একটা করা দরকার আমাদের। এভাবে চুপচাপ বসে থাকলে, কোন সন্দেহ নেই, গুলি খেয়ে মরতে হবে দু'জনকেই।'

'হামি ভাবিটেছি এইরকম অবস্থায় বস্ পড়িলে তিনি কি করিটেন?'

ওমেনা বলল, 'কুয়াশা নিরাপত্তার জন্যে স্থান ত্যাগ করত। এবং কেটে পড়ার আগে সে পরীক্ষা করে দেখে নিত কোন প্রমাণ রেখে যাচ্ছে কিনা।'

ডি. কস্টার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'রাইট। বাট, বড়সড় প্রমাণ টো ওই লাশটা! উহাকে হামরা কিভাবে মুছিব? ...ইউরেকা!'

'কি হলো?'

ডি. কস্টা চাপা স্বরে বলল, 'লাশের, আই মীন, বিজিম্যানের গন্টব্যষ্ঠান ছিল বারো নাম্বার স্যুইট। টার মানে, টাহার জার্নি এখনও শেষ হয় নাই। চলুন, উহাকে উহার গন্টব্যষ্ঠানে রাখিয়া আসি।'

ওমেনার মনে ধরল প্রস্তাবটা। বলল, 'কিন্তু বন্দীকে নিয়ে কোথায় যাব? ওর কি হবে?'

ডি. কস্টা খানিক ভাবনা-চিন্তা করে বলল, 'ও ব্যাটা এখানেই ঠাকুক। ওর পাশে একটা ড্যাগার রেখে যাব হামরা। ইচ্ছা হলে নিজের হাটে নিজেকে খুন করবে। নয়ট পুলিসের হাটে বণ্ডী হবে। হামাডের ভয়ের কিছু নাই, কারণ, হামাডের কঠা সে পুলিসকে বলিবার সময়ই পাইবে না। পুলিস অ্যাট ফার্স্ট টাহার কঠা জানিটে চাহিবে।'

লোহার মইটা অসম্ভব নড়বড়ে। পা ফেললেই ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হয় আর দোলনার মত দুলতে শুরু করে। লাশটাকে ধরাধরি করে উপরে তুলতে ঘামে ভিজে গেল ওদের জামা-কাপড়। সেই সাথে ভয়ে আধমরা হয়ে গেল ওরা। যে-কোন মুহূর্তে কেউ জানালা খুলে উঁকি মারতে পারে কিংবা দারোয়ান ছুটে আসতে পারে শব্দের উৎস সন্ধানে।

দোতলার একটা বিছানার উপর লাশটা রেখে হাঁপাতে লাগল ডি. কস্টা। ওমেনা বলল, 'দেরি নয়, এখুনি নেমে যেতে হবে আমাদের।'

এমন সময়, সিটিং রুমের বন্ধ দরজায় নক হলো।

পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। কথা না বলে ছুটল ডি. কস্টা জানালার দিকে।

মই বেয়ে নিচে নামছিল ডি. কস্টা। তাকে অনুসরণ করছে ওমেনা। পিছন ফিরে নামছে ওরা।

নিচে থেকে হঠাৎ গলা ভেসে এল, 'এরাই! কি হচ্ছে...!'

পা ফস্কে পড়ে গেল ডি. কস্টা। পড়ল সে সরাসরি লোকটার ঘাড়ের উপর। ফলে ধরাশায়ী হলো দু'জনেই।

প্রায় একই সময়ে উঠে দাঁড়াল দু'জন।

ডি. কস্টাকে ভাল করে দেখতে দেখতে লোকটা অকস্মাৎ বিকট স্বরে গর্জন করে উঠল।

কুকুরের হাতে বন্দী বিড়ালের মত ডি. কস্টা ভয়ে মিঁউ মিঁউ করতে লাগল। চিনতে পেরেছে সে লোকটাকে। কুয়াশা যে তিনজন লোককে ব্রিজ থেকে নদীতে ফেলে দিয়েছিল এ লোকটা তাদেরই একজন।

ডি. কস্টার সরু ঘাড়টা চেপে ধরল লোকটা। দুর্বোধ্য জার্মান ভাষায় তর্জন গর্জন করছে লোকটা।

ওমেনা মই বেয়ে নামতে নামতে ডি. কস্টা এবং লোকটার মাথার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। রিভলভারটা উল্টো করে ধরা ওর হাতে।

এদিক ওদিক দেখে নিয়ে লোকটার মাথার মাঝখানে রিভলভারের বাঁট দিয়ে আঘাত করল ওমেনা।

লোকটা আচমকা বোবা বনে গেল। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল সে ঘাসের উপর।

ডি. কস্টা ফিসফিস করে বলল, 'নাম কিনিবার জন্য উন্মুখ হইয়া ঠাকেন, না? অপেক্ষা করিয়া ডেকিটেন, নিজেকে মুক্ত করিটে পারিটাম কিনা!'

ওমেনা বলল, 'এসব কথা পরে। ধরুন, একে লুকিয়ে ফেলতে হবে।'

ধরাধরি করে নিজেদের স্যুটে আনা হলো অজ্ঞান লোকটাকে।

ঢক ঢক করে ব্র্যাণ্ডি পান করল ডি. কস্টা।

ওমেনা বলল, 'আসল ঘটনাটা কি বুঝতে পেরেছেন কি?'

'বুঝিয়া কাজ নাই! হামি এখন পলাইব।'

'কোথায় পালাবেন?'

ডি. কস্টা হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল, 'বসের এ অন্যায় কাজ! বিডেশ বিভূইয়ে টিনি হামাকে এটিম করিয়া কোঠায় যে গেলেন এখন পর্যন্ট কোন খবর নাই! এডিকে একের পর এক বিপড হামার উপর বাঘের মটো ঝাঁপাইয়া পড়িটেছে! কে হামাকে রক্ষা করিবে!'

'আরে! একি! বাহাদুর পুরুষ কাঁদে নাকি!'

ডি. কস্টা লজ্জা পেল। বলল, 'কই, কে বলে হামি কাঁডিটেছি। অভিনয় করিটেছিলাম।'

ওমেনা হাসি চাপল। বলল, 'কয়েকটা জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এক, পুলিস আগেভাগে খবর পেয়ে পথের উপর অপেক্ষা করছিল বিজিম্যানের জন্যে। পুলিস সম্ভবত জানত বিজিম্যান স্মাগলার, মূল্যবান কোন জিনিস সে নিয়ে আসছে। পুলিস সম্ভবত এ-ও জানত যে বিজিম্যানের গন্তব্য স্থান এই হোটেলের বারো নম্বর স্যুইট। অবশ্য বিজিম্যানকে তারা পথেই গ্রেফতার করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয় কুয়াশা।'

'বলিয়া যান, মিস ডিটেকটিভ।'

রসিকতায় কান না দিয়ে ওমেনা বলল, 'পুলিস তিনজন নদী থেকে উঠে থানায় ফিরে যায়। কাপড়-চোপড় পাল্টে এই হোটেলের বারো নম্বর স্যুইটে হানা দেবার জন্যে আবার এসেছে তারা।'

'ঠিক-ঠিক!'

ওমেনা অজ্ঞান লোকটাকে দেখিয়ে বলল, 'এই পুলিসটা ফায়ার এস্কেপের উপর নজর রাখছিল, যাতে কেউ পালিয়ে যেতে না পারে। আর অপর দু'জন সিঁড়ি

বেয়ে দোতলায় উঠেছে। দরজায় তাদের নক শুনেছি আমরা।'

'ঠিক-ঠিক! এখন পরবর্তী করণীয় কি হটে যাচ্ছে?'

ওমেনা অজ্ঞান পুলিসটার দিকে তাকাল, 'ওর ইউনিফর্মটা খুলে নিয়ে গায়ে দিন। কোটের উপর পরুন, খুব একটা ঢিলে লাগবে না।'

'বস্ কি এই পরামর্শ ডিটেন হামাকে?'

ওমেনা বলল, 'দিত।'

'টাহা হইলে আপত্তি নাই।'

পুলিসের শরীর থেকে ইউনিফর্ম খুলে নিল ডি. কস্টা। ওমেনা নিজের রুমে ফিরে গেছে কাপড়-চোপড় পাল্টাবার জন্যে।

মিনিট তিনেকের মধ্যে তৈরি হয়ে গেল ওরা। বেরিয়ে পড়বে, এমন সময় ফোন এল।

কুয়াশার সাথে কথা বলতে শুরু করল ওমেনা। তারপর ডি. কস্টা।

আট

শুয়ে শুয়ে আপন মনে হাসছিল কুয়াশা। রুডলফ ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি যে সে নিজেই তার পরম শত্রু কুয়াশাকে বহন করে নিয়ে এসেছে নিজের গোপন আস্তানায়। লাভ এবং লোকসানের হিসেব মেলাতে গিয়েও হাসল কুয়াশা। লাভের মধ্যে রুডলফের আস্তানা চিনেছে সে। পোর্টেবল সেফটা হস্তগত করেছে। রুডলফের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করেছে কাকোস নামে এক লোককে। হোটেল কুর্কাজায় বন্দী করে রেখে এসেছে রুডলফের একজন অনুচরকে। রুডলফের আর এক অনুচরকে অজ্ঞান করেছে সে। এবং, এখন, চমৎকার একটা ফাঁদ পেতে, রুডলফকে ঘণ্টায় ষাট মাইল স্পীডে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে সেই ফাঁদের দিকে।

পরিকল্পনাটা কুয়াশার মাথায় আসে সে যখন ফোনে ওমেনার কথা শুনছিল। রুডলফ যে পালাবার চেষ্টা করবে, জানত সে। মনে মনে সে ঠিক করে, রুডলফ পালাবার চেষ্টা করলে বাধা সে দেবে ঠিক, কিন্তু সেটা হবে কৃত্রিম বাধা। আসলে পালাবার সুযোগ দেবে সে রুডলফকে। কিন্তু রুডলফকে বুঝতে দেয়া হবে না যে সুযোগটা তাকে ইচ্ছা করে দেয়া হয়েছে।

ডি. কস্টাকে জেনবারের মেইন রোডে যেতে বলার কারণ আর কিছু নয়, রুডলফকে সেখানে যেতে প্ররোচিত করাই ছিল কুয়াশার একমাত্র উদ্দেশ্য।

সত্যি সত্যিই রুডলফ গোপন পথে পালাবার চেষ্টা করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী গুলি করে বাধা দেবার চেষ্টা করে কুয়াশা কিন্তু ব্যর্থ হয় সে ইচ্ছা করেই। কুয়াশা জানত, রুডলফ জেনবারে যাবেই। দেখা হবে আবার পরস্পরের সাথে।

মার্সিডিজ বেঞ্জের ছাদে শুয়ে শুয়ে নিঃশব্দে হাসছে কুয়াশা। রুডলফকে বোকা বানাতে পেরে আনন্দিত সে। গর্বিত রুডলফের সাথে খেলাটা বেশ জমে

উঠেছে।

জেনবারের দিকে ষাট মাইল বেগে ছুটে চলেছে মার্সিডিজ।

পৌনে একঘণ্টা পর মার্সিডিজের গতি মন্থর হতে শুরু করল। জেনবার আরও সামনে, অনুমান করল কুয়াশা। থামছে কেন তাহলে গাড়ি?

উঁকি মারল কুয়াশা।

রুডলফকে দেখার আগেই তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে।

'থামছ কেন! জেনবার তো আরও সামনে!'

আবার স্পীড বাড়ল মার্সিডিজের। শোফার ভুল করছিল, কিংবা ঘুম পেয়েছে বলে চিনতে পারেনি জায়গাটা।

উঁকি দিয়ে কুয়াশা দেখল ওভারকোটের ডান পকেটে একটা হাত ঢুকিয়ে বসে আছে রুডলফ। শক্ত করে কিছু একটা ধরে আছে যেন সে। বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে হাঁটুর উপর টোকা মারছে সে। অপলক চোখে চেয়ে আছে সামনের দিকে। চোখেমুখে দৃঢ়তার ছাপ। কুয়াশার ব্যাপারে চরম কিছু একটা করার কথা ভাবছে সম্ভবত।

কথা বলে উঠল সে অস্থির কণ্ঠে, 'অড্রো, আরও জোরে, আরও জোরে। কুয়াশা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ড্রাইভার। তাকে ধরতে হলে আরও জোরে ছুটতে হবে আমাদের।'

রিস্টওয়াচ দেখল কুয়াশা। ডি. কস্টা এবং ওমেনা যদি ফালতু সময় নষ্ট না করে, জেনবারের মেইন রোডে পৌঁছে যাবার কথা ওদের।

মাথা তুলে রাস্তার পাশে পাথুরে মাইলস্টোন দেখে জেনবারের দূরত্ব জেনে নিল কুয়াশা। আর মাত্র দুই কিলোমিটার সামনে জেনবার। কুয়াশা অনুভব করল, রুডলফের সাথে মুখোমুখি হবার সময় হয়েছে এখন।

পকেট থেকে সাইলেন্সার লাগানো রিভলভারটা বের করল কুয়াশা। গড়িয়ে চলে এল গাড়ির ছাদের পিছন দিকে। লক্ষ্য স্থির করে পিছনের চাকার মাডগার্ডের উপর গুলি করল সে।

টায়ার থেকে বাতাস বেরিয়ে যাবার শব্দ শোনা গেল হিস্-স্-স্-স্-স্···। সেই সাথে গতি মন্থর হয়ে গেল মার্সিডিজের।

গাড়ি স্থির হয়ে দাঁড়াবার আগেই লাফ দিয়ে নামল কয়াশা ফুটপাথে। ফুটপাথ থেকে সরে গেল সে কয়েকটা গাছের আড়ালে। হাত দশেক দূরে থামল গাড়ি।

একযোগে খুলে গেল গাড়ির দুদিকের দরজা। রুডলফ বেরিয়ে এল ছড়ি হাতে নিয়ে। প্রায় ছুটে চলে এল সে গাড়ির পিছনে। হাঁটু মুড়ে বসল ফুটো হয়ে যাওয়া চাকাটার পাশে।

শোফার অড্রোও চাকাটা পরীক্ষা করার জন্যে বসে পড়েছে।

'পেরেক-টেরেক বিঁধে দুর্ঘটনাটা ঘটেছে, স্যার,' শোফার চাকা পরীক্ষা করে বলল।

প্রিন্স রুডলফ নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। কয়েকমুহূর্ত স্থির হয়ে রইল সে।

অপ্রত্যাশিত এই বিপদে পড়ে সে যেন হতভম্ব হয়ে গেছে। হঠাৎ গর্জে উঠল সে, 'চাকা বদলাও! জলদি!'

'ইয়েস স্যার!' তড়াক করে উঠে দাঁড়াল অড্রো। এইসময় গাছগুলোর আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কুয়াশা। কেউ দেখতে পেল না প্রথমে তাকে।

কুয়াশা কথা বলে উঠতে রুডলফ এবং শোফার এক সাথে চমকে উঠে সবেগে ঘাড় ফেরাল।

কুয়াশা বলল, 'কী আশ্চর্য, রুডলফ! যেখানে সেখানে পরস্পরের সাথে দেখা হয়ে যাচ্ছে—এ কিসের লক্ষণ বলো দেখি? এরকম ঘটনা আবার ঘটলে তুমি হয়তো বিশ্বাস করে বসবে আমি তোমাকে অনুসরণ করছি।'

ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে এল রুডলফের পেশীগুলো। কিন্তু মুখের চেহারা এতটুকু বদলাল না। পাথরের মুখোশ পরে আছে যেন সে। 'মি. কুয়াশা, তোমাকে পথে মিস করার কারণটা কি বুঝতে পারছি না। আমাদেরটার মত তোমার গাড়িও কি কোথাও অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়ে অচল হয়ে গেছে?'

'তোমাদেরটাই আমার গাড়ি। সত্যি কথা বলতে কি, সবসময়ই তাই ছিল। ভাল কথা, রুডলফ, তোমার গাড়ির ছাদের চারপাশে রেলিংয়ের ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। ভবিষ্যতে আবার যদি কখনও ওই ছাদে শুয়ে ভ্রমণ করতে হয়, পড়ে যাবার ভয় থাকবে না।'

'বুঝেছি! তার মানে আমাদের সাথেই সর্বক্ষণ ছিলে তুমি।'

কুয়াশা হাসছে। বলল, 'রুডলফ, অতীতে তোমার পেশা ছিল মণি-মুক্তোর চোরাই ব্যবসা করা। পোর্টেবল সেফে সম্ভবত মণি-মুক্তোই আছে, তাই না? মূল্য-তালিকা থাকলে দাও আমাকে। সেফের মণি-মুক্তো থেকে দু'একটা যদি আমার কাছ থেকে কিনতে চাও, দাম হাঁকতে সুবিধে হবে আমার।'

নিঃশব্দে চেয়ে রইল রুডলফ কুয়াশার দিকে। তারপর, হঠাৎ সে-ও হাসল। বলল, 'জেনে ফেলেছ তাহলে ব্যাপারটা। কিভাবে জানলে? ধরো, চুরুট খাও।'

একটা হাভানা চুরুট বাক্স থেকে বের করে কুয়াশার দিকে বাড়িয়ে দিল রুডলফ।

কুয়াশা হাসতে হাসতে বলল, 'ধন্যবাদ, রুডলফ। এই মুহূর্তে ধূমপানের ইচ্ছা নেই।'

কুয়াশার কথা শেষ হলো না, চুরুটের অগ্রভাগ থেকে পিচকারী দিয়ে বেরিয়ে এল তরল অ্যামোনিয়া গ্যাস। সরাসরি কুয়াশার নাকে মুখে পড়ল বিষাক্ত তরল পদার্থটুকু।

টলে উঠল কুয়াশার দীর্ঘ দেহটা। গ্যাসে আক্রান্ত হবার সাথে সাথে গর্জে উঠল তার হাতের রিভলভারটা পরপর দু'বার। কিন্তু রুডলফ যথাসময়ে সরে যাওয়ায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো সে। পর মুহূর্তে খসে পড়ল কুয়াশার হাত থেকে রিভলভারটা। দু'হাতে মুখ ঢাকল সে। জ্ঞান হারাবার পর্যায়ে দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছে কুয়াশা। মুখ থেকে হাত নামিয়ে কিছু একটা ধরার জন্যে শূন্যে হাতড়াতে লাগল সে। চোখ

দুটো জ্বালা করছে। শত চেষ্টা করেও পাতা খুলে রাখতে পারছে না সে। অস্পষ্টভাবে তার কানে ঢুকল রুডলফের উচ্চকণ্ঠের হাসি। পরমুহূর্তে কুয়াশা অনুভব করল কে যেন তাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। জড়িয়ে ধরে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করছে।

'ভয়ের কিছু নেই, বন্ধু! তোমার যা স্বাস্থ্য, জ্ঞান হারাবে না তুমি। সাধারণ কোন মানুষ হলে হয়তো মরেই যেত। অড্রো, বন্ধুকে গাড়ির ভিতর নিয়ে যাও।'

অড্রো কুয়াশাকে গাড়ির দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল। দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছে কুয়াশা। চোখের জ্বালা কমছে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসছে।

গাড়িতে ঢোকার আগে রাস্তার সামনের দিকে চোখ মেলে তাকাল কুয়াশা। দুটো উজ্জ্বল আলোক বিন্দু দেখতে পেল সে।

'গাড়ি আসছে একটা,' রুডলফের কণ্ঠস্বর।

অড্রোও হেডলাইট দুটো দেখতে পেয়েছে। কুয়াশাকে ধাক্কা আর ঠেলা দিয়ে গাড়ির ভিতরে ঢুকিয়ে দিল সে।

ব্যাকসীটে বসে কুয়াশা দেখল রুডলফ ওপাশের দরজা দিয়ে আগেই উঠে বসেছে। হাতের রিভলভারের নলটা রুডলফ ঠেকাল কুয়াশার পাঁজরে।

'দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলে কি ঘটবে বুঝতেই পারছ,' রুডলফ গম্ভীরভাবে বলল।

দ্রুত ছুটে আসছে হেডলাইট দুটো। রুডলফের নির্দেশে অড্রো গাড়ির চাকা বদলাবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে।

সন্দেহ করার মত কিছু নেই কারও। চাকা ফুটো হয়ে গেছে মাঝপথে, চাকা বদলাবার কাজ চলছে, অপেক্ষা করছে তারা। এরকম ঘটনা সচরাচর ঘটছে যত্রতত্র, সুতরাং কারও মনে সন্দেহ জাগবার কথা নয়।

'কিন্তু রুডলফ, ধরো, গাড়িটায় যদি আমার বন্ধুরা থাকে?'

রুডলফ উত্তর দিল না। মার্সিডিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে নবাগত গাড়িটা। দরজা খুলে নিচে নামল একজন লোক। কাছাকাছি আসতে দেখা গেল তার মাথায় হেলমেট রয়েছে। পরনে ইউনিফর্ম। মার্সিডিজের পাশে এসে দাঁড়াল সে, উঁকি দিল জানালা দিয়ে।

জার্মান ভাষায় সরু মেয়েলি গলায় লোকটা জানতে চাইল, 'আপনারা কি কোন বিপদে পড়েছেন?'

কুয়াশা একচুলও নড়ল না। কিন্তু তার ইচ্ছা হচ্ছিল অট্টহাসি হেসে চারদিক কাঁপিয়ে তুলতে।

রুডলফ মৃদু হেসে বলল, 'হ্যাঁ, চাকা ফুটো হয়ে যাওয়ায়...'

পুলিস বলল, 'মাফ করবেন, আপনার সঙ্গী লোকটা কে? এ কি আপনার বন্ধু?' কুয়াশাকে দেখিয়ে পুলিস প্রশ্ন করল রুডলফকে।

'বন্ধু? না না!'

পুলিস তার ইউনিফর্মের পকেট থেকে নোটবুক আর পেন্সিল বের করে বলল,

'আপনার নাম, ঠিকানা?'

প্রিন্স রুডলফ পকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে বাড়িয়ে দিল পুলিসের দিকে। কার্ডটা নিয়ে পড়তে চেষ্টা করল পুলিস। আচমকা সটান সিধে হয়ে দাঁড়াল সে। খটাস করে শব্দ হলো বুটের সাথে বুটের সংঘর্ষে। সসম্মানে স্যালুট করল পুলিস রুডলফকে।

কাঁচুমাচু হয়ে বলল সে, 'মাফ করবেন, ইওর হাইনেস! আপনাকে আমি চিনতে পারিনি। আসলে এই লোকটাকে আমরা খুঁজছি। ইনসব্রুকে একটা ব্রিজ থেকে এই লোক আমাদের তিনজন সহকারীকে নদীতে ফেলে দিয়ে পালিয়েছিল। একে দেখে...'

রুডলফ গম্ভীরভাবে হাতের পিস্তলটা দেখাল পুলিসকে। বলল, 'হুঁ, আমার সন্দেহই তাহলে সত্যি! ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি। এই লোক আমাদেরকে মাঝরাস্তায় অসহায় অবস্থায় পেয়ে ডাকাতি করার জন্যে এসেছিল। কৌশলে একে নিরস্ত্র করে বন্দী করে রেখেছি আমরা। চাকাটা বদলানো হয়ে গেলে এখান থেকে আমরা সোজা নিকটস্থ থানায় যাব। এখন, সৌভাগ্যক্রমে আপনি যখন এসেই পড়েছেন, এর দায়িত্ব আপনার ওপরই ছেড়ে দিতে পারি...।'

'অবশ্যই, অবশ্যই—হিজ হাইনেস!' পুলিস বলল, 'তাকাল সে রক্তচক্ষু মেলে কুয়াশার দিকে, অ্যাই! বেরিয়ে এসো বাইরে।'

কুয়াশা বলল, 'মিথ্যে কথা! হিজ হাইনেসই ডাকাতি করেছে। পোর্টেবল সেফটা আমার। সেটা এখন হিজ হাইনেসের পকেটে। অফিসার, আপনাকে আমি হিজ হাইনেসের আস্তানায় নিয়ে যেতে পারি, সেখানে আপনি এমন সব দৃশ্য দেখতে পাবেন যে বিশ্বাস করাই কষ্টকর হয়ে পড়বে আপনার পক্ষে।'

'শাট আপ। সম্মানীয় হিজ হাইনেসকে অপমান করার চেষ্টা করে লাভ নেই! বেরিয়ে এসো বলছি। হিজ হাইনেসকে আর ঝামেলা ভোগ করতে দিতে রাজি নই আমি।'

রুডলফ মানিব্যাগ বের করে কয়েকটা নোট বাড়িয়ে দিল পুলিসের দিকে 'স্মরণ রাখবেন, আমি কোনরকম পাবলিসিটি চাই না।'

পুলিস মাথা নিচু করে সম্মান প্রদর্শন করল। 'বুঝেছি, ইওর হাইনেস! ইওর হাইনেসের নাম উল্লেখ করব না আমি। ইওর হাইনেসকে সাহায্য করতে পেরে আমি গর্বিত।'

পুলিসটা কটমট করে তাকাল কুয়াশার দিকে, 'এই! বেরিয়ে এসো বলছি!'

'এ অনুচিত! অফিসার, আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে হিজ হাইনেসকে ছেড়ে দিলে আমি আর আমার সেফটা ফিরে পাব না কখনও? অন্তত, আপনি আমার সাথে ওদেরও নিয়ে চলুন থানায়। ওখানে গিয়ে প্রমাণ হবে সেফটা কার।'

পুলিস বলল, 'সেফের মালিক কে তা আমি জানি। ওটা হিজ হাইনেসের।'

'মিথ্যে কথা! সেফটা আমার! সেফ না নিয়ে আমি কোথাও যাব না। তুমি...আপনি জানেন না, ওটার জন্যে কত বড় বড় ঝুঁকি নিয়েছি আমি!'

'জেলে থাকতে হবে তোমাকে, কি করবে ওই সেফ দিয়ে? বেরিয়ে আসবে, না জোর খাটাতে হবে?'

'সেফ না নিয়ে কোথাও যাব না আমি।'

রুডলফ নির্বিকার। নীরব দর্শক সেজে বসে আছে।

পুলিস অফিসার পকেট থেকে রিভলভার বের করে কুয়াশার বুকের দিকে তাক করে ধরল, 'বেরোও।'

রাগে লাল হয়ে গেছে কুয়াশার মুখ। নিঃশব্দে বেরিয়ে এল সে গাড়ির বাইরে।

পুলিস কুয়াশার পিছনে চলে এল। কুয়াশার শিরদাঁড়ায় রিভলভারের নল ঠেকিয়ে বলল, 'বাধ্য ছেলের মত হাঁটো।'

রুডলফ দেখল পুলিসের গাড়িতে গিয়ে উঠল কুয়াশা, পিছু পিছু পুলিস। প্রাণপণ চেষ্টায় অদম্য হাসিটা চেপে রেখেছে সে।

পুলিসের গাড়ির ড্রাইভিং সীটে বসেছিল ডি. কস্টা। গাড়ি ছেড়ে দিল সে।

গাড়ি মাইলখানে যাবার পর মুখ খুলল কুয়াশা, 'কাজটা কি ভাল করলে ওমেনা? এত কষ্ট করে...'

'ক্ষমা চাই! কিন্তু একটা কথা ভুলে গেছ তুমি, কুয়াশা। দেশ ত্যাগ করার আগে আমরা কয়েকটা শর্ত দিয়েছিলাম, সেগুলো তুমি মানছ না। তাই এরকম একটা কাণ্ড ঘটাতে হলো। সেফের ভিতরে যাই থাক, ওসবে আমাদের দরকার নেই। আমরা ভ্রমণে এসেছি, ভ্রমণ করব। বাজে কাজে জড়িয়ে বিপদ ডেকে আনতে চাই না।'

হাসি চেপে কুয়াশা জানতে চাইল, 'সে যাক। ইউনিফর্ম পেলে কোথায়?'

হোটেল কুর্কাজায় যা যা ঘটেছে ব্যাখ্যা করে বলল ওমেনা। সবশেষে যোগ করল, 'ইউনিফর্মটা প্রথমে পরেছিলেন মি. ডি. কস্টা। কিন্তু কোটের উপর পরার পরও বড্ড ঢিলে লাগছিল। তাই আমিই পরি এটা।'

ডি. কস্টা গাড়ি চালাতে চালাতে বলল, 'বস্, হাপনাকে গ্রেফতার করিবার ষড়যন্ত্রটা হামার নয় কিন্টু!'

ওমেনা বলল, 'আমি স্বীকার করছি, সব দোষ আমার। কিন্তু রুডলফের হাত থেকে তোমাকে মুক্ত করার আর কোন উপায় ছিল কি?'

ডি. কস্টা বলল, 'সেফটা যডি ফেরট পাওয়া যাইট, ডুঃখের কিছু ছিল না টাহা হইলে! বস্, কি ছিল সেফে জানিটে পারিয়াছেন কি?'

'আজ থেকে ছয় সপ্তাহ আগে খবরের কাগজে পড়েছিলাম মনটেনিগ্রিন ক্রাউন জুয়েলারী চুরি গেছে। ক্রিস্টির পথে পাঠাবার সময় লুট হয় জুয়েলারীগুলো।'

'দরকার নেই ক্রাউন জুয়েলারীর! তুমি যে রুডলফের হাতে গুলি খাওনি আমি এতেই আনন্দিত।'

কুয়াশা হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল। বলল, 'রুডলফ সম্পর্কে তোমার দেখছি খুব বড় ধারণা। সে আমাকে খুন করতে পারবে, তার সে ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করো তুমি?'

ওমেনা গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, 'জানি না।'

কুয়াশা বলল, 'একটা ভুল ধারণা ভাঙল। এতদিন জেনে এসেছি গহনা-টহনার প্রতি মেয়েদের দুর্বলতার তুলনা হয় না। এখন দেখছি তা সত্যি নয়।'

ওমেনা চুপ করে রইল।

'ভুল ভাঙবে আগে বা পরে রুডলফেরও। সেফ খুলে বেচারা বোকা বনে যাবে।'

'তার মানে?'

কুয়াশা সহাস্যে বলল, 'রুডলফ আসলে জানে না যে কমবিনেশন লক খুলতে হলে যেমন নম্বর মিলিয়ে ডায়াল ঘোরাতে হয় তেমনি বন্ধ করতে হলেও নম্বর মিলিয়ে ডায়াল ঘোরাতে হয়। তা না হলে ঢাকনিটা যথাস্থানে নামিয়ে রাখা সম্ভব হলেও তালা লাগানো সম্ভব নয়।'

কথাগুলো বলে ওভারকোটের পকেট থেকে রুমালে বাঁধা ভারি একটা পোঁটলা বের করল কুয়াশা। পোঁটলার গিঁট খুলে ফেলল সে।

মূল্যবান পাথর এবং স্বর্ণের গহনার স্তূপ দেখল ওমেনা কুয়াশার দু'হাতের উপর। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল সে।

নয়

ডি. কস্টা ঘাড় বাঁকা করে পিছন দিকে তাকিয়ে ছিল। দু'চোখ চকচক করছে তার।

'মাই গড! এ যে সাট রাজার ঢন, বস্!'

ওমেনা তারস্বরে আর্তনাদ করে উঠল, 'গাড়ি পড়ল!'

পাহাড়ী পথ, রাস্তার দু'পাশে গভীর খাদ। সবেগে ডান দিকের খাদের দিকে ছুটে যাচ্ছিল গাড়ি।

ডি. কস্টা ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে বন বন করে হুইল ঘোরাতে শুরু করল। গাড়ি সোজা করে সহাস্যে বলল সে, 'প্রিন্সেস, হামার ওপর বিশ্বাস হারাইবেন না! আফটার অল হামি মি. কুয়াশার সহকারী টো!'

ওমেনা কুয়াশার দিকে তাকাল, 'তারমানে প্রিন্স রুডলফের কাছে খালি সেফটা রয়ে গেছে? সে জানেই না যে···?'

'জানে না।'

ওমেনা গম্ভীরভাবে বলল, 'তারমানে অ্যাটেমপ্ট টু মার্ডার, মার্ডার, স্ট্রীট ফাইট, কিডন্যাপ, গাড়ি চুরি ইত্যাদির অপরাধে পুলিসবাহিনী আমাদের পিছনে শিকারী কুকুরের মত ছুটে আসছে এবং এর উপর রুডলফও দিক পরিবর্তন করে আমাদেরকে জ্যান্ত কবর দেবার জন্যে আসছে।'

কুয়াশা বলল, 'আরও একজন আছে ওদের সাথে। কমরেড কাকোস। যুদ্ধক্ষেত্রে সে-ও ধুলোর পাহাড় তুলে ছুটে আসছে আমাদের দিকে। তাকে রুডলফের লাইব্রেরীতে অজ্ঞান অবস্থায় দেখে এসেছি আমি।'

ব্যাখ্যা করে রুডলফের আস্তানায় যা যা ঘটেছে সব বলল ওদেরকে কুয়াশা।

কুয়াশার বক্তব্য শেষ হতে ওমেনা শুরু করল। হোটেল কুর্কাজায় যা যা ঘটেছে বলল সে।

সব শুনে কুয়াশা বলল, 'বুঝেছি! কোন সন্দেহ নেই কুর্কাজা হোটেলের বারো নম্বর স্যুইটে অপেক্ষা করছিল কাকোসই। রুডলফের লোকেরা সেখান থেকে কাকোসকে বন্দী করে আস্তানায় নিয়ে যায়। মি. ডি. কস্টা, আমরা যাচ্ছি কোন্ দিকে? নিশ্চয়ই বর্ডারের দিকে?'

'ইয়েস, বস্।'

ওমেনা বলল, 'জার্মানীতে যাচ্ছি আমরা।'

কুয়াশা বলল, 'ইউরোপের যেখানেই যাই না কেন, রুডলফ পিছু ছাড়বে না আমাদের। আর এখানকার পুলিসও পাশের দেশের পুলিসকে সতর্ক করে দিতে ভুল করবে না। রুডলফ যদি রাগে উন্মাদ হয়ে না যায়, গোটা ইউরোপের পুলিস-বাহিনীর হেড কোয়ার্টারগুলোয় খবর পাঠাবে সে।'

'কি খবর পাঠাবে?'

কুয়াশা মৃদু হেসে বলল, 'বুঝতে পারছ না কি খবর পাঠাবে! যে খবর পেলে গোটা ইউরোপ চমকে উঠবে, সেই খবর। রুডলফ জানিয়ে দেবে কুয়াশা ইউরোপে উপস্থিত হয়েছে। ব্যস, জ্বলে উঠবে আগুন।'

ওমেনা বলল, 'সেক্ষেত্রে একমাত্র দায়ী হবে তুমি। রুডলফকে এভাবে ফাঁকি না দিলে সে নিশ্চয়ই খবরটা ছড়াবার কথা ভাবত না।'

কথা শোনা এবং বলার মধ্যেই পকেট থেকে পেননাইফ বের করে জড়োয়া গহনাগুলো থেকে মূল্যবান পাথরগুলো খুলে ফেলছিল কুয়াশা। কোলের উপর বিছানো রয়েছে রুমালটা, তাতে রয়েছে বড় বড় হীরা, মুক্তো, পোখরাজ, চুনী পাথর। সেগুলোর সাথে যোগ হচ্ছে আরও অনেক।

ডি. কস্টা ঘোষণা করল, 'সীমান্ট আর মাত্র কয়েক মাইল সামনে।'

স্বর্ণের গহনাগুলো থেকে মূল্যবান পাথর খসিয়ে নেবার কাজ শেষ হতে চুরুট ধরাল কুয়াশা। গহনাগুলো জানালা দিয়ে বনভূমির দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। পাথরগুলোর তুলনায় ওই স্বর্ণের মূল্য ধরতে গেলে কিছুই না।

'কি রকম দাম হবে এই পাথরগুলোর?'

কুয়াশা বলল, 'তোমাকে একজোড়া কাঞ্জিভরম কিনে দেবার পরও যা থাকবে তা দিয়ে হোটেল ইন্টারকনে ডিনার খাওয়া চলবে বছর দুয়েক একনাগাড়ে, কেনা যাবে একটা ইয়ট, কেনা যাবে ভারত মহাসাগরে ছোট্ট একটা দ্বীপ, তারপরও ছয় অঙ্কের দুটো চেক কাটতে পারবে তুমি—এত সব কিছুর পরেও যা থাকবে তা দিয়ে ক্যান্সার রোগটা সম্পর্কে গবেষণা করার জন্যে দশতলা উঁচু একটা গবেষণাগার তৈরি করা সম্ভব।'

রুমালের চারকোনা একত্রিত করে গিঁট বাঁধল কুয়াশা। শূন্যে ছুঁড়ে লুফে ধরল পোঁটলাটা কয়েকবার, তারপর সেটাকে ভরে রাখল পকেটে। বলল, 'মি. ডি. কস্টা, গাড়ি থামান।'

নির্দেশ পেয়ে সাথে সাথে গাড়ি থামাল ডি. কস্টা। তারপর জানতে চাইল, 'কি হলো বস্?'

'ইউনিফর্ম খুলে নিজের পোশাক পরতে হবে ওমেনাকে। আর মাত্র দু'মাইল সামনে বর্ডার।'

'মাগো! ভুলেই গেছি যে...'

কুয়াশা বলল, 'ভুলে তো যাবেই! জানোই তো, সাথে কুয়াশা আছে, ভুল করলে তার চোখে ধরা পড়বেই ভুলটা।'

হাতে সুটকেস নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার পাশে বনভূমিতে প্রবেশ করল ওমেনা। পাঁচ মিনিট পর ফিরে এল সে প্যান্ট এবং টি-শার্ট পরে।

সীমান্তে পৌঁছুল ওরা ক'মিনিট পরই। ওদের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বেশ ক'টা গাড়ি। অপেক্ষার পালা। গাড়ির স্টিয়ারিং হুইল এখন কুয়াশার দখলে। পাশে ওমেনা। ডি. কস্টা ব্যাক সীটে একা।

সবাই চুপ। বুকের ভিতর ভয়ের হিমশীতল অনুভূতি প্রত্যেকেরই। অস্ট্রিয়া পুলিস যদি সীমান্তরক্ষীদের খবর দিয়ে সতর্ক করে দিয়ে থাকে, তাহলে বিপদ ঘটবেই। তার উপর, ইতিমধ্যে রুডলফ যদি আবিষ্কার করে থাকে যে সেফটা খালি তাহলে সে-ও হন্যে হয়ে খুঁজতে বেরিয়েছে ওদেরকে। বর্ডারের দিকে আসতে পারে সে। কুয়াশাকে সে ভাল করেই চেনে। কুয়াশার পরবর্তী মুভমেন্ট কি হতে পারে, জানা কঠিন কিছু নয় তার পক্ষে।

উত্তেজনাকর পরিস্থিতি, কি হয় কিছুই বলা যায় না। মিনিট দশেক পর নড়েচড়ে বসল ডি. কস্টা এবং ওমেনা। স্টেনগানধারী সীমান্তরক্ষীরা এগিয়ে আসছে তাদের গাড়ির দিকে।

সহাস্যে ওমেনার দিকে তাকাল কুয়াশা, 'সাবধান, অভিযোগ আনার আগেই যেন সব কথা স্বীকার করে ফেলো না।

ডি. কস্টা পিছন থেকে বলল, 'উহারা জিজ্ঞেস করিলে বলিবেন হামি ঘুমাইটেছি! প্লীজ!'

কথাগুলো বলে ডি. কস্টা সীটে হেলান দিয়ে চোখ বুজল। পাঁচ সেকেণ্ড পরই শোনা গেল তার নাক ডাকার শব্দ।

সীমান্তরক্ষীরা কথা বলল কুয়াশার সাথে। উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই ঘটল না। পাসপোর্ট দেখল ওরা। জিনিসপত্র চেক করল না। একবার শুধু জানতে চাইল, অবৈধ কিছু সাথে আছে কিনা।

কুয়াশা পরিষ্কার জার্মান ভাষায় জানিয়ে দিল, 'নেই। থাকলেও ধরা না পড়া পর্যন্ত স্বীকার করব না।'

কুয়াশার রসিকতায় হাসল রক্ষীদের কমাণ্ডার। হাত নেড়ে এগিয়ে যাবার অনুমতি দিল সে। স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিল কুয়াশা গাড়ি।

দশমিনিটের মধ্যে স্পীড মিটারের কাঁটা আশির ঘরে গিয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। প্রতি দু'তিন মিনিট পরপর ভিউমিররে চোখ রাখছে কুয়াশা। পিছনে কোন

গাড়ির ছায়া পর্যন্ত চোখে পড়ছে না। [illegible] পল [illegible] না কুয়াশার। বারবার ভিউমিররে তাকাচ্ছে সে, দেখে নিচ্ছে কেউ অনুসরণ করছে কিনা।

সূর্য উঠল পুবাকাশে।

পাহাড়ী পথ ছেড়ে গাড়ি প্রবেশ করল দিল্লীতে। শীত অনেক কমিয়ে আনল কুয়াশা। দীর্ঘ ঘুমের পর শহর জেগে উঠছে ধীরে ধীরে। রাস্তায় যানবাহন নামছে, মানুষ নামছে।

ওস্টবানহক রেলওয়ে স্টেশনের সামনে দাঁড় করাল কুয়াশা গাড়ি। পেভমেন্টের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা স্ট্রীট-কার। [illegible] থেকে নামছে চোখে ঘুম জড়ানো একদল শ্রমিক।

সুটকেস এবং একটা এয়ারব্যাগ হাতে নিয়ে পেভমেন্টে নামল কুয়াশা। ডি. কস্টাও নামল।

কুয়াশা তার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'দুজনে একসাথে না থাকাই ভাল। আপনি চেষ্টা করে যদি ওই স্ট্রীট-কারটাকে রাজি করাতে পারেন, সোজা চলে যাবেন এ স্থান থেকে হোটেল মেট্রোপোলে। এই নিন, ম্যাপ।'

পকেট থেকে চার ভাঁজ করা মিউনিক শহরের ম্যাপটা ডি. কস্টার হাতে গুঁজে দিল কুয়াশা। ম্যাপটা দেখার জন্যে ভাঁজ খুলল ডি. কস্টা। হঠাৎ গাড়ি ছোটার শব্দ পেয়ে মুখ তুলে দেখল কালো মরিসটা তীর বেগে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে রাস্তার বাঁকে।

অসহায়, বোকা বোকা লাগল ডি. কস্টাকে। করুণ চোখে চেয়ে রইল সে রাস্তার খালি বাঁকটার দিকে। তারপর ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে স্ট্রীট-কারটার দিকে।

মুহূর্তের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ডি. কস্টার মুখের চেহারা। শ্রমিকরা নেমে চলে গেছে প্ল্যাটফর্মে। গাড়ির ড্রাইভারকেও আশপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সম্ভবত চা-নাস্তা খেতে ঢুকেছে কোন হোটেলে।

সুটকেস এবং এয়ারব্যাগটা দু'হাতে ধরে তুলে নিয়ে এগোল ডি. কস্টা স্ট্রীট-কারের দিকে।

কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা গিয়ে ড্রাইভিং সীটে চড়ে বসল সে।

মিনিট পনেরো পর হোটেল মেট্রোপোলে ডি. কস্টা, কুয়াশা এবং ওমেনার সাথে মিলিত হলো। কথাবার্তা বিশেষ হলো না ওদের মধ্যে।

দশমিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল নিজের রুমে ডি. কস্টা। কিন্তু মাত্র আধঘণ্টা পরই প্রচণ্ড, অবিরাম শব্দে ভেঙে গেল তার ঘুম। ঘুম ভাঙতে ধড়মড় করে উঠে বসল সে বিছানার উপর। প্রথমে মনে হলো, ভূমিকম্প হচ্ছে। কিন্তু রুমের কিছুই দুলছে না দেখে ধারণাটা বাতিল করে দিল সে।

হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝতে পারল ডি. কস্টা। ট্রাম আর যানবাহনের মিলিত শব্দ হচ্ছে। হর্ণের শব্দ, ব্রেক কষার শব্দ, স্টার্ট নেবার শব্দ, ইঞ্জিনের শব্দ—সব মিলিয়ে নরক গুলজার।

ঘুম আর এলই না। বেলা বারোটা পর্যন্ত গড়াগড়ি খেলো সে বিছানায়।

তারপর উঠল। দাড়ি কামিয়ে স্নান করল গরম পানিতে। সুটেড-বুটেড হয়ে নিজেদের প্রাইভেট ডাইনিং-রুমে নেমে এল সে নিঃশব্দে। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে তার। একবার খেলে খিদে মিটবে না। প্রথমে একা খাবে সে ঠিক করেছে, তারপর সকলের সাথে আরেকবার।

কিন্তু ডাইনিং-রুমে ঢুকে কুয়াশাকে আবিষ্কার করল ডি. কস্টা। মুখোমুখি চেয়ারে বসল সে। জিজ্ঞেস করল, 'হাপনারও বুঝি ডুইবার খাবার মটো খিডা পাইয়াছে?'

কুয়াশা বুঝল না। বলল, 'দু'বার খাবার মত খিদে মানে?'

ডি. কস্টা ধরা পড়ে যাবার ভয়ে তাড়াতাড়ি বলল, 'ঠাক, ঠাক! ও হাপনি বুঝিবেন না!'

কুয়াশা বলল, 'তাড়াতাড়ি যা খাবার খেয়ে নিন। আমরা আবার রাস্তায় নামছি। ট্রেন জার্নি করব আমরা।'

'মরিসটার কি অপরাঢ?'

কুয়াশা বলল, 'ওটা চুরি করা গাড়ি, এতক্ষণে মালিক ইনসব্রুকের থানায় রিপোর্ট করেছে। পুলিস সতর্ক করে দিয়েছে এতক্ষণে সীমান্ত রক্ষীদেরকে। আমরা যখন বর্ডার ক্রস করি সীমান্ত রক্ষীরা গাড়িটার নম্বর টুকে রেখেছে। তারা জেনে ফেলেছে মরিসটা এখন জার্মানীতে। জার্মান পুলিসকে টেলিফোনে খবর পাঠিয়ে দিয়েছে তারা। সুতরাং মরিসটাকে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নয় মনে করে...'

'গুড!'

বেয়ারা এল, অর্ডার দিল ডি. কস্টা। দীর্ঘ অর্ডার শুনে মৃদু একটু হাসল শুধু কুয়াশা, কোন মন্তব্য করল না। অর্ডার নিয়ে চলে যাচ্ছিল বেয়ারা, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল, জিজ্ঞেস করল, 'দু'জনের জন্যে তো, স্যার?'

ধমকে উঠল ডি. কস্টা, 'কেন, একা হামি খাইটে পারি না মনে করিয়াছ?'

বেয়ারা ক্ষমা চেয়ে নিয়ে খাবার আনতে চলে গেল।

'প্রিন্সেস কোঠায়?'

কুয়াশা বলল, 'নিজের বেডরুম বসে খাবার কাজটা সেরে নিচ্ছে সে। খানিক আগে বেঘোরে ঘুমাচ্ছিল।'

ডি. কস্টা বলল, 'প্রিন্সেস নিশ্চয়ই বদ্ধ কালা! মিউনিকে ডিনের বেলা কুম্ভকর্ণেরও ঘুম আসিটে পারে না। হামার জানালার নিচে ফোর থাউজেণ্ড ট্রাম পরস্পরের সাঠে সংঘর্ষে লিপ্ট রহিয়াছে, বিলিভ ইট অর নট।'

কুয়াশা হাসতে হাসতে কফির পেয়ালায় চুমুক দিল।

'কোঠায় যাইব আজ হামরা?'

'কোলনে।'

উত্তর দিয়ে চুরুট ধরাবার জন্যে গ্যাস লাইটার জ্বালল কুয়াশা। ডাইনিং-রুমের খোলা ঘরের দিকে নজর পড়ল তার। স্থির হয়ে গেল তার লাইটার ধরা হাতটা।

ডাইনিং-হলের দরজা দিয়ে দু'জন ডিটেকটিভ পুলিস ইন্সপেক্টর প্রবেশ করছে। কুয়াশা এবং ডি. কস্টাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা। নিজেদের মধ্যে চাপাস্বরে কথা বলছে।

চুরুটে অগ্নি সংযোগ করল কুয়াশা। বলল, 'যাব, মানে, যাবার সুযোগ যদি দেয়া হয় আমাদেরকে।'

ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টররা পৌঁছুবার আগে টেবিলে খাবার দাবার নিয়ে হাজির হলো বেয়ারা।

কিছুই টের পায়নি ডি. কস্টা। মাথা নিচু করে বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু খাবারের দিকে তাকাল সে। তারপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে খেতে শুরু করল।

দশ সেকেণ্ড পর কথা বলতে শুরু করল কুয়াশা। 'মি. ইনগ্রাম, বুঝলেন, মানুষ যে বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে একটি দিনও কাজ করে না, এ আমি প্রমাণ করতে পারি।'

খেতে খেতে মুখ তুলে তাকাল ডি. কস্টা। প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল যে কার উদ্দেশ্যে কথা বলছে কুয়াশা, মি. ইনগ্রাম আবার কে? কিন্তু প্রশ্ন করার আগেই সে কুয়াশার পিছনে দু'জন ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টরকে দেখতে পেল।

খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল ডি. কস্টার।

কুয়াশা বলে চলেছে, 'বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন, তাই না?'

ডি. কস্টা মাথা ঝাঁকাল।

'আট ঘণ্টা প্রত্যেক দিন ঘুমায় মানুষ, সারা বছরে সে ঘুমায় মোট একশো বাইশ দিন। তিনশো পঁয়ষট্টি দিন থেকে একশো বাইশ দিন বাদ দিলে কত দিন থাকে?'

ডি. কস্টা বলল, 'টু-হাণ্ড্রেড ফোরটি থ্রী ডিন।'

'দু'শো তেতাল্লিশ দিন, হ্যাঁ। প্রত্যেক দিন আট ঘণ্টা করে বিশ্রাম, তার মানে বছরে একশো বাইশ দিন বিশ্রাম। দু'শো তেতাল্লিশ থেকে আরও একশো বাইশ বাদ দিন।'

'ঠাকে ওয়ান হ্যাণ্ড্রেড টোয়েনটি ওয়ান ডিন।'

কুয়াশা সহাস্যে বলল, 'হ্যাঁ, থাকে একশো একুশ দিন। প্রত্যেক বছরে রবিবার থাকে বায়ান্নটা, তার মানে আরও বাদ দিন বায়ান্ন দিন। ক'দিন অবশিষ্ট থাকল?'

'সিক্সটি নাইন ডিন।'

'ঠিক। শনিবার বায়ান্নটা, প্রত্যেক শনিবারে হাফ-ডে, তার মানে ছাব্বিশ দিন আরও বাদে যাবে। ক'দিন থাকল অবশিষ্ট?'

'সিক্সটি নাইন ঠেকে টোয়েনটি সিক্স বাড ডিলে ঠাকে মাট্র ফরটি থ্রী ডিন।'

'তেতাল্লিশ দিন, ঠিক। খাওয়া দাওয়ার কাজ, অসুস্থতা ইত্যাদির জন্যে প্রত্যেক দিন এক ঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিট করে গড়পড়তায় অপব্যয় হয়, বছরে দাঁড়ায়

আঠাশ দিন। তেতাল্লিশ দিন থেকে বাদ দিন আঠাশ দিন। ক'দিন রইল আর?'

'ফিফটিন ডিন।'

কুয়াশা বলল, 'হ্যাঁ, পনেরো দিন। এর সাথে বিয়োগ করুন বছরে দু'সপ্তার ছুটি অর্থাৎ আরও চোদ্দ দিন।'

ডি. কস্টা বলল, 'অবশিষ্ট রহিল মাত্র ওয়ান ডিন।'

কুয়াশা বলল, 'ওই একটা দিন হলো লেবার ডে। তার মানে আমরা কেউ কোন কাজ করি না।'

কথা শেষ করে হেসে উঠল কুয়াশা।

ডি. কস্টা কিন্তু হাসতে পারল না। কুয়াশার পিছনে যমদূতের মত দশাসই চেহারার ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টরদ্বয়ের দিকে তাকাল সে। ঢোক গিলল।

ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল কুয়াশা, যেন এই মাত্র পিছনের লোক দু'জনের উপস্থিতি টের পেয়েছে সে।

মাথার হ্যাট খুলে ক্লিনশেভ ইন্সপেক্টর একটু নত হলো। ইংরেজীতে বলল, 'এক্সকিউজ মি. জেন্টলমেন। আমরা দু'জন ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর। আপনাদের মুভমেন্ট সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন আছে, আশা করি উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।'

সহাস্যে কুয়াশা তার পাশের খালি চেয়ারগুলো দেখিয়ে বলল, 'সিট ডাউন, শার্লক্স্! তারপর বলুন, কি আপনাদের সমস্যা : কেউ বুঝি তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, নাকি…?'

কুয়াশার পাশের দুটো চেয়ার দখল করল ইন্সপেক্টরদ্বয়। ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা ইন্সপেক্টর বলল, 'দেখুন, স্যার, ইন্সব্রুকে একটা ক্রাইম সংগঠিত হয়েছে গতরাতে। আমরা প্রমাণ পেয়েছি, ক্রিমিনালরা মিউনিকে প্রবেশ করেছে। শুধু তাই নয়, তারা যে এই হোটেলে উঠেছে তাও আমরা জানতে পেরেছি। ইন্সব্রুক থেকে টেলিগ্রামে ক্রিমিনালদের চেহারার বর্ণনা জানানো হয়েছে আমাদেরকে। ক্ষমা করবেন, জেন্টলমেন, কিন্তু চেহারার বর্ণনার সাথে মিল…'

কুয়াশার ভুরু জোড়া কপালে উঠল, 'গুড লর্ড! আপনি কি বলতে চাইছেন আমরা অ্যারেস্ট হতে যাচ্ছি?'

ক্লিনশেভ বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি, দ্বন্দ্বে পড়ে গেছি আমরা। ভাল কথা, আপনার পেশা কি জানতে পারি কি?'

কুয়াশা বলল, 'আমি সোশিওলজির প্রফেসর।'

ক্লিনশেভ তাকাল ফ্রেঞ্চকাটের দিকে, সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ক্লিনশেভ। বলল, 'স্যার, আপনি যখন লেকচার দিচ্ছিলেন, আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম আপনার ঠিক পিছনেই। সবই শুনেছি আমরা, তবে ভাল ইংরেজী বুঝি না বলে কিছু কিছু বাক্যের অর্থ বুঝিনি। তবে আপনি যে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি তা আপনার লেকচারের বিষয়বস্তু শুনেই বুঝেছি।'

মৃদু হাসল কুয়াশা, 'না-না উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত আর হতে পারলাম কোথায়? তবে চেষ্টা করছি নিজেকে শিক্ষিত হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে। ভাল কথা,

শ্যাম্পেন অর হুইস্কি?'

ইন্সপেক্টরদ্বয় পরস্পরের দিকে তাকাল। তাদেরকে সিদ্ধান্ত নেবার সুযোগ না দিয়ে কুয়াশা বেয়ারাকে ডাকল হাত ইশারায়, অর্ডার দিল, 'আমাদের সকলের জন্যে হুইস্কি দাও উইথ সোডা। কুইক!'

ফ্রেঞ্চকাট হঠাৎ জার্মান ভাষায় প্রশ্ন করল, 'আপনার সঙ্গী ভদ্রলোকের নাম কি?'

কুয়াশা বোকার মত চেয়ে রইল ইন্সপেক্টরের দিকে। যেন জার্মান ভাষা জানে না সে, বুঝতে পারছে না প্রশ্নটা।

ফ্রেঞ্চকাট একই প্রশ্ন করল আবার, এবার ইংরেজীতে।

কুয়াশা বলল, 'মি. ইনগ্রাম।'

ক্লিনশেভ বলল, 'মি. ইনগ্রাম, আপনার পাসপোর্টটা একবার দেখতে চাই আমরা।'

ডি. কস্টা ঢোক গিলে তাকাল কুয়াশার দিকে।

কুয়াশা হাসছে। বলল, 'বের করে দিন, মি. ইনগ্রাম। পাসপোর্টটা দেখান এদেরকে।'

ডি. কস্টা হাঁ করে চেয়ে রইল কুয়াশার দিকে। মাথায় কিছুই ঢুকছে না তার। পাসপোর্ট একটা আছে বটে তার পকেটে কিন্তু তাতে তার প্রকৃত নাম-ধামই লেখা আছে। এটা দেখালে এই মুহূর্তে গ্রেফতার করবে ওরা।

কুয়াশা আবার বলল, 'আপনার কোটের ডানদিকের সাইড পকেটে রেখেছেন পাসপোর্টটা, সম্ভবত।'

ডি. কস্টার পরিষ্কার মনে আছে, পাসপোর্টটা সে রেখেছে কোটের ভিতরের পকেটে, সাইড পকেটে নয়। সে ভাবল, বসের একথা বলার কারণ কি তাহলে?

কোটের ডান দিকের সাইড পকেটে হাত ঢোকাল ডি. কস্টা। আরে! বড়সড় নোট বুকের মত কি এটা তার পকেটে?

ইন্সপেক্টরদ্বয় তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ডি. কস্টার দিকে।

সাইড পকেট থেকে জিনিসটা বের করল ডি. কস্টা। নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে ছিল সে, দেখল কাঁপছে হাতটা।

পাসপোর্টই বটে! লেখা রয়েছে গায়ে। টেবিলের উপর রাখল সেটা ডি. কস্টা।

ছোঁ মেরে তুলে নিল ক্লিনশেভ ইন্সপেক্টর পাসপোর্টটা।

ক্লিনশেভ এবং ফ্রেঞ্চকাটের মাথা পাশাপাশি যুক্ত হলো, দু'জন মিলে দেখছে ডি. কস্টার পাসপোর্ট।

বেয়ারা চারগ্লাস হুইস্কি রেখে গেল টেবিলে ট্রে থেকে নামিয়ে। বেয়ারা চলে যাবার পরও বেশ কিছুক্ষণ পাসপোর্টটা পরীক্ষা করল ইন্সপেক্টররা, তারপর সেটা নামিয়ে রাখল টেবিলের উপর। বলল, 'পাসপোর্টটা জাল বলে মনে হচ্ছে না। স্যার, আপনার পাসপোর্ট?'

কুয়াশা পকেট থেকে বের করে দিল নিজের পাসপোর্ট।

পাসপোর্টে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ক্লিনশেভ বলল, 'প্রফেসর হেনোর্বান। হুঁ।'

কুয়াশা বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, কোথাও ভুল করেছেন আপনারা। সে যাক, আপনাদের ইনফরমেশনের সোর্স সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই, সুতরাং কিছু বলা উচিত নয় আমার। আমাদেরকে গ্রেফতার করবেন কি করবেন না সে আপনাদের বোধ-বুদ্ধির ব্যাপার, যা ইচ্ছা করুন। কিন্তু, আপাতত দয়া করে গলা ভিজিয়ে নিন···।'

ফ্রেঞ্চকাট বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি, কি করা উচিত তা আমরা ঠিক করতে পারছি না। মি. হেনোর্বান, দয়া করে যদি আপনারা আমাদের সাথে একবার কষ্ট করে আমাদের হেডকোয়ার্টারে যান, খুব ভাল হয়। সেখানে খবরাখবর আসে, সেখান থেকে খবরাখবর পাঠানো যায়—কাজ করতে, সিদ্ধান্ত নিতে অনেক সুবিধে ওখানে আমাদের।'

কুয়াশা সহাস্যে বলল, 'অবশ্যই যাব। না যাবার কি আছে! দেশের নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সাথে অসহযোগিতা করার মানসিকতা আমাদের নেই। অবশ্যই আমরা সমস্যাটার সমাধান বের করার জন্যে হেডকোয়ার্টারে যাব।'

কথা শেষ করে নিজের হুইস্কির গ্লাসটা তুলে নিল কুয়াশা। শূন্যে ধরে রাখল সেটা। 'আসুন, ক্রিমিনালদের ধ্বংস কামনা করে আমরা সৎ মানুষদের স্বাস্থ্য কামনা করি!'

ডি. কস্টাও তুলে নিল একটা হুইস্কির গ্লাস। দেখাদেখি ফ্রেঞ্চকাট এবং ক্লিনশেভও তুলে নিল বাকি দুটো গ্লাস।

গ্লাসে গ্লাসে মৃদু ঠোকাঠুকি করে আনুষ্ঠানিক ভাবে যে যার গ্লাসে চুমুক দিল।

দুই কি তিন চুমুক করে হুইস্কি গলায় ঢালার পরই ইন্সপেক্টর দু'জন টলতে শুরু করল। ঘুমে জড়িয়ে আসতে চাইছে তাদের চোখ। চিৎকার করে কিছু বলার আগেই ঘুমিয়ে পড়ল তারা।

কুয়াশা হাত বাড়িয়ে ধরে দু'জনকেই চেয়ারের পিঠের সাথে হেলান দেয়ার ভঙ্গিতে বসে থাকতে সাহায্য করল।

ডাইনিং-হল থেকে বেরিয়ে এল কুয়াশা দ্রুত। তার পিছনে ডি. কস্টা। লম্বা করিডরের শেষ মাথায় হেডপোর্টারের টেবিল। সেদিকে তাকাতেই একটা লোকের পিছন দিকটা দেখতে পেল কুয়াশা। দেখামাত্র চিনতে পারল সে পরম শত্রুকে।

ব্যস্ত-সমস্ত ভঙ্গিতে কথা বলছে হেডপোর্টারের সাথে প্রিন্স রুডলফ।